জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

নেতৃত্ব, সংগঠন ও আদর্শ

ড. হাসান মোহাম্মদ

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

নেতৃত্ব, সংগঠন ও আদর্শ

ড. হাসান মোহাম্মদ

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

নেতৃত্ব, সংগঠন ও আদর্শ

ড. হাসান মোহাম্মদ

তাফহীম
পাবলিকেশন

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
নেতৃত্ব, সংগঠন ও আদর্শ

ড. হাসান মোহাম্মদ

তাফহীম পাবলিকেশন
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৩০৫-৯৬৫৭২০
fb/তাফহীম পাবলিকেশন
tafheempubs@gmail.com

১ম প্রকাশ : ১৯৯৩
২য় সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০২২
৩য় মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর, ২০২৪
৪র্থ মুদ্রণ : জুলাই, ২০২৫

মূল্য : ৩৪০/- (তিনশত চল্লিশ টাকা)

JAMAAT-E-ISLAMI BANGLADESH
NETRITTO, SONGOTHON O ADORSHO
(Jamaat-e-Islami Bangladesh:
Leadership, Organisation and Ideology)
by Dr. Hasan Mohammad
Published by Tafheem Publication
ISBN: 978-984-96714-7-3

প্রকাশকের কথা

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে জামায়াতে ইসলামী সরাসরি ক্ষমতায় না গেলেও রাজনীতিতে তাদের সরব ও প্রভাবক ভূমিকা রয়েছে সব সময়। ইসলামী সংগঠন ও রাজনৈতিক দল হিসেবে জামায়াতের অবস্থান আরও বড়ো। তাই বাংলাদেশের রাজনীতি ও ইসলাম-চর্চার গতিপথ সম্পর্কে জানতে হলে জামায়াতকে উপেক্ষা করার সুযোগ নেই।

জামায়াতে ইসলামীর আদর্শ, নেতৃত্ব ও রাজনীতি নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে কথার অন্ত নেই। এ বিষয়ে লেখাজোঁকার সংখ্যাও নেহাত কম নয়। কিন্তু বাস্তবতা হলো– এসব বইপত্রের বেশিরভাগেই অতিভক্তি ও অতিবিদ্বেষ পরিলক্ষিত হয়। অ্যাকাডেমিক দৃষ্টিভঙ্গিতে রচিত পর্যালোচনামূলক বইয়ের সংখ্যা খুব কমই বলতে হবে। বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ মরহুম ড. হাসান মোহাম্মদের *জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ : নেতৃত্ব, সংগঠন ও আদর্শ* বইটি সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম উদাহরণ। এটি মূলত জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আদর্শিক ও সাংগঠনিক কাঠামোর ওপর অ্যাকাডেমিকভাবে প্রথম পিএইচডি গবেষণার পরিমার্জিত গ্রন্থরূপ।

বইটি নব্বইয়ের দশকে প্রথম প্রকাশিত হয়ে তুমুল আলোচিত হয়। সময়ের আবর্তনে 'জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ' হয়েছে 'বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী', কিন্তু বইটির আবেদন এখনও অটুট। এখনও বইটির প্রসঙ্গ উঠে আসে সচেতন পাঠকমহলে। বইটির প্রাসঙ্গিকতা ও ঐতিহাসিক মূল্য বিবেচনা করে পুনরায় প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি আমরা। তবে সময়ের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় বিষয়াদি পরিমার্জন যেমন– বানানে নতুন রীতির প্রয়োগ, পুনর্বিন্যাস, সংক্ষেপায়িত শব্দাবলির যথাসম্ভব বিস্তারিত রূপ সংযুক্তি ইত্যাদি কাজগুলো আমরা সম্পন্ন করেছি। আশা করছি– আগের মতোই বইটি অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে সমাদৃত হবে।

তারিক মাহমুদ
সেপ্টেম্বর, ২০২২

উৎসর্গ

আমার আম্মা
শহীদা বেগম (মরহুমা)
ও
আমার আব্বা
মাওলানা সৈয়দ আহমদের (মরহুম)
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে

সূচিপত্র

মুখবন্ধ	০৯
সংক্ষিপ্তকরণ তালিকা	১২
প্রথম অধ্যায়	
উপক্রমণিকা	১৩
দ্বিতীয় অধ্যায়	
জামায়াত নেতৃত্ব	৫১
তৃতীয় অধ্যায়	
জামায়াত সংগঠন	১০৩
চতুর্থ অধ্যায়	
জামায়াত আদর্শ	১৪১
পঞ্চম অধ্যায়	
উপসংহার	১৭৭
শব্দকোষ	১৮৯
গ্রন্থপঞ্জি	১৯৪

সারণী তালিকা

২ : ১ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ : নেতৃত্বের বয়সগত বৈশিষ্ট্য

২ : ২ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ : নেতৃত্বের শিক্ষাগত বৈশিষ্ট্য

২ : ৩ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ : নেতাদের পিতার শিক্ষাগত বৈশিষ্ট্য

২ : ৪ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ : নেতৃত্বের পেশাগত বৈশিষ্ট্য

২ : ৫ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ : নেতৃত্বের বার্ষিক আয়

২ : ৬ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ : নেতাদের পিতার বার্ষিক আয়

২ : ৭ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ : নেতাদের জন্মস্থান

২ : ৮ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ : নেতাদের স্থায়ীবাস

৩ : ১ সংঘ/শিবির থেকে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের নেতৃত্ব

৩ : ২ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ : নেতাদের ভাই-বোন, ছেলেমেয়ে এবং শিবির/সংস্থা

মুখবন্ধ

'নেতৃত্ব, সংগঠন ও আদর্শ : জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর ওপর একটি সমীক্ষা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯২ সালে আমি পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করি। আমার উক্ত গবেষণাকর্মের ওপর ভিত্তি করে 'জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ : নেতৃত্ব, সংগঠন ও আদর্শ' গ্রন্থটি প্রকাশিত হলো।

জামায়াতে ইসলামী হিন্দ ও জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান সম্পর্কে আলোচনা থাকলেও আইনানুগভাবে বাংলাদেশে জামায়াত সংগঠনের সূচনা (১৯৭৯) থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত জামায়াত কার্যক্রমের মধ্যে এ গ্রন্থের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। নেতৃত্ব, সংগঠন ও আদর্শ পরস্পর সম্পর্কিত বলে এ তিনটি বিষয়ের আলোচনায় পুনরুক্তি স্বাভাবিক। এতদ্‌সত্ত্বেও এ গ্রন্থে এটি যথাসম্ভব পরিহারের চেষ্টা করা হয়েছে।

ব্যক্তিগত সংশ্লিষ্টতা নেই– এমন একটি রাজনৈতিক সংগঠনের ওপর কাজ করার জন্য আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর আর. আই. চৌধুরী আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। বহুল আলোচিত রাজনৈতিক সংগঠন জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্ব, সংগঠন ও আদর্শ সম্পর্কিত এ গবেষণাকর্ম যথাসম্ভব নির্মোহ ও নিরপেক্ষভাবে সম্পাদন করার জন্য আমি বিশেষভাবে সচেষ্ট ছিলাম। আমি আশা করি, অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণের নিকট জামায়াতের নেতৃত্ব, সংগঠন ও আদর্শ তথা জামায়াতের রাজনীতির একটি বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা ও মূল্যায়ন এ গ্রন্থের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছি। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে পিএইচডি পর্যায়ে এ কাজ ছাড়া আর কোনো গবেষণা ইতঃপূর্বে হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

এ গবেষণাকর্ম সম্পাদনের জন্য আমাকে শিক্ষা ছুটি ও গবেষণা বৃত্তি প্রদান করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, চট্টগাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের বরিষ্টতম প্রফেসর ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য ড. রফিকুল ইসলাম চৌধুরী শত কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও আমার গবেষণা-নির্দেশক হতে সম্মত হয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। তাঁর সহৃদয় সাহায্য, সহানুভূতি ও উৎসাহ ব্যতীত আমার পক্ষে এ গবেষণা কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. এ. এন. শামসুল হক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন আমার গবেষণা কাজের মূল্যায়ন বিষয়ক দায়িত্বের বাইরেও পরামর্শ ও উপদেশ দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। গ্রন্থাকারে আমার অভিসন্দর্ভ প্রকাশেও প্রফেসর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন উৎসাহ জুগিয়েছেন। এঁদের প্রতি সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই।

আমার শিক্ষক প্রফেসর এম. বদিউল আলম, প্রফেসর মোহাম্মদ আবদুল হাকিম, প্রফেসর আফতাব আহমদ এবং রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের অন্যান্য শিক্ষক ও সহকর্মীগণ আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর ড. ভূঁইয়া ইকবাল এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পড়ে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে কৃতার্থ করেছেন।

সর্বজনাব প্রফেসর মোহাম্মদ আলী, প্রফেসর মঈনুদ্দীন আহমদ খান, প্রফেসর বেণু প্রসাদ বড়ুয়া, ড. মোহাম্মদ লোকমান, ড. ইউ.এ.বি. রাজিয়া আকতার বানু, ড. ময়ুখ চৌধুরী, মাওলানা আফলাতুন কায়সার, মাওলানা শামসুদ্দীন কাসেমী, মাওলানা এ.বি.এম. সিদ্দিকুল্লাহ, অধ্যাপক আবদুল করিম, অধ্যাপক আ.ক.ম. আবদুল কাদের, অধ্যাপক আহসান উল্লাহ, অধ্যাপক আশরাফ উদ্দিন, অধ্যাপক হারুনুর রশীদ খান, শাহজাহান চৌধুরী, এনামুল হক মঞ্জু, আবদুল ওহাব, গাজী নজরুল ইসলাম ও মামুনুর রশীদ এ গবেষণাকর্মের উপাত্ত সংগ্রহে সহায়তা দান করে আমাকে বাধিত করেছেন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ সেমিনার লাইব্রেরি (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়), ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরি (চট্টগ্রাম ও ঢাকা), আমেরিকান কালচারাল সেন্টার লাইব্রেরি (ঢাকা), পাবলিক লাইব্রেরি (চট্টগ্রাম ও ঢাকা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, মওদূদী রিসার্চ একাডেমি লাইব্রেরি (ঢাকা), বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার লাইব্রেরি (ঢাকা), দারুল উলুম মাদরাসা লাইব্রেরি (চট্টগ্রাম) ও ন্যাশনাল লাইব্রেরি (কলিকাতা) ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে

এসব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ আমাকে সহযোগিতা দান করেছেন। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন থেকেও আমি সহযোগিতা পেয়েছি। এ ছাড়া যাঁরা সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, প্রশ্নমালা পূরণ করেছেন, তাঁদের দ্বারাও আমি সবিশেষ উপকৃত হয়েছি। এদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

একাডেমিক পাবলিশার্স, ঢাকা এ বই প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করায় এটি স্বল্প সময়ে পাঠক সমীপে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। এ সংস্থার সত্তাধিকারীগণ বিশেষত যুগ্ম ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব হাবিবুর রহমানকে আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই।

আমার স্ত্রী রেহানা আখতার ও আমাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র ফুয়াদ হাসান এ গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশের জন্য আমাকে উৎসাহ ও উদ্দীপনা জুগিয়েছেন। আমাদের দ্বিতীয় সন্তান সায়ীদ হাসানের জন্মলগ্ন থেকে আমি এ গবেষণা কাজে ব্যস্ত থাকায় যে মনোযোগ, সময় ও স্নেহ তার প্রাপ্য ছিল– সেটি তাকে দিতে পারিনি।

হাসান মোহাম্মদ
রাজনীতি বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
ডিসেম্বর, ১৯৯৩

সংক্ষিপ্তকরণ তালিকা

কে ক প	কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ
কে ম শূ	কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা
জা ই পা	জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান
জা ই বা	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
জা ই হি	জামায়াতে ইসলামী হিন্দ
জ তা আ	জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়া
জা স দ	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল
পা ই ছা স	পাকিস্তান ইসলামী ছাত্র সংঘ
বা ছা ই	বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন
বা স দ	বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল
বা ই ছা শি	বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
বা ই ছা স	বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রী সংস্থা
B N P	Bangladesh Nationalist Party
I D L	Islamic Democratic League
K S P	Krisak Sramik Party
M P	Member of Parliament
N A P	National Awami Party
P P R	Pollitical Parties Regulation

প্রথম অধ্যায়

উপক্রমণিকা

মানবজীবন ও সমাজ নিয়ত পরিবর্তনশীল। যেকোনো সামাজিক পরিবর্তন মানবজীবনকে প্রভাবিত করে। মানুষ পরিবর্তনের মাধ্যমে তার নিরাপত্তা ও উন্নতি নিশ্চিত করতে চায়। পরিবর্তনের প্রকৃতি, পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে মানুষের মধ্যে মতপার্থক্য ও দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। পরিবর্তন-প্রশ্নে এ ধরনের মতভেদ ও দ্বন্দ্ব দূর করা, বিভিন্ন মতের মধ্যে সমন্বয়, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে একটি মতকে অন্যের মতের ওপর প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ক্ষেত্রে নেতৃত্বের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পূর্বে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমেই অধিকাংশ রাজনৈতিক বিরোধের মীমাংসা হতো এবং এ প্রক্রিয়ায় একজন ব্যক্তি বীর নেতা হিসেবে আবির্ভূত হতেন। পরবর্তীকালে নেতৃত্ব তাঁর পরামর্শকদের বক্তব্যও শুনতেন। এভাবে ধীরে ধীরে আইন, প্রথা-পদ্ধতি, সরকার প্রভৃতিসহ রাজনৈতিক ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে।[১] সামাজিক প্রয়োজনেই মানুষকে রাজনৈতিক সংগঠনসহ বিভিন্ন ধরনের সংগঠন গড়ে তুলতে হয়। সব ধরনের সংগঠনেই কিছু লোক ক্ষমতাধর বা নেতারূপে আবির্ভূত হন; অন্যরা হন অনুসারী। নেতৃত্বের বিশেষত রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃত্বের ক্ষমতা লাভ ও তা ধরে রাখার বৈধতা অর্জনের ক্ষেত্রে আদর্শ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানরূপে দীর্ঘদিন থেকে বিবেচিত হচ্ছে।[২]

---

১. Alan Renwick and Lan Swinbum, *Basic Politicat Concepts* (London, Hutchinson, 1980). PP. 11-15

২. দেখুন, Bernard E. Brown et al., *Government and Politics: An Introduction to Political Science* (New York, Random House, 1966). PP. 583-84

নেতৃত্ব, সংগঠন ও আদর্শ

মানবেতিহাসের সকল সময়ে, উন্নয়নের সর্ব পর্যায়ে এবং মানুষের কর্মকাণ্ডের সকল শাখায় নেতৃত্বের ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়।[৩] রাজনীতি ও নেতৃত্বের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। প্লেটো-অ্যারিস্টটলের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত কেন ও কীসের ভিত্তিতে মুষ্টিমেয় লোক শাসক ও অন্যরা শাসিত– এ নিয়ে মানুষ চিন্তা-ভাবনা করছে। কেন ব্যাপক সংখ্যক মানুষ মুষ্টিমেয় শাসককে মানে বা মানতে বাধ্য হয়েছে– এ নিয়েও চিন্তা-ভাবনার শেষ নেই।[৪] বলা হয়, একজন মানুষ কর্তৃক অন্য মানুষের আচরণে প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতাই নেতৃত্ব। একজন বা একদল বিশেষ মানুষ এ প্রভাব বিস্তারকরণ ক্ষমতা লাভ করেন উত্তরাধিকার, নিজস্ব ব্যক্তিত্ব, আইনগত কর্তৃত্ব, সম্মোহন শক্তি (Charisma) অথবা বিশেষায়িত জ্ঞান বা দক্ষতা ইত্যাদির কারণে।[৫] রাজনৈতিক পদে অধিষ্ঠিত কোনো ব্যক্তির রাজনৈতিক ক্রিয়া-কর্ম যখন অন্যদেরকে প্রভাবিত করে, তখন ঐ পদাসীন ব্যক্তিকে রাজনৈতিক নেতা বলে অভিহিত করা যায়।[৬] নেতাকে এলিট (Elite) ও রাজনৈতিক নেতাকে 'রাজনৈতিক এলিট' রূপেও চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। কৌশলগত, প্রশাসনিক প্রভৃতি কারণে সকল ধরনের শক্তিশালী সংগঠনে শক্তিধর নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশি অনুভূত হয়।[৭] নেতৃত্বই রাজনৈতিক দলের চালিকাশক্তি বলে বিবেচিত হয়।[৮]

---

৩. Robert Michels, *Political Parties: A Sociological Tendencies of Moderm Democracy* (New York, The Free Press, 1966). P. 72. প্রাচীনকালের নেতৃত্ব সম্পর্কে ধারণার জন্য দেখুন, Andrew S. Mcfarland, *Power and Leadership in Pluralistic System* (California, Stanford University Press, 1966). PP. 153-54

৪. Lewis J. Edinger, ed., *Political Leadership in Industrialized Societies: Studies in Comparative Analysis* (New York, John Wiley and Sons Inc., 1967). pp. 3-9

৫. দেখুন, H. H. Gerth and C. W. Mill, eds., *From Maxweber: Essays in Sociology* (London, Routledge and Kegan Paul Ltd., 1967). pp. 78-80

৬. Alfred de Grazia, *Political Behavior* (New York, The Free Press, 1966). p. 82

৭. Robert Michels, *op. cit.*, P. 73

৮. Charlcs Merriam quoted in Samuel J. Eldersveld, *Political parties: A behavioral Analysis* (Bombay, Vora and Company publishers, Pvt. Ltd., 1971). p. 544

ধর্ম, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি বা রাজনৈতিক সংগঠনে নেতৃত্বের ক্ষমতা থাকে অত্যন্ত বেশি। কারণ, ধর্মভিত্তিক রাজনীতিতে পার্থিব-অপার্থিব ক্ষমতার বিভাজন স্বীকৃত হয় না। এখানে নেতা বা শাসক একাধারে ধর্মগুরু ও রাজনৈতিক নেতা। তিনি বিশ্বাস ও ন্যায়নীতির রক্ষক এবং আইনপ্রণেতা।[৯]

সামাজিক সংগঠন বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পরিবারব্যবস্থার উৎপত্তি থেকে শুরু করে সংগঠিত হওয়া ও সংগঠন গড়ার যে প্রক্রিয়া মানুষ শুরু করেছিল, তা ক্রমান্বয়ে বিকশিত হয়েছে। কারণ, মানুষের জীবনে সংগঠন বিশেষত রাজনৈতিক সংগঠনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।[১০] প্রাচীন গ্রিক নগররাষ্ট্রের রাজনীতিতেও বর্তমানকালের রাজনৈতিক সংগঠনের কার্যক্রমের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ কিছু কিছু কার্যক্রম পরিচালিত হতো বলে মনে করা হয়। স্বার্থগত বিভিন্নতার কারণে রোমানরাও বিভিন্নভাবে সংগঠিত হয়েছিল। মধ্যযুগও এ প্রবণতার ব্যতিক্রম নয়। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আধুনিক অর্থে প্রথম রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে ওঠে। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের স্বীকৃতি ও গণতন্ত্রের জয়যাত্রা যুক্তরাষ্ট্রসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গণরাজনৈতিক দল গড়ে উঠতে সহায়ক হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে ইউরোপে যে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু হয়, তার ইহজাগতিক প্রবণতার প্রতিক্রিয়া হিসেবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে সেখানকার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে খ্রিষ্ট ধর্মানুসারী রাজনৈতিক দলের সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে।[১১]

সংগঠন হচ্ছে একটি সামাজিক সংস্থা, যা বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহ পূরণের জন্য গঠিত হয়।[১২] থিয়োডোর ক্যাপলুর মতে– সংগঠন হচ্ছে এমন একটি সামাজিক

---

৯. David E. Apter, *The Politics of Modernization* (Chicago, Chicago University Press, 1965). pp. 285-86

১০. এ সম্পর্কে আরও ধারণার জন্য দেখুন, F. E. Kast and J. E. Rosenzweig, *Organization and Management* (Singapore, Mc-Graw Hill Book Company, 1985). pp. 3-5

১১. Alfred de Grazia, *op. cit.*, pp. 188-215. আরও দেখুন, j. Lapalambora and Myrom Weiner, The Origin and Development of Political Parties in their eds., *Political Parties and Political Development* (New Jersey, Princeeton University press, 1967). PP. 3-42

১২. Talcott Parsons, *Structure and Process in Modern Societies* (Glencoe III, The Free Press, 1960). p. 17

ব্যবস্থা, যার সমষ্টিগত পরিচয়, সদস্যদের সঠিক তালিকা, কর্মসূচি এবং সদস্য পরিবর্তনের প্রক্রিয়া রয়েছে।[১৩] সামাজিক সংগঠনকে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের দিক থেকে পিরামিড-সদৃশ একটি কাঠামো বলা যায়।[১৪] এ কাঠামোর উচ্চতর নেতৃত্বকে অধস্তন অনুসারীরা ভালোবাসা, প্রশংসা, সম্মান, পুরস্কার, শাস্তি, ভয় ইত্যাদি কারণে মেনে চলেন।[১৫]

আদর্শ হচ্ছে কতিপয় প্রণালিবদ্ধ ও অনমনীয় মত বা বদ্ধমূল ধারণার সমষ্টি, যার দ্বারা মানুষ পৃথিবীকে বুঝতে, সংরক্ষণ করতে এবং একে পরিবর্তন করতে চায়।[১৬] কোনো ধারণা বা বিশ্বাস যখন আদর্শে পরিগণিত হয়, তখন তা মনস্তাত্বিক কারণে আরও শক্তিশালী ও মর্যাদাসম্পন্ন হয়ে ওঠে। কোনো বিশেষ আদর্শানুসারী ব্যক্তিগণ তুলনামূলকভাবে বেশি নেতা-অনুগত, শৃঙ্খলাবদ্ধ ও কর্মচঞ্চল হয়। একজন নেতার ক্ষমতা ও কার্যক্রমের সমর্থন ও যৌক্তিকতা সৃষ্টিতে আদর্শ সহায়ক হয়।[১৭]

কোনো আদর্শ রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করলে তাকে রাজনৈতিক আদর্শ বলে অভিহিত করা যায়। যেমন, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলোর রাজনৈতিক আদর্শ বলে বিবেচিত।[১৮] বিংশ শতাব্দীকে মতাদর্শিক রাজনীতির শতাব্দী বলে অভিহিত করা হয়।[১৯] তবে ড্যানিয়েল বেল, মার্টিন লিপসেট প্রমুখের মতে– এ শতাব্দীর প্রথমার্ধ বা তার চেয়ে বেশি কিছুকাল বিশ্বের অনেক দেশের রাজনীতিতে আদর্শ গুরুত্বপূর্ণ উপাদানরূপে বিবেচিত হলেও

---

১৩. Theodore Caplow, *Principles of Organization* (New York, HarCourt, Brace and World Inc., 1964). P. 1

১৪. Samuel J. Eldersveld, *op. cit.*, p. 98

১৫. Lewis J. Edinger, *op. cit.*, pp. 5-9

১৬. Arther M. Schlesinger Jr., Quoted in James Mac Gregor Burns, 'Political Ideology' in Norman Mackenzie, ed., *A Guide to Social Science* (London, Weidenfeld and Nicolson, 1966). p. 211

১৭. Bernard E. Brown *et al., op. cit.*, pp. 583-85

১৮. David E. Apter, *op. cit.*, p. 314

১৯. Karl Dietrich Breacher, *The age of Ideologies: A History of Political Thought in the Twentieth Century* (London, Methuen and Co. Ltd., 1985). pp. 15-16

পরবর্তীকালে পশ্চিমা শিল্পোন্নত ও সমৃদ্ধ জীবনমানের গণতান্ত্রিক দেশের রাজনীতিতে শ্রেণি-সংগ্রামের গুরুত্ব হ্রাস পাওয়ায় এটি অনেকাংশে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে।[২০] ষাটের দশক থেকে কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলোর অধিকাংশই আদর্শের প্রশ্নে নমনীয় মনোভাব প্রদর্শন শুরু করে। মার্কসীয় আদর্শের প্রতি উন্নত পশ্চিমা দেশসমূহের জনগণের মোহও এ সময় অনেকাংশে কেটে যায়। এ অবস্থা কয়েকজন পণ্ডিতকে আদর্শের যুগ শেষ হয়ে গেছে বলে মন্তব্য করতে উৎসাহিত করে।[২১]

উন্নত দেশসমূহের রাজনীতিতে আদর্শের ভূমিকা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য থাকলেও অর্থনৈতিক অনুন্নয়ন ও যথার্থ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অনুপস্থিতির কারণে উন্নয়নশীল দেশসমূহের রাজনীতিতে আদর্শ এখনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম বলে ধারণা করা হয়।[২২]

প্রায় সকল দেশ বা সম্প্রদায়ের উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ের নানা প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে আদর্শ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এটি বিরোধ নিষ্পত্তি, ঐক্য-সংহতি ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা, পরিচয়ের সংকট দূরীকরণ প্রভৃতিতে সহায়ক হয়। উন্নয়নশীল দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে তাই সচেতনভাবেই নানা আদর্শের সাহায্য গ্রহণ করতে দেখা যায়।[২৩]

আদর্শের প্রতি মানুষের ঝোঁক স্বাভাবিক ব্যাপার। সংকটকালে নেতৃত্ব যখন ব্যর্থ হয় এবং সঠিক কর্মপ্রক্রিয়া বের করা সম্ভব হয় না, তখন আদর্শের প্রতি মানুষের আকর্ষণ আরও তীব্র হয়ে ওঠে। তাই বলা হয় যে– মানবসমাজে যতদিন সংকট থাকবে, ততদিন আদর্শের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হবে।[২৪]

---

২০. দেখুন, Daniel Bell, *The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in the Fiftees* (New York, The Free Press, 1966). Seymour Martin Lipset, *Political Man: The Social Bases of Politics* (London, Heinermann, 1983)

২১. Edward Shills, *The Intellectuals and the Power and Other Essays* (Chicago, Chicago University Press, 1983). p. 39

২২. S. M. Lipset, *op. cit.*, P. 456

২৩. David E. Apter, *Ideology and Discontent* (New York, The Free Press, 1964). p. 18

২৪. Edward Shills, *op. cit.*, pp. 40-41

রাজনৈতিক অনুসন্ধানে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব

রাজনৈতিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল অধ্যয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ, জনমত গঠন, রাজনৈতিক ব্যবস্থার নিকট গণদাবি পেশ, নাগরিকদের চিন্তা ও কর্মের পার্থক্য হ্রাসের মাধ্যমে ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা, রাজনৈতিক নিয়োগ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কার্যরত একটি রাজনৈতিক দল সাধারণত সম্পন্ন করে থাকে।[২৫] আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সমাজ ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সরকারের স্থিতিশীলতা রক্ষা, গোষ্ঠীসমূহকে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং এদেরকে আধুনিক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্য পূরণক্ষম করে গড়ে তোলার দায়িত্বও রাজনৈতিক দলকে পালন করতে হয়।[২৬] তবে এ কথা ঠিক যে, রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক দলের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ভিন্নতা দেখা যেতে পারে। রাজনৈতিক দলের উপরোল্লিখিত কার্যক্রম বিশ্লেষণ করে অনুধাবন করা যায় যে, রাজনৈতিক অনুসন্ধানে রাজনৈতিক দল অধ্যয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হওয়ার দাবি রাখে।

রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব, সংগঠন ও আদর্শের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মূলত একটি রাজনৈতিক দলের উপরিউক্ত বিষয়ত্রয় সম্পর্কে বিশেষভাবে অধ্যয়ন করা গেলে ওই রাজনৈতিক দলের প্রায় সকল বিষয়ই কোনো না কোনোভাবে অধ্যয়নের আওতাভুক্ত হয়ে পড়ে।

ধর্ম ও রাজনীতি : উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে

ধর্ম[২৭] একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক শক্তি। এটি কেবল ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বিষয় নয়; ধর্ম জনমতের উৎসও বটে। সমাজজীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রেও ধর্মের

---

২৫. Joseph Lapalambora and Myron Weiner, *op. cit.*, p. 3

২৬. Rafiqul Islam Chowdhury, *Recruitment of Political Elite and Political Development in India and Nigeria*, Ph. D. Dissertation (Oregon, University of Oregon, 1964)

২৭. ধর্মের সংজ্ঞা, মৌল বৈশিষ্ট্যাবলি ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে, Purnell Hawndy Benson, *Religion in Contemporary Culture* (New York, Harper and Brothers, Publishers, 1960), pp. 162-163

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেখা যায়। মানুষের ধর্মবিশ্বাস তার রাজনৈতিক চেতনাকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।[২৮] রাজনীতি বিজ্ঞানও তাই ধর্মের ভূমিকা সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারে না।[২৯]

ধর্ম ও রাজনীতির সম্পর্কের প্রশ্নে খ্রিষ্টীয় ধারণার সঙ্গে মুসলিম ও ইহুদি ধারণার পার্থক্য রয়েছে। সম্রাট কনস্টানটাইন কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে খ্রিষ্টধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃত দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত খ্রিষ্টান জগতে ধর্ম ও রাজনীতি ছিল অনেকাংশে পৃথক। কিন্তু ইহুদি ও ইসলাম ধর্মের শুরু থেকেই ধর্ম ও রাজনীতির সম্পর্ক অচ্ছেদ্য বলে মনে করা হয়।[৩০]

সামন্তবাদের অবক্ষয়, ব্যাবসা-বাণিজ্য-শিল্পায়ন ও নগরায়নের অগ্রগতি, জাতীয় রাষ্ট্র ও জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনার বিকাশ, পার্থিব কর্তৃত্বের প্রশ্নে সম্রাট ও ধর্মগুরুদের বিবাদ, ধর্মগুরুদের স্বার্থপরতা ও স্বেচ্ছাচারিতা ইত্যাদির ফলে ইউরোপের খ্রিষ্ট ধর্মানুসারীদের এক বড়ো অংশ রাজনীতি ও ধর্মকে যথাসম্ভব পৃথককরণের পক্ষে মত প্রকাশ করতে শুরু করে। ষোড়শ শতাব্দীর শুরু থেকে রাজনীতিকে চার্চের প্রভাব মুক্তকরণের আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে।[৩১] বিশ্বের শিল্পোন্নত পশ্চিমা দেশসমূহের রাজনীতিতে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ, উদারতাবাদ, ইহজাগতিকতাবাদ ইত্যাদি মতাদর্শের উত্থান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যাপক প্রভাবের ফলে ধর্মের প্রভাব বর্তমানে পূর্বের তুলনায় হ্রাস পেলেও নিঃশেষ হয়নি।[৩২]

---

২৮. David E. Sopher, উদ্ধৃত, ড. এবনে গোলাম সামাদ, *বাংলাদেশে ইসলাম* (ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭), পৃ. ১৫। আরও দেখুন, J. Milton Yinger, *Religion, Society and the Individual: An Introduction to the Society of Religion* (New York, The Macmillan Company, 1967). pp. 231-234

২৯. D. B. Heater, *Political Ideas in the Modern World* (London, George G. Harrap and Co. Ltd., 1967). p. 159

৩০ Arthur Hyman and James J. Walash, eds., *Philosophy in the Middle Ages: The Christian, Islamic, and Jewish Traditions* (New York, Harper and Row, Publishers, 1967). pp. 203-4

৩১. Brian Tierney, *The Crisis of the Church and the State, 1050-1300* (New Jersey, Engleewood Cliffs, Prentice Hall, Inc., 1964)

৩২. দেখুন, C. A. Leeds, *Political Studies* (U. K. Macdonald and Evans Ltd., 1981). p. 137

শিল্পায়ন, নগরায়ন, আধুনিকায়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ দেশের জনগণের ওপর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, উদারতাবাদ, ইহজাগতিকতাবাদ ইত্যাদি চিন্তাধারা ব্যাপক প্রভাব ফেলতে পারেনি বলে এ জাতীয় দেশে ধর্ম ও রাজনীতির সম্পর্ক এখনও অধিকতর ঘনিষ্ঠ। এশিয়ার অনেক দেশে আধুনিক জাতীয়তাবাদের প্রেরণা সৃষ্টি ও জাতীয় রাষ্ট্রের যৌক্তিকতা প্রদর্শনে ধর্ম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।[৩৩] দক্ষিণ এশিয়ায় জনগণের জীবনেও ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ স্থান জুড়ে আছে। এখানকার বৈসাদৃশ্যপূর্ণ সমাজে সংহতি আনার জন্য ইহজাগতিকতা-মনস্ক রাজনীতিকরাও ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়েন। দক্ষিণ এশিয়ার সংস্কৃতিতে ধর্মের প্রভাব এতই শক্তিশালী যে, এখানকার যেকোনো সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তনে ধর্মের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।[৩৪] দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জনগণের প্রাথমিক মূল্যবোধেও ধর্মের উচ্চ স্থান রয়েছে। এসব দেশসমূহের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে ধর্মের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে নেতৃত্বের বৈধতা অর্জনের ক্ষেত্রেও ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[৩৫]

---

৩৩. Robert F. Spencer, 'Religion in Asian Societies' in his ed., *Religion and Change in Contemporary Asia* (Minneapolis, University of Minneasota Press, 1971). p. 11. J. S. Coleman-এর মতে– প্রায় সকল উন্নয়নশীল দেশের রাজনীতিতে অদ্যাবধি ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত হয়। এসব দেশের নব্য সেক্যুলার এলিট গোষ্ঠীও তাই ধর্মের রাজনৈতিক শক্তিকে ব্যবহার করতে বাধ্য হন। James. S. Coleman, 'The Political Systems of the Developing Areas' in G. A. Almond and J. S. Coleman, eds., *The Politcs of Developing Areas* (New Jersey, Princeton University Press, 1960). p. 537. গুনার মিরডালের মতে, দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্টরাও ধর্মের বিরোধিতা করতে সাহস করে না। *Asian Drama: An Abridgement* (U. K. Peguin Books Ltd., 1977). p. 141

৩৪. Myron Weiner, 'The Politics of South Asia', in G. A. Almond and J. S. Coleman, eds, *op. cit.,* p. 179

জাতীয় সংহতি অর্জনের ক্ষেত্রে ধর্মের ভূমিকা সম্পর্কে ধারণার জন্য দেখুন, D. E. Smith, *Religion and Politics in Burma* (New Jersey, Princeton University Press, 1965). p. 320

৩৫. রাজনৈতিক বৈধতা অর্জনের ক্ষেত্রে ইসলামের ভূমিকা সম্পর্কে ধারণার জন্য দেখুন, Binnaz Topark, *Islam and Political Development in Turkey* (Leiden, E. J. Brill, 1981). pp. 25, 28. John L. Esposito, 'Muslim Society Today' in Marjorie Kelly ed., *Islam: The Religion and Political Life of a World Community* (New York, Praeger, 1984). p. 223

ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলন : বিভিন্ন মুসলিম দেশে

ইসলামের রাজনৈতিক তত্ত্ব এ ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত যে– ইসলামী সমাজ, রাষ্ট্র ও সরকারব্যবস্থা ঐশ্বরিক বিধানমালার (শরিয়া) ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে। তাই রাষ্ট্র ও সমাজ, ধর্ম ও রাজনীতি অথবা নৈতিকতা ও রাজনীতি আলাদা আলাদা বিষয় নয়।[৩৬] এককথায়, ইসলাম পার্থিব-অপার্থিব জগৎ ও কর্তৃত্বের বিভাজন অনুমোদন করে না। তাই খলিফা, ইমাম, আমীর বা অন্য কোনো পদবিধারী নেতৃত্ব ততক্ষণই মুসলমানদের ওপর কর্তৃত্বের অধিকারী, যতক্ষণ তিনি ইসলামের নির্দেশিত পথে চলবেন।[৩৭]

খুলাফায়ে রাশিদিনের শাসন অবসান ও রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, খারেজি, শিয়া, সুন্নি, মুতাযিলা প্রভৃতি মতের উৎপত্তি, মুসলমানদের ওপর বিভিন্ন সংস্কৃতির প্রভাব, আঞ্চলিক সার্বভৌম রাষ্ট্র সৃষ্টি, প্রতিদ্বন্দ্বী খলিফার আবির্ভাব প্রভৃতি ইসলামের রাজনৈতিক দর্শনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করতে থাকে।[৩৮] এ সময়কার অধিকাংশ সুন্নি চিন্তাবিদকে মৌল ধর্মীয় বিধানের সঙ্গে বাস্তব রাজনৈতিক অবস্থার বিরোধ মেটাতে সচেষ্ট দেখা যায়।[৩৯] এ আপস বা সমন্বয়ী চিন্তা এবং তৎকালীন সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে প্রথম প্রতিবাদ করেন তাকিউদ্দিন ইবনে তাইমিয়া (১২৬৩-১৩২৮)। ইবনে তাইমিয়ার আদর্শ হচ্ছে– আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহর দিকে প্রত্যাবর্তন; অর্থাৎ, শরিয়া বা আদি ইসলামি আদর্শের দিকে ফিরে যাওয়া। তৎকালীন মুসলিম জনগণের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হলেও সামসময়িক আলেমদের অধিকাংশই ইবনে তাইমিয়ার চিন্তাধারা বিরোধী ছিলেন।[৪০]

---

৩৬. A. K. S. Lambton, 'Islamic Political Thought' in Joseph Schachat and C. E. Bosworth, eds., *The legacy of Islam* (Oxford, Oxford University Press, 1979). p. 404

৩৭. E. I. J. Rosenthal, in 'Preface', *Political Thought in Medieval Islam* (London, Cambridge University Press, 1968). pp. 7-8

৩৮. Montogomary Watt, *Islamic Philosophy and Theology* (Edinburgh, Edinburgh University Press, 1985)

৩৯. দেখুন, Guenter Lewy, 'Changing Concept of Political Legitimacy: Abandonment of Theocracy in Islamic World' in David Spitz, ed., *Political Theory and Social Change* (New York, Atherton Press, 1967). pp. 95-97

৪০. ড. সিরাজুল হক, *ইমাম ইবনে তাইমিয়া ও তাঁর সংস্কার আন্দোলন* (ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭), পৃ. ১৮৩-৯০

প্রায় চারশো বছর পর আবদুল ওয়াহাব নজদির (১৭০৩-১৭৯২) নেতৃত্বে ইবনে তাইমিয়ার চিন্তাধারা প্রভাবিত আন্দোলন (সাধারণ্যে ওহাবি আন্দোলন নামে খ্যাত) আরবভূমিতে দানা বেঁধে ওঠে। বিভিন্নভাবে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হলেও মৌল ইসলামে ফিরে যাওয়ার এ আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে যায়নি। ভারতবর্ষের সৈয়দ আহমদ বেরলভি (১৭৮৬-১৮৩১), আলজেরিয়ার সাইয়েদ মুহাম্মাদ বিন আলী আস-সানুসি (১৭৮৭-১৮৫৯), মিশরের সাইয়েদ কুতুব (১৯০৬-১৯৬৬), ভারতীয় উপমহাদেশের সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর (১৯০৩-১৯৭৯) আন্দোলন (চিন্তা ও কর্মপদ্ধতিগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও) তারই উদাহরণ।[৪১] মৌল আদর্শে ফিরে যাওয়ার পুনর্জাগরণবাদী বিভিন্ন আন্দোলনের পাশাপাশি মুসলিম বিশ্বে বিভিন্ন সময়ে আধুনিকতাবাদী আন্দোলনও দেখা যায়। আধুনিকতাবাদীদের একাংশ ইসলামকে একটি ধর্মবিশ্বাস ও কিছু আচার-অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ রাখতে চায়।[৪২] সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-১৮৯৮) ও মুহাম্মাদ আবদুহু (১৮৪৯-১৯০৫) সহ আরও অনেকে ইসলাম ও পাশ্চাত্য ভাবধারার সমন্বয় চান।[৪৩] উপরিউক্ত পুনর্জাগরণ ও আধুনিকতাবাদী চিন্তাধারার মাঝামাঝি চিন্তা হিসেবে জামালউদ্দিন আফগানি (১৮৩৯-১৮৯৭) ও তাঁর অনুসারীদের যুক্তি ও জ্ঞানের আলোকে ইসলাম ব্যাখ্যার প্রয়াসও উল্লেখযোগ্য।[৪৪]

---

৪১. Wilfred Cantwell Smith, *Islam in Modern History* (New Jersey, Princeton University Press, 1966). pp. 41-73

পাক-ভারতের জামায়াতে ইসলামী ও মিশরের ইখওয়ানুল মুসলিমিন সংগঠনের আন্দোলন প্রায় একই সময়ে একই উদ্দেশ্যে গড়ে উঠেছিল। এ সংগঠন দুটির আদর্শ ও কার্যক্রমের মধ্যকার সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য সম্পর্কে ধারণার জন্য দেখুন, Wilfred Cantwell Smith, Ibid., pp. 156-160 and 233-237. Kalim Bahadur, *The Jamaat-e-Islami of Pakistan* (New Delhi, Chetana Phblications, 1977). pp. 193-94

৪২. Mazharuddin Siddiqi, 'Intellectual base of Muslim Modernism' in *Islamic Studies*, vol. ix. June, 1970. p. 149

৪৩. John L. Esposito, *Islam and Politics* (New York, Syracuse University Press, 1984). pp. 39-57

৪৪. Chandra Muzaffar, 'Islamic Resurgance: A Global View' in Taufik Abdullah and Sharon Siddiqui, eds., *Isalm and Society in South East Asia* (Singapore, Institute of South Asian Studies, 1986). P. 6

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মৌল ইসলামে ফিরে যাওয়ার জন্য ইবনে তাইমিয়া যে আন্দোলন শুরু করেন, বিংশ শতাব্দীতে মিশর, পাকিস্তান, ইরান, বাংলাদেশসহ বিভিন্ন মুসলিম দেশে তা আরও তীব্র হয়ে ওঠে। ইউরোপীয় উপনিবেশবাদ কর্তৃক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন মুসলিম দেশকে শোষণের কারণে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি মুসলমানদের এক বৃহৎ অংশের মোহমুক্তি ঘটে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী মুসলমান নেতাদের জীবনাচার পদ্ধতির প্রতিক্রিয়া, পাশ্চাত্যের ধনবাদী গণতন্ত্র ও সমাজবাদী আদলের শাসন প্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও বিভিন্ন স্বাধীন মুসলিম দেশ কর্তৃক কাঙ্ক্ষিত ফললাভে ব্যর্থতা, সৌদি আরব, লিবিয়াসহ মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি মুসলিম দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন, ইরানে ইসলামী বিপ্লবের সাফল্য (১৯৭৯) প্রভৃতি পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তানসহ পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম দেশের ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলনকে আরও বেগবান হতে সাহায্য করে।[৪৫]

পুনর্জাগরণবাদীদের মতে– ইসলামী নীতিশাস্ত্র, সামাজিক-ব্যক্তিগত নীতিবোধ, বিচার ও স্বাধীনতার ধারণা পাশ্চাত্য সভ্যতার এ সম্পর্কিত ধারণা ও আদর্শ থেকে পূর্ণতর। ইসলামে জাতিবিদ্বেষ, বর্ণবিদ্বেষ, শ্রেণিদ্বন্দ্ব প্রভৃতির অস্তিত্ব নেই। পাশ্চাত্য সভ্যতা এখনও এসব সমস্যায় জর্জরিত। কেবল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রেই পাশ্চাত্য সভ্যতা ইসলামী সভ্যতা থেকে অগ্রসর।[৪৬] ইসলামী মৌলবাদী[৪৭] বলে কথিতদের বিশ্বাস হচ্ছে– ইসলামই কেবল মানুষের

---

৪৫. Ibid., pp. 12-22

৪৬. মুহাম্মাদ আসাদ, *সংঘাতের মুখে ইসলাম* (ঢাকা, আশ্রাফ প্রকাশনী, ১৯৭৭), পৃ. ৬৪

৪৭. খ্রিষ্টধর্মের আদিরূপের বিশুদ্ধতা রক্ষার্থে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যুক্তরাষ্ট্রে যে খ্রিষ্টীয় মৌলবাদী আন্দোলন দেখা দিয়েছিল তার অনুকরণে বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম প্রধান দেশের ইসলামী শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে 'ইসলামী মৌলবাদী আন্দোলন' বলে অভিহিত করার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। কোনো কোনো লেখক পাশ্চাত্য সভ্যতা বিরোধিতার কারণে ইসলামের পুনর্জাগরণবাদী আন্দোলনকে 'নব মৌলবাদ' বলে অভিহিত করতে চান। নব মৌলবাদ পাশ্চাত্য প্রভাবিত আধুনিকতার বিরোধিতা করলেও আধুনিকতাবাদী আন্দোলনের নানা দিক দ্বারা বিভিন্নভাবে প্রভাবিতও হয়। আবার পাশ্চাত্য জগতে ধর্মান্ধতা ও ধর্মোন্মাদনার সমার্থক অর্থে মৌলবাদকে ব্যবহার করা হয় বিধায় বর্তমান বিশ্বের ইসলামী পুনর্জাগরণকে কোনো কোনো লেখক 'মৌলবাদ' বলে চিহ্নিত করতে চান না। বর্তমান যুগের অধিকাংশ ইসলামী আন্দোলন খ্রিষ্টীয় মৌলবাদী আন্দোলনের মতো যুগদাবিকে অস্বীকার করে না। এসব আন্দোলনের নেতা-কর্মীরা পাশ্চাত্য অর্থে

ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ সাধন করতে পারে।[৪৮] সত্যিকার মুসলমানদের দায়িত্ব হচ্ছে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করা।

জামায়াত ও বাংলাদেশের রাজনীতি

১৯৪১ সালে মাওলানা মওদূদী জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠা করেন। মাওলানা মওদূদী জামায়াতের শুধু প্রতিষ্ঠাতাই নন; তিনি আমৃত্যু জামায়াতের মূল পরিকল্পক, পরিচালক ও তাত্ত্বিক গুরু ছিলেন।[৪৯] প্রধানত তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে জামায়াত আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে নেয়।[৫০]

নিজেদেরকে মৌলবাদী হিসেবে চিহ্নিত করতে চান না। ইসলামের মূল স্তম্ভগুলোকে অবিকৃত রেখে যুগচাহিদার সঙ্গে সংগতি রাখার জন্য এসব আন্দোলনের নেতাদের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়।

উপর্যুক্ত বিষয়াবলি সম্পর্কে ধারণার জন্য দেখুন, *Encyclopaedia Britannica*, Vol. 9 (Chicago, Encyclopaedia Britannica Inc., 1966). PP. 1009-11. Dilip Hiro, *Istlamic Fundamentalism* (London, Paladin Grafton Books, 1988). Fazlur Rahman, 'Roots of Islamic Neo Fundamentalism' in P. H. Stoddard ed., *Change in the Muslim World* (New York, Syracuse University Press, 1981) pp. 23-33. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, 'ইসলামী মৌলবাদ : মৌল বিতর্ক', *ত্রৈমাসিক সুন্দরম*, শীত সংখ্যা, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৮-৫৫

৪৮. লিওনার্ড বাইন্ডারের মতে, ইসলামী মৌলবাদীদের বিশ্বাস হচ্ছে–

"...Islam is a complete, an all-embracing or perfect religion. It is a natural religion, in the sense that the laws of God order all nature. Following Islamic precepts leads to happiness in this world as well as the next. The second element is the actual citation of various on these precepts from the Quoran and Sunnah." Leonard Binder, *Religion and Politics in Pakistan* (Berkeley, California University Press, 1963). p. 71

৪৯. দেখুন, Ghulam Azam, *A Guide to Isamic Movement* (Dacca, Azami Publications, 1968). pp. 28-32

৫০. A. Rashid Moten, 'Pure and Practical Ideology: The Thought of Mawlana Mawdudi (1979)', *Islamic Quarterly*, Vol. XXVIII, No. 4. 1984. আরও দেখুন, *জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর সদস্য সম্মেলনের প্রস্তাব* (ঢাকা, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৯৮৩), পৃ. ১৫-১৬। মাওলানা মওদূদীর জীবন ও তাঁর রচনাবলি সম্পর্কে ধারণার জন্য দেখুন, Mesbahul Islam Faruqi, *Introducing Maududi* (Karachi, Students Publications Bureau, 1968). Khurshid Ahmad and Zafar Ishaq Ansari, eds., Islamic Perspective: Studies in Honour of Mowlana Abul Ala Mawdudi (Leicester, U. K. The Islamic Foundation, 1979). pp. 3-10

মওদূদী চিন্তাধারার কিছু কিছু দিকের সঙ্গে উপমহাদেশের মুসলমান ধর্মীয় নেতাদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ ভিন্নমত পোষণ[৫১] করা সত্ত্বেও জামায়াতের রাজনীতিতে মাওলানা মওদূদী ছিলেন প্রভূত ক্ষমতাধিকারী। মাওলানার মৃত্যুর পরও তাঁর চিন্তাধারা জামায়াতের রাজনীতিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করছে। বাংলাদেশের জামায়াত রাজনীতিও এর ব্যতিক্রম নয়।[৫২] ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভক্তির পর পাকিস্তান ও ভারতে জামায়াতে ইসলামী পৃথকভাবে কাজ শুরু করে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিভক্তি ও স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর বাংলাদেশে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য জামায়াতের কাজ চলতে থাকে।[৫৩]

---

৫১. নবিদের নিষ্পাপতা, মিয়ারে হক, তাকলিদ, তানকিদ প্রভৃতি ধর্মীয় প্রশ্নে মাওলানা মওদূদীর মতের সঙ্গে অনেক আলেম ভিন্নমত পোষণ করেন। ইসলামকে প্রধানত : আন্দোলনরূপে দেখা, ইকামতে দ্বীনের ধারণা, ইসলামের জন্য জামায়াত বা সংগঠনের অপরিহার্যতা, রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য জামায়াতের ব্যাপক প্রচেষ্টা, ব্যক্তি সংস্কারের পরিবর্তে সমষ্টির সংস্কারের ওপর অধিক গুরুত্বারোপ ইত্যাদি প্রশ্নেও মওদূদীর মতামতের সঙ্গে অনেক আলেমের ভিন্নমত রয়েছে। মাওলানা মওদূদীর সঙ্গে ভিন্নমত পোষণকারী আলেমদের লেখা পুস্তক-পুস্তিকার একটি তালিকা রয়েছে, মাওলানা হাবিবুর রহমান মুছা (সংকলক), *মিষ্টার মওদূদীর* নতুন ইসলাম (ঢাকা, ফেৎনা উচ্ছেদ কমিটি, ১৯৮৮)। মাওলানা মওদূদীর ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মতামতের বিরোধিতাকারী আলিমদের লেখালিখির জবাবে যেসব বই পুস্তক রচিত হয়েছে, তার একটি তালিকা রয়েছে, আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ, *জামায়াতে ইসলামীর বিরোধিতার অন্তরালে* (ঢাকা, খেলাফত পাবলিকেশন্স, ১৯৮৮)। মওদূদী চিন্তাধারার পক্ষে-বিপক্ষে রচিত বই-পুস্তক সম্পর্কে আরও ধারণার জন্য দেখুন, Khurshid Ahmad And Zafar Ishaq Ansari, eds., Ibid., pp. 11-14

৫২. দেখুন, *Introducing Jamaat-e-Islami Bangladesh* (Dacca, Publication Department, Jamaat-e-Islami Bangladesh, 1981). P.5

জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীর ও মওদূদী রিসার্চ একাডেমির চেয়ারম্যান আব্বাস আলী খান উপমহাদেশ তথা সমগ্র মুসলিম মিল্লাতের জন্য মাওলানা মওদূদী যে অবদান রেখেছেন, তার জন্য তাঁকে 'ইমাম' বলে অভিহিত করলেও অত্যুক্তি হবে না বলে মন্তব্য করেছেন। *দৈনিক সংগ্রাম*, ঢাকা, ২৯ শে জানুয়ারি, ১৯৮৯

৫৩. গোলাম আযম, *জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য* (ঢাকা, প্রকাশনা বিভাগ, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৯৮৭), পৃ. ৪-৬)। বর্তমান পটুয়াখালী জেলার অধিবাসী জনাব আতাউল্লা প্রতিষ্ঠাকাল (১৯৪১) থেকে জামায়াতের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯৪২ সালের ২৬-২৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত জামায়াতের প্রথম মজলিশে শূরা এবং একই বছরের অক্টোবর মাসে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় মজলিশে শূরার বৈঠকে তিনি

অংশগ্রহণ করেন। শেষোক্ত শূরা বৈঠকে আমীরে জামায়াতের নেতৃত্ব ও জামায়াতের কর্মপদ্ধতি পশ্নে মতবিরোধ দেখা দিলে শূরার যে চারজন সদস্য জামায়াত ত্যাগ করেন, জনাব আতাউল্লা তাদের অন্যতম। *জামায়াতে ইসলামীর কার্যবিবরণী*, ১ম খণ্ড (ঢাকা, প্রকাশনা বিভাগ, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৯৮৭), পৃ. ৩৬, ৪৯-৫২। জনাব আতাউল্লাহর পর মাওলানা আবদুর রহীম দ্বিতীয় বাংলাভাষী, যিনি জামায়াতের রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন। মাওলানা আবদুর রহীম ১৯৪৬ সালে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত জামায়াত সম্মেলনে যোগদান করেন। তিনিই পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের প্রথম সদস্য। মাওলানা রহীম পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের আমীর ও পাকিস্তান জামায়াতের নায়েবে আমীর নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৪৮ সালে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে জামায়াত নেতা মাওলানা রফী আহমদ ইন্দোরী ঢাকায় আসেন। ঢাকায় জামায়াতের পূর্ব পাকিস্তান শাখার দপ্তর তিনিই স্থাপন করেন। ১৯৫৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জামায়াতের মজলিসে শূরা সদস্য আলী আহমদ খানকে পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল নিযুক্ত করে ঢাকায় প্রেরণ করা হয়। এ বছরের জুন মাসে জনাব খান পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের আমীর পদে উন্নীত হন। তার প্রচেষ্টায় পূর্ব পাকিস্তানে জামায়াতের কাজের অগ্রগতি হতে থাকে। ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের সদস্য সংখ্যা ছিল ৩৮ জন। এ বছর পূর্ব পাকিস্তানের চারটি বিভাগে জামায়াতের কাজ পরিচালনার জন্য চারজন বিভাগীয় আমীর নিয়োগ করা হয়। ১৯৫৪ সালে গাইবান্ধায় পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র বর্তমান আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন এবং জামায়াতে যোগ দেন। ১৯৫৬ সালে মাওলানা মওদূদী তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসেন। ৪০ দিন স্থায়ী এ সফরের সময় তিনি এখানকার জনগণের নিকট জামায়াত আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। ১৯৬৩ সালে পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের ৩০টি শাখা এবং ১৭৭ জন সদস্য ছিল বলে জানা যায়। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান বিভক্তির সময়ও পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের সদস্য সংখ্যা সম্ভবত ৩০০-৪০০ জনের অধিক ছিল না। দেখুন, গোলাম আযম, *বাংলাদেশ ও জামায়াতে ইসলামী* (ঢাকা, প্রকাশনা বিভাগ, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৯৮৮), পৃ. ১৮-২০। Kalim Bahadur, *op. cit.*, pp. 150-151

অমুসলিমপ্রধান দেশ ভারত ও শ্রীলংকায় জামায়াতের রাজনৈতিক কার্যক্রম খুবই সীমিত। এসব দেশে জামায়াত প্রধানত মুসলিম সমাজের সংস্কার ও অমুসলিমদের নিকট ইসলাম প্রচারের কাজে নিয়োজিত। সাক্ষাৎকার : রহমত আলী খান, সেক্রেটারি জেনারেল, জামায়াতে ইসলামী হিন্দ, পশ্চিমবঙ্গ শাখা। আরও দেখুন, *পলিসি ও প্রোগ্রাম* (কলিকাতা, জামায়াতে ইসলামী হিন্দ, পশ্চিমবঙ্গ, ১৯৯০)। *জামায়াত সদস্যদের ভোটাধিকার প্রয়োগ প্রসঙ্গে* পুস্তিকা, (কলিকাতা, জামায়াতে ইসলামী হিন্দ, পশ্চিমবঙ্গ, ১৯৯১)

জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় রাষ্ট্রবিরোধী মতাদর্শিক বিশ্বাসের কারণে মাওলনা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামী কংগ্রেসের ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও মুসলিম লীগের পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করে।[৫৪] পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মাওলানা মওদূদী পাকিস্তান সম্পর্কে তাঁর ধারণা পরিবর্তন করেন এবং ভারত থেকে পাকিস্তানে চলে এসে 'জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান'-এর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। জামায়াত প্রচারণা চালাতে থাকে যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠাই পাকিস্তান আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল এবং জামায়াতই পাকিস্তানে ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য হাসিল করতে পারে।[৫৫] পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আন্দোলনেও জামায়াত জড়িয়ে পড়ে। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিরোধিতার ন্যায় বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ বিরোধিতা এবং অখণ্ড পাকিস্তানে ইসলাম প্রতিষ্ঠার অধিকতর সম্ভাবনার প্রত্যয়ে জামায়াত বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করে। কিন্তু পরবর্তীকালে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বাস্তবতাও জামায়াতকে মেনে নিতে হয়। 'জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'-এর বর্তমান আমীর অধ্যাপক গোলাম আযমের (১৯২২-২০১৪) মতে–

> ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে এদেশে যারাই জামায়াতের সাথে জড়িত ছিল, তারা বাস্তব সত্য হিসেবে বাংলাদেশকে একটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র বলে মেনে নিয়েছে।[৫৬]

---

৫৪. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *জামায়াতে ইসলামীর উনত্রিশ বছর* (ঢাকা, প্রচার বিভাগ, জামায়াতে ইসলামী, পূর্ব পাকিস্তান, তারিখ নেই), পৃ. ২৪-৩০

৫৫. হামযা আলাভী, 'পাকিস্তান ও ইসলাম : জাতিসত্তা, মতাদর্শ ও রাষ্ট্র', *সমাজ নিরীক্ষণ*, নভেম্বর, ১৯৮৮, পৃ. ৩৫-৩৬

W. C. Smith লিখেছেন–

"Mawdudi would appear to be much the most systematic thinker of modern Islam.... A great many muslims in Pakistan and beyond who may differ from Mawdudi even radically as to the content of his interpretation, have come increasingly to premise that there is an Islamic system of economics, an Islamic political system, an Islamic constitution and so on." *Islam in Modern History* (New Jersey, Princeton University Press, 1957). p. 234.

৫৬. গোলাম আযম, *পলাশী থেকে বাংলাদেশ* (ঢাকা, লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৮৮) পৃ. ১৭-২০। আরও দেখুন, Abbas Ali Khan, *Jamat-e-Islami's views on Defence of Bangladesh* (Dhaka, Publication Department, Jamaat-e-Islami Bangladesh, 1985)

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশ। এখানকার জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মুসলমান।[৫৭] ধর্মের নামে পাকিস্তানি শাসকদের শাসন-শোষণ ও ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকামী রাজনৈতিক দলগুলো কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধিতা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রথম সরকারকে (আওয়ামী লীগ দলীয়) রাষ্ট্রীয় আদর্শরূপে ধর্মনিরপেক্ষতা (এক বিশেষ অর্থে) গ্রহণ ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধকরণে (বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদ অনুসারে) অনুপ্রাণিত করেছিল।[৫৮]

১৯৭৬ সালের ৪ মে এক সামরিক অধ্যাদেশ দ্বারা ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠনের ওপর থেকে বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করা হলে বাংলাদেশের মুসলিম আধুনিকতাবাদী গোষ্ঠীসমূহ মুসলিম লীগ এবং ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকামী গোষ্ঠীসমূহ 'ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ' নামে রাজনৈতিক দল গঠন করে। ১৯৭৮ সালে 'রাজনৈতিক দল অধ্যাদেশ' (১৯৭৬ সালে জারিকৃত) তুলে নেওয়া হলে বিভিন্ন নামে আরও কয়েকটি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৯৭৭ সালের ২২ এপ্রিল প্রেসিডেন্টের সংবিধান সংশোধনী আদেশানুসারে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আদর্শ থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা অপসারিত হয়। ১৯৭৯-এর ২৫-২৭ মে ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনের মাধ্যমে ইসলামী আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকামী রাজনৈতিক সংগঠন 'জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ' প্রকাশ্যভাবে এর কার্যক্রম শুরু করে।[৫৯]

---

৫৭. ১৯৮১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ৮,৭১,২০০০০ জন। তন্মধ্যে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা ৭,৫৪,৮৭০০০ জন। দেখুন, *Statistical Pocket Book of Bangladesh*, 1987 (Dhaka, Bangladesh Bureau of Statistics, 1988). p. 51

৫৮. হাসান মোহাম্মদ, 'ধর্ম, সাম্প্রদায়িকতা ও বাংলাদেশের রাজনীতি (১৯৭২-৮৬)', *চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ*, কলা, ভল্যুম ৩ : ১৯৮৭, পৃ. ৪১-৪৬

৫৯. বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পর জামায়াতের নেতাকর্মীরা যে যেখানে ছিলেন, সেখান থেকে গোপনে সাংগঠনিক কাজ শুরু করেন। জুমার নামাজের পূর্বে বক্তৃতা, তাফসির ও ওয়াজ মাহফিল, দারসে কুরআন ও হাদিস ইত্যাদির মাধ্যমে জামায়াত ধীরে ধীরে তার কার্যক্রম শুরু করে। ছাত্র সংঘের কর্মীরাও গোপনে তাদের কার্যক্রম চালাতে থাকে। এভাবে ১৯৭২ থেকে ১৯৭৬ সাল অর্থাৎ, আইডিএল গঠন পর্যন্ত জামায়াত ও তার সহযোগী সংগঠনসমূহ প্রধানত গোপনেই তাদের তৎপরতা চালায়। জামায়াতের মজলিশে শূরার সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৭৬ সালে আরও কয়েকটি ইসলামী রাজনৈতিক দলের যৌথ উদ্যোগে আইডিএল গঠিত হয়। ১৯৭৭ সালে 'পাকিস্তান ইসলামী ছাত্র সংঘ' (প্রতিষ্ঠা : ১৯৪৭ সাল) 'বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির' নামে

বাংলাদেশের মুসলমানদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে[৬০] ইসলাম ধর্মের প্রভাব সুস্পষ্ট। তবে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের মাত্রার প্রশ্নে এখানকার ইসলামপ্রিয় জনগণও ঐকমত্য পোষণ করেন না। বাংলাদেশের ইসলামী শাসন কায়েমেচ্ছু রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে 'জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ' সাম্প্রতিককালে সবচেয়ে শক্তিশালী ও সুসংগঠিত সংগঠন হিসেবে আবির্ভূত হতে সক্ষম হয়েছে।[৬১]

প্রকাশ্য ছাত্র সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ধর্মভিত্তিক রাজনীতির পক্ষে ক্রমান্বয়ে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে লক্ষ্য করে প্রকাশ্য সংগঠন হিসেবে পুনরায় জামায়াতের আত্মপ্রকাশের পক্ষে অনেক নেতা মত প্রকাশ করেন। মাওলানা আবদুর রহীম, মাওলানা আবদুস সোবহান, অ্যাডভোকেট সাদ আহমদ, ব্যারিস্টার কোরবান আলী, অ্যাডভোকেট শেখ আনসার আলী প্রমুখ জামায়াত নেতা পূর্বোক্ত মতের বিরোধী ছিলেন। তাঁরা জামায়াতকে গোপন সংগঠন হিসেবে রেখে আইডিএল-এর নামে প্রকাশ্য রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জামায়াত প্রকাশ্যভাবে কার্যক্রম শুরু করার পর অধিকাংশ আইডিএল নেতা-কর্মী জামায়াতে প্রত্যাবর্তন করেন। সাক্ষাৎকার : মুফতি আবদুস সাত্তার এম.পি. ও শেখ আনসার আলী এম.পি.। জামায়াত-আইডিএল সম্পর্ক প্রশ্নে আরও ধারণার জন্য দেখুন, *আইডিএল-এর দৃষ্টিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ৮১* (ঢাকা, পাবলিসিটি সেক্রেটারি, আইডিএল কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৮১), পৃ. ৮-১০

৬০. রাজনৈতিক সংস্কৃতির সংজ্ঞা ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এর ভূমিকা সম্পর্কে ধারণার জন্য দেখুন, I. w. Pye, 'Political Culture' in *International Encyclopaedia of Social Sciennces*, Vol. 12 (U. S. A. Macmillan Company and The Free Press, 1968). p. 218

৬১. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জামায়াত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে প্রায় ১০% ভোট পেয়ে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। এ নির্বাচনে মুসলিম লীগসহ অন্যান্য ইসলামী দলগুলো (জামায়াত বাদে) মিলিতভাবে ৭.৮৫% ভোট পেয়েছিল। ১৯৭৯ সালের সংসদ নির্বাচনে জামায়াত, নেজামে ইসলাম ও খেলাফতে রাব্বানী পার্টির সমন্বয়ে গঠিত আইডিএল মুসলিম লীগের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে ২০টি আসন লাভ করে। ১৯৮৬ সালের সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ স্বনামে এককভাবে ১০টি আসন পায়। ১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচনে জামায়াত ১৮ টি আসন লাভ করেছে। পরে জামায়াত মহিলাদের দুটি সংরক্ষিত আসনও লাভ করে। সর্বশেষ সংসদ নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের ভিত্তিতে (১২.১৩%) জামায়াতে ইসলামীকে বাংলাদেশের তৃতীয় বৃহত্তম দল এবং প্রাপ্ত আসনের ভিত্তিতে চতুর্থ বৃহত্তম দল বলে বিবেচনা করা যায়। ১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণার জন্য দেখুন, Muhammad Abdul Hakim, 'The 1991 Parliamentary Election in Bangladesh: A Review' in Politics, *Administration and Change*, No. 17, July-December, 1991. pp. 24-38 (Dhaka).

মূলত জামায়াত ব্যতীত অন্য কোনো ইসলামী সংগঠন খুব বেশি নতুন সদস্য ও সমর্থক সৃষ্টি করতে পারছে না। সহযোগী ছাত্র সংগঠন 'বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির', 'বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রী সংস্থা ও মাদরাসা ছাত্রদের মধ্যে কার্যত 'জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়া' দ্বারা কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদরাসা শিক্ষার্থীদের এক উল্লেখযোগ্য অংশকে জামায়াত তার আন্দোলনের সমর্থক সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে। জামায়াতে ইসলামী তার আন্দোলনে বিভিন্ন পেশার মানুষকে আকৃষ্ট ও সংযুক্ত করার জন্য আরও অনেকগুলো অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন গড়ে তুলেছে।

পাক-ভারত-বাংলাদেশের মুসলমানদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক তথা জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত নানা বিষয়ে ধর্মের প্রভাব পশ্চিমের চেয়ে অনেক সুস্পষ্ট।[৬২] সৈয়দ আহমদ বেরলভি, হাজী শরিয়তুল্লাহ (১৭৭৯-১৮৪০) প্রমুখ মুসলমানদের মৌল ইসলামে ফিরে যাওয়ার যে আহ্বান জানান, তৎকালীন বাংলায় তার ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল। সে প্রভাব এখনও অনেকটা বিদ্যমান।[৬৩]

ইসলাম আন্তর্জাতিক ধর্ম বিধায় বিশ্বের অন্যান্য দেশের মুসলমানদের সঙ্গেও বাংলাদেশের মুসলমানদের মৈত্রী বন্ধন থাকা স্বাভাবিক। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সহায়তা না করার কারণে স্বাধীনতাপরবর্তী কয়েক বছর অধিকাংশ মুসলিম দেশের সঙ্গে তৎকালীন বাংলাদেশ সরকারের সুসম্পর্ক ছিল না। ১৯৭৪ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমানের (১৯২০-১৯৭৫) যোগদানের মাধ্যমে পুনরায় মৈত্রী সম্পর্ক গড়ে উঠার যে সূচনা হয়, তা দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকে।[৬৪] বাংলাদেশে ইসলামী রাজনীতির পুনরুত্থানের কারণ হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতার দাবিদার মুজিব সরকারের ব্যর্থতা, ধর্মকে ব্যবহার করে নেতৃত্বের বৈধতা লাভের আকাঙ্ক্ষা, জনগণের দারিদ্রকে পুঁজি করে ইসলামী দলগুলোর উত্থান, তেলসমৃদ্ধ মুসলিম

---

৬২. Keith Callard, *Pakistan: A Political Study* (London, George Allen and Unwin Ltd., 1968). p. 195

৬৩. তাজুল ইসলাম হাশমী, 'বাংলাদেশের সংস্কৃতি : ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক যুগ ১৭৫৭-১৯৪৫', লেখকের *ঔপনিবেশিক বাঙলা* (কলিকাতা, প্যাপিরাস, ১৯৮৫), পৃ. ১৪-১৫

৬৪. দেখুন, হাসান মোহাম্মদ, *পূর্বোক্ত*

দেশসমূহের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার প্রত্যাশা, পেট্রো-ডলার প্রাপ্তির কারণে ইসলামী দলগুলোর শক্তি বৃদ্ধি, মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশসমূহে জনশক্তির বাজার, উক্ত দেশসমূহের কূটনৈতিক সমর্থন লাভে বাংলাদেশের প্রচেষ্টা প্রভৃতিকে দেখা হয়।[৬৫]

দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে ভারতের সম্প্রসারণবাদী ভূমিকার প্রতিক্রিয়াও ভারতের প্রতিবেশী মুসলিমপ্রধান দেশের রাজনীতিতে ইসলামী আদর্শের আবেদন জোরদার হয়ে উঠার পেছনে কাজ করেছে বলে অনেকে মনে করেন। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের মতাদর্শিক বিতর্ক, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের অধিকাংশ দেশ কর্তৃক সমাজতন্ত্র ত্যাগ, বাংলাদেশের বাম রাজনীতিতে বিভাজন ও শক্তিহীনতা প্রভৃতি এ দেশের যুবসমাজের ওপর থেকে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের প্রভাব কমে যেতে সহায়ক হয়েছে। আদর্শ-প্রবণ যুবসমাজের এক উল্লেখযোগ্য অংশ বর্তমানে ইসলামী রাজনীতির প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছে। দরিদ্র পরিবারের শিক্ষিত লোকজন চাকুরি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে উচ্চশ্রেণির শিক্ষিত লোকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠতে পারছে না। দরিদ্র শ্রেণির শিক্ষিত লোকজন অনেক সময় হতাশাগত কারণে চরম রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। কমিউনিস্ট আন্দোলনের বর্তমান দুর্বলতার কারণে এদের অনেকে জামায়াতের ইসলামী আন্দোলনের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছে।[৬৬] বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম দেশ কর্তৃক আধুনিকতাবাদী ইসলাম অনুসরণের অকার্যকারিতাও বাংলাদেশের কিছু মানুষকে ইসলামী আন্দোলনের প্রতি আগ্রহী করে তোলে।[৬৭]

---

৬৫. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, 'বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি : একটি বিশ্লেষণ (১৯৭২-৮৭)', *সমাজ নিরীক্ষণ*, নভেম্বর, ১৯৮৭. পৃ. ৩-৮। আরও দেখুন, Syed Anwar Hussain, 'Religion and Ethnicity in Bangladesh Politics', *Bangladesh Institute of International and Strategic Studies* (Dhaka), Vol. 12, No. 4, 1991. PP. 421-45

৬৬. U. A. B. Razia Akter Banu, 'Jammat-e-Islami Movement in Bangladesh: Its Present and Future', Presented in a Seminar held in April, 1981. At Billagio, Millan, Italy.

৬৭. Talukdar Maniruzzam, 'Bangladesh Politics: Secular and Islamic Trends' In S. R. Chakrabarti and Birandra Narain, eds., *Bangladesh: History and Culture* (New Delhi, South Asia Publishers, 1986)

বাংলাদেশের ইসলামী শক্তিসমূহ (প্রধানত জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ) রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের পর্যায়ে না এলেও এর ক্রমবর্ধিষ্ণু শক্তিকে আজ আর কেউ অস্বীকার করতে পারছে না। রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতার স্থলে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' প্রতিস্থাপন, সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী (১৯৮৮) দ্বারা ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা ইত্যাদিকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মের প্রাধান্য বৃদ্ধির উদাহরণ হিসেবে দেখা যেতে পারে। বাংলাদেশের সব বড়ো বড়ো রাজনৈতিক দল ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনে জয়লাভের জন্য জনগণের ধর্মানুভূতিকে নানাভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে। ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ অনুসরণের দাবিদার দলগুলোও এর বাইরে থাকতে পারেনি।[৬৮]

বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মের এ ক্রমবর্ধিষ্ণু প্রাধান্য ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকামী সংগঠনসমূহকে আশাবাদী করে তুলতে সহায়ক হয়েছে। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থাবিরোধী শক্তিসমূহ ইসলামী রাজনীতির অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করার জন্য বিভিন্নভাবে কাজ করছে।[৬৯] রাজনীতিতে ধর্মকে ব্যবহার করে সুবিধা লাভ করতে চায়– এমন লোকজনও মৌলবাদ বিরোধিতার কারণ দেখিয়ে জামায়াতকে প্রতিহত করতে চায়।[৭০] দেশের আলেমদের এক বড়ো অংশও জামায়াতবিরোধী।[৭১] প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতও বাংলাদেশের মৌলবাদের শক্তি বৃদ্ধিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।[৭২]

---

৬৮. এ সম্পর্কে আরও আলোচনা রয়েছে, ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, 'ধর্মের নামে নির্বাচন', *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, এপ্রিল ১১, ১৯৯১, পৃ. ২১-২৩

৬৯. দেখুন, *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ১১ নভেম্বর, ১৯৮৮. পৃ. ২১-৩৪। এতে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, কমিউনিস্ট পার্টি, মুক্তিযোদ্ধা সংসদসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কয়েকজন নেতা, লেখক, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিকের সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে।

৭০. দেখুন, *সাপ্তাহিক বিচিন্তা*, ১১ অক্টোবর, ১৯৮৭. পৃ : ১১-১৩

৭১. দেখুন, মাওলানা আবদুল আউয়াল, 'জামাতে ইসলামীর ধর্ম ব্যবসা', *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ১১ নভেম্বর, ১৯৮৮, পৃ. ৪০-৪৩। আসিফ নজরুল, 'জামাতে ইসলামীর ধর্ম ব্যবসা : বিশিষ্ট আলেমদের অভিমত', *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ১৩ জানুয়ারি, ১৯৮৯, পৃ. ৩৪-৩৯

৭২. ভারতের প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী নরসীমা রাও কর্তৃক প্রফেসর সমর গুহকে লিখা চিঠির হুবহু অনুলিপি প্রকাশিত হয়েছে *দৈনিক সংগ্রাম*, ডিসেম্বর ২৯, ১৯৮৮ সংখ্যায়। এতে বাংলাদেশে ইসলামী মৌলবাদের বৃদ্ধিতে ভারতের গভীর উদ্বেগ প্রকাশিত হয়েছে।

জামায়াতবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো পরস্পরের বিরুদ্ধে জামায়াত-তোষণের অভিযোগও এনে থাকে। ১৯৭৩ সালে শেখ মুজিব কর্তৃক সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা, ১৯৭৬ সালে জিয়াউর রহমান কর্তৃক ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠনের অনুমতি প্রদান, ১৯৮৩ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত ১৫ দল, ৭ দল ও জামায়াতে ইসলামীর যুগপৎ এরশাদ সরকারবিরোধী আন্দোলন, ১৯৮৬ সালে জামায়াতে ইসলামী ও আওয়ামী লীগের সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ, এরশাদ সরকার কর্তৃক ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা, জামায়াতের সমর্থন নিয়ে বিএনপির সরকার গঠন (১৯৯১) প্রভৃতি বিষয় উত্থাপন করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল পরস্পরের বিরুদ্ধে ইসলামী রাজনীতি বিশেষত জামায়াত-তোষণের অভিযোগ এনে থাকে।[৭৩] এতদ্‌সত্ত্বেও সুফি-দরবেশেদের প্রভাবের কারণে বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয় উদারতা, পশ্চিমা শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাব, ধর্মের নামে পাকিস্তানি শাসকদের শোষণ ও নির্যাতন, ইসলামপন্থি রাজনৈতিক দলগুলোর অধিকাংশ কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধিতা, মৌলবাদী রাজনীতির উগ্ররূপ সম্পর্কিত ভয়-ভীতি, ইসলাম উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ কি-না এ বিষয়ে সংশয় প্রভৃতি বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতি সাফল্যের পথে অর্থাৎ, ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথে বড়ো ধরনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে।

নেতৃত্ব, সংগঠন ও আদর্শ : জামায়াত ধারণায়

জামায়াতে ইসলামীর মতে, এ পৃথিবীর সার্বিক অশান্তির মূলে রয়েছে আল্লাহ ও পরকাল বিষয়ে মানুষের উদাসীন্য এবং রাসূলের নেতৃত্বের প্রতি বিদ্রোহ।[৭৪]

---

৭৩. দেখুন, *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ১১ নভেম্বর, ১৯৮৮, পৃ. ৩৪। *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ১১ অক্টোবর, ১৯৮৭, পৃ. ১২-১৩। বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার সাক্ষাৎকার, *বিচিত্রা*, ২১ জুলাই, ১৯৮৯, পৃ. ২৫-২৬। কলিকাতার *দৈনিক স্টেটসম্যান*-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেছেন, জামায়াতে ইসলামীকে প্রতিহত করার জন্য ইসলামকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁর মতে, সরকারবিরোধী আন্দোলনে অংশীদার করে বিরোধী দলসমূহ জামায়াতকে পুনর্বাসিত করেছে। দেখুন, *The Bangladesh Observer*, Dhaka, July 21, 1989. p. 10

গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা, পুস্তিকা, (ঢাকা, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৯৯১)

৭৪. দেখুন, *নির্বাচনী ইশতেহার : জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান* (চট্টগ্রাম, জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান, চট্টগ্রাম শাখা প্রকাশিত, ১৯৭০), পৃ. ১

একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই কেবল জামায়াতের লক্ষ্য নয়; মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশিত বিপ্লব সৃষ্টি করাই এর উদ্দেশ্য। আল্লাহ এ কারণেই তাঁর নবিগণকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এবং ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য নবির নেতৃত্বে উম্মতে মুসলিমা নামে একটি দল গড়ে উঠেছে।[৭৫]

জামায়াতে ইসলামীর ঘোষণানুযায়ী জামায়াত শুধু একটি রাজনৈতিক কিংবা একটি সংস্কারবাদী সংগঠন শুধু নয়; বরং ব্যাপক অর্থে একটি ইসলামী আদর্শবাদী দল।[৭৬] এ দল মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় সংকল্প। এ কারণে নেতৃত্ব, সংগঠন ও আদর্শ সম্পর্কিত জামায়াত ধারণার সঙ্গে প্রচলিত নেতৃত্ব, সংগঠন ও আদর্শ সম্পর্কিত ধারণার পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক।

ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনে নেতৃত্বের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জামায়াতের ধারণায় ইসলামী আদর্শ ও জীবনব্যবস্থা মূলত নেতাকেন্দ্রিক।[৭৭] আল্লাহ বিশ্ব জগতের স্রষ্টা এবং একমাত্র প্রভু। আল্লাহর প্রতিনিধি নবিগণ হচ্ছেন মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রের জন্য আল্লাহ মনোনীত নেতা। নববি-আদর্শের যথার্থ অনুসারীরাই নবি-পরবর্তী নেতৃত্বে আসীন হওয়ার দাবিদার। জীবনের সকল ক্ষেত্রে যে নেতৃত্ব ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চায়, সে নেতৃত্ব অনুসরণ করার জন্য জামায়াত আহ্বান জানায়।[৭৮] জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের বর্তমান (১৯৯১) সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর মতে–

> ইসলামী সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধানের বিকল্প। হাদিসে রাসূলের আলোকে ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্য রাসূলের আনুগত্যেরই শামিল। এ সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নায়েবে রাসূলের মর্যাদার অধিকারী। অধস্তন সংগঠনের নেতৃত্ব কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রতিনিধি হওয়ার কারণে সর্বপর্যায়ের নেতৃত্বই পরোক্ষভাবে নায়েবে রাসূলের মর্যাদার দাবি রাখে।[৭৯]

---

৭৫. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কর্মসূচি* (ঢাকা, মুহাম্মাদ আবদুর রহীম কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৬৩), পৃ. ৩৭

৭৬. দেখুন, প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে আহ্বায়ক আব্বাস আলী খানের উদ্বোধনী ভাষণ, পুস্তিকা, প্রকাশনায় : জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ঢাকা। *মেনিফেস্টো : জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ* (ঢাকা, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৯৮৯), পৃ. ৫

৭৭. মতিউর রহমান নিজামী, *ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন* (ঢাকা, আল-ইহসান প্রকাশনী, ১৯৮৬) পৃ. ৬০

৭৮. *মেনিফেস্টো : জামায়াত*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২

৭৯. মতিউর রহমান নিজামী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৭

ইসলামী সংগঠনের সিদ্ধান্ত কুরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থি না হলে, সে সিদ্ধান্তকে কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশের অনুগামিতার মর্যাদা দিতে হবে।[৮০] এ কারণে জামায়াত নেতৃত্ব সাংগঠনিক পরিমণ্ডলে কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠতার ওপর নির্ভরশীল নয়। জামায়াতে কোনো ব্যক্তির নেতৃত্ব তাঁর ত্যাগ, বুদ্ধি, সচেতনতা, যোগ্যতা প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে ওই ব্যক্তির নৈতিক গুণাবলির ওপরও নির্ভরশীল। জামায়াত নেতৃত্বকে অবশ্যই কুরআন ও সুন্নাহর গভীর জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। ধর্মীয় বিধি-নিষেধ মেনে চলার ক্ষেত্রে সকলের চেয়ে অগ্রসর হতে হবে এবং নেতৃত্বের জীবন কোনো অবস্থাতেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শিক্ষার দৃষ্টিতে সঠিক মানের চেয়ে নিম্ন মানের হতে পারবে না।[৮১]

ইসলামকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার যে লক্ষ্য নিয়ে জামায়াত কাজ করছে বলে দাবি করে থাকে, সে লক্ষ্যের সঙ্গে তার সংগঠন সম্পর্কিত ধারণাও সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া স্বাভাবিক। নিজামীর মতে–

> মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যেঙ্গের... একীভূত রূপের অনুকরণে কিছু সংখ্যক মানুষের নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে হাসিলের জন্য এক দেহ এক প্রাণরূপ কাজ করার সামষ্টিক কাঠামোকেই বলা হয় সংগঠন...। এ জন্যই হাদিসে এ জনসমষ্টিকে একটি দেহের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।[৮২]

সংগঠন সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে– তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল অবশ্যই থাকতে হবে, যারা মানবজাতিকে কল্যাণের পথে আহ্বান জানাবে, সৎকাজের আদেশ দেবে, অসৎকাজে বাধা দেবে– তারাই সফলকামী।[৮৩] হাদিসে বর্ণিত আছে– ইসলামী সংগঠনের প্রতি আল্লাহর রহমতের হাত প্রসারিত থাকে। যে জামায়াত ছাড়া একা চলে, সে একাকী দোজখের পথেই ধাবিত হয়।[৮৪] যে ব্যক্তি আনুগত্য পরিত্যাগ করে এবং জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন

---

৮০. ঐ, পৃ. ৫৭

৮১. আব্বাস আলী খান, *জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস* (ঢাকা, আবু নুমান মোঃ মাসউদুয্যামান প্রকাশিত, ১৯৮৬), ২৭৩-৭৪

৮২. মতিউর রহমান নিজামী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৩-৪৪

৮৩. *আল-কুরআন*, সূরা আলে ইমরান : ১০৪

৮৪. আল-হাদিস, উদ্ধৃত, শাইখ ওয়ালিউদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-খতিব আত তিবরিযি, *মিশকাতুল মাসাবিহ* (দিল্লি, আল-মাকতাবা আল-রশিদিয়া, ১৩৭৫ হিজরি), পৃ. ৩০

অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তার মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যু।[৮৫] মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর মতে–

> ... আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নাহ এবং সাহাবায়ে কেরামের ইজমার ভিত্তিতে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, দ্বীন ইসলামে জামায়াতবিহীন জীবনের কোনো ধারণা নেই। ... অতএব, জামায়াতবদ্ধ হওয়া, জামায়াতবদ্ধ হয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালানো ফরজ। ... কাজেই সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া অনিবার্য কারণেই ফরজ হতে বাধ্য।[৮৬]

অধ্যাপক গোলাম আযমের ভাষায়–

> ইসলামী সংগঠনে শরিক হওয়া ফরজ। রাসূল সা.-এর ওপর গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন যে, জামায়াত বা ইসলামী সংগঠন ত্যাগ করা ইসলামের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করার সমান। অবশ্য কী নিয়তে সংগঠন ত্যাগ করছে তার ওপরেই এর পরিণাম নির্ভর করবে।[৮৭]

নেতৃত্বের ন্যায় সংগঠনকেও জামায়াত ধর্মীয় মর্যাদার অধিকারী মনে করে। এ সম্পর্কে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খানের বক্তব্য–

> জামায়াতে ইসলামী তার সংগঠনকে শরিয়তের মর্যাদা দিয়ে রেখেছে। অর্থাৎ, এ সংগঠনের নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলা কর্মীদের শরয়ি ফরজ বলে গণ্য করা হয়। এ আনুগত্যকে সৎকাজের আদেশ (আমর বিল মারুফ)-এর শর্তাধীন করে তাকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ করা হয়েছে। অর্থাৎ, আনুগত্য শুধু সৎকাজের জন্য; অসৎকাজের জন্য নয়। ফলে জামায়াতে ইসলামীর প্রত্যেক কর্মী তার প্রতিটি কাজকে দ্বীনি প্রয়োজন, সওয়াবের কাজ এবং অপরিহার্য মনে করে। ... যেহেতু জামায়াতে ইসলামীর সংগ্রাম দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, সেজন্য তার প্রত্যেকটি কাজই জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর কাজ, সেজন্য তা সর্বোত্তম ইবাদতের মধ্যে গণ্য।[৮৮]

---

৮৫. আল হাদিস, উদ্ধৃত, ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ, সহিহ মুসলিম (২য় খণ্ড), (দিল্লি, আল-মাকতাবা আল-রশিদিয়া, ১৩৭৬ হিজরি), পৃ. ১২৭-১২৮

৮৬. মতিউর রহমান নিজামী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৩

৮৭. গোলাম আযম, *ইকামতে দ্বীনের সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরিণাম* (ঢাকা, লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৮২), পুস্তিকা

৮৮. আব্বাস আলী খান, *জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭৫-৭৬

মাওলানা মওদূদীর মতে, ইসলামী আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামী সমাজ, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করা। আল্লাহর একত্ব ও সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসই হচ্ছে ইসলামী রাজনৈতিক তত্ত্বের সূতিকাগার। মানুষকে ব্যক্তিগত ও যৌথভাবে তার সকল ক্ষমতা আল্লাহর নিকট সমর্পণ করতে হবে। কেউ নিজ ক্ষমতা বা ইচ্ছানুসারে আইন প্রণয়ন করতে পারবে না।[৮৯] ইসলামী রাষ্ট্র আদর্শ-ভিত্তিক রাষ্ট্র বিধায় ইসলাম বাস্তবায়ন করাই হবে এ রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব। ইসলামী রাষ্ট্র ইসলাম বাস্তবায়নের উপায় মাত্র। এ রাষ্ট্র ইসলামী আদর্শ বিশ্বাসী নেতৃত্ব দ্বারা পরিচালিত হতে হবে।[৯০]

ইসলামী রাষ্ট্র মূলত একটি সর্বাত্মকবাদী রাষ্ট্র। মানুষের জীবনের সকল দিককে এ রাষ্ট্রব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। এতদ্‌সত্ত্বেও ইসলাম ব্যক্তিস্বাধীনতা অনুমোদন করে এবং একনায়কতন্ত্রের বিরোধিতা করে।[৯১] ইসলাম ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় রাষ্ট্রের বিরোধী।[৯২] ধর্মনিরপেক্ষতা ও পাশ্চাত্য গণতন্ত্রকে ইসলাম অনুমোদন করে না। ইসলাম চায় খোদার বন্দেগি, বিশ্ব-মানবতা, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও জনগণের খিলাফত।[৯৩]

ইসলামী শাসনতন্ত্র মূলত একটি অলিখিত শাসনতন্ত্র। কুরআন, সুন্নাহ, খুলাফায়ে রাশিদিনের কর্মধারা ও মুজতাহিদগণের সিদ্ধান্ত এর মৌল উৎস। এসব উৎসের ওপর ভিত্তি করে দেশ বিশেষের অবস্থা ও প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে লিখিত শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে হবে।[৯৪]

---

৮৯. Abul Ala Mawdudi, *Politicial Theory of Islam* (Lahore, Islamic Publications Ltd., 1960). pp. 17-18

৯০. Ibid., p. 27

৯১. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ* (ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮৫), পৃ. ৪০

৯২. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *ইসলামী বিপ্লবের পথ* (ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮৭), পৃ. ৮-১১

৯৩. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কর্মসূচি*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৮-৪৯

৯৪. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন* (ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮৭), পৃ. ২-৫

সমাজজীবনে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইসলামী বিপ্লব আবশ্যক। জামায়াতের মতে ইসলামী বিপ্লবের প্রাথমিক শর্তগুলো হচ্ছে–

ক. ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের আন্দোলন

খ. শক্তিশালী ও সুসংগঠিত সংগঠন

গ. ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে অনুকূল জনমত গঠন

ঘ. মানসম্মত, দক্ষ ও ত্যাগী কর্মী বাহিনী তৈরি ও পরিচালনা

ঙ. যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টি

চ. প্রতিপক্ষকে প্রতিরোধের শক্তি অর্জন

ছ. ইসলামী বিপ্লবের সাফল্য ধরে রাখার ক্ষমতা অর্জন ও

জ. ইসলামী বিপ্লবের সাফল্যের জন্য আল্লাহর সাহায্য লাভ[৯৫]

(উপর্যুক্ত বিষয়গুলো পরবর্তী অধ্যায়সমূহে নানাভাবে আলোচিত হয়েছে)।

রাজনৈতিক উন্নয়ন : পাশ্চাত্য, ইসলামী ও জামায়াত ধারণা

লুসিয়েন পাই,[৯৬] কে. অরগানস্কি,[৯৭] জি. এলমণ্ড,[৯৮] এস. এন. আইজেনস্টাড,[৯৯] এল. বাইন্ডার,[১০০] এফ. আর. ভি. মেহডেন[১০১] প্রমুখ পাশ্চাত্যের সমাজ ও

---

৯৫. অধ্যাপক ইউসুফ আলী, *ইসলামী বিপ্লব সংগঠন ও পরিকল্পনা* (ঢাকা, শহীদ স্মৃতি প্রকাশনী, ১৯৮৮), পৃ. ৫০-৫৪। আরও দেখুন, মতিউর রহমান নিজামী, *ইসলামী সমাজ বিপ্লব* (ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৮), পৃ. ১১-১৩

৯৬. Lucian W. Pye, 'Politicl Culture and political Development' in Lucian W. pye and Sidney Verba, eds., *Political Culture and Political Development* (New Jerscy, Princeton University Press, 1965). p. 13

৯৭. A. F. K. Organski, *The Stages of Political Development* (New York, Alfred A. Knopl, 1965). p. 7

৯৮. G. Almond, Quoted in Alfred Diamant, 'Political Development: Approaches to Theory and Strategy' in John D. Montagomery and William J. Siffin, eds., *Approaches to Development: Politics, Administration and Change* (New York, McGraw Hill Book Company, 1966). p. 16

৯৯. S. N. Eisenstadt, Quoted in Samuel p. Hntingion, 'Political Development and Political Decay' in Claude E. Welch. Jr, ed ., *Political Modernization: A Reader in Comparative Political Change* (Belmont, California, Wadsworth Publishing Company, 1967). p. 210

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী উন্নয়নশীল দেশের রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য অনেকগুলো প্রপঞ্চ বা মানদণ্ডের কথা বলেছেন। এসব দেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন যেসব প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে পারে তার বর্ণনা দিয়েছেন। রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য নিম্নোক্ত প্রপঞ্চ পূরণ ও প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়ে থাকে–

১. জাতীয় একাত্মতা (National Identity) প্রতিষ্ঠা

২. জাতীয় ঐক্য (National Integration) প্রতিষ্ঠা

৩. রাজনীতিতে জনগণের অংশগ্রহণ

৪. বৈধতা

৫. জনগণের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান

৬. প্রতিযোগিতামূলক দল ব্যবস্থা

৭. সামরিক বাহিনীর ওপর বেসামরিক নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা

৮. ইহজাগতিক রাজনীতি

৯. রাজনৈতিক গতিশীলতা

১০. শিক্ষার উচ্চহার ইত্যাদি।

জন. এল. এসপোজিটোর মতে, ইসলাম উন্নয়ন বা আধুনিকায়ন বিরোধী নয়। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী মুসলমানরাও উন্নয়ন চান; তবে উন্নয়নের নামে পাশ্চত্যকরণ নয়।[১০২] উন্নয়ন ও পরিবর্তনের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ইসলাম উন্নয়ন অনুমোদন করে; তবে বিশ্বাস ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে পরিবর্তন অনুমোদন করে না। অন্যান্য ক্ষেত্র বিশেষত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন ইসলাম শুধু অনুমোদনই করে না; কামনাও করে।[১০৩]

---

১০০. Leonard Binder, 'Crisis of Political Development' in L. Binder *et. al.*, *Crisis and Sequences in political Development* (New Jersey, princeton University press, 1971). P. 65

১০১. Fred R. Vonder Mehden, *Politics of the Developing Nations* (New Jersey, Prentice Hall inc., 1969). p. 6

১০২. John L. *Esposito, Islam and politics, op. cit.*, pp. 234-235

১০৩. Muhmmad al-Buraey, *Administrative Development: An Islamic Perspective* (London, K. P. I. Limited, 1985). pp. 7. 10. আরও দেখুন,

মাওলানা মুহম্মাদ আবদুর রহীমের মতে–

> ধর্মহীন পথে প্রকৃত পরিবর্তন বা উন্নয়ন সম্ভব হইতে পারে না। উহা দ্বীনি অবকাঠামোর মধ্যেই পূর্ণমাত্রায় এবং যথার্থভাবে কার্যকর হওয়া সম্ভব। ... ইসলামে জীবন ও প্রকৃতি উভয়েরই রূপান্তর সমর্থিত। কুরআন বিরোধী না হইলে মুসলমানরা যেকোনো নতুন চিন্তা, ধ্যান-ধারণা ও নতুন জ্ঞান উদ্ভাবন-আবিষ্কারকে নির্দ্বিধায় মানিয়া লইতে পারে।[১০৪]

জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের নেতা অধ্যাপক খুরশিদ আহমদের মতে, উন্নয়ন সম্পর্কিত ইসলামী ধারণার মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের সার্বিক কল্যাণ। ইসলামে মানুষের নৈতিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি দিকসহ সকল প্রকার উন্নয়ন পরস্পর সম্পর্কিত। ইসলাম মানুষের কল্যাণার্থে স্রষ্টা প্রদত্ত সম্পদসমূহের সর্বোত্তম ব্যবহার চায়।[১০৫] উন্নয়ন সম্পর্কিত ইসলামী ধারণা মাওলানা মওদূদীর নিম্নোক্ত মন্তব্য দ্বারা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে–

> এ দুনিয়া মানুষের জন্য তৈরি করা হয়েছে, সুতরাং তার কাজ হচ্ছে একে ভোগ-ব্যবহার করবে। তবে ভালো-মন্দ, পাক-নাপাক ও সমীচীন-অসমীচীনের প্রতি লক্ষ রেখে ভোগ করবে।[১০৬]

Ibrahim A. Ragab, 'Islam and Development' in kenneth p. Jameson and Charles K. Wiber, eds., *Religious Vlues and Development* (Oxford, pergamon Press, 1981). P. 516. Sulayman S. Nyang, 'The Islamic State and Economic Development: A Theoretical Analysis' in Islamic Culture, Vol. No. I, January, 1976. Michael C. Hudson, Islam and Political Development in John L. Esposito, ed., *Islam and Development: Religion and Socio-Political Change* (New York, Syracuse University Press, 1982). pp. 6-7

১০৪. মুহম্মদ আবদুর রহীম, 'উন্নয়ন : ইসলামী প্রেক্ষিতে', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, অক্টোবর-ডিসেম্বর সংখ্যা, ১৯৮৮, পৃ. ১২৫। আরও দেখুন, Magda Baraka, 'Islam and Development', *Islamic Quarterly*, Vol. XXVIII, 4th Quarter, 1984. pp. 201-216

১০৫. Khurshid Ahmad, 'Economic Development in an Islamic Framework' in Khurshid Ahmad and Zafar Ishaq Ansari, eds., *op. cit.*, pp. 231-32

১০৬. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা* (ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৭৯), পৃ. ২৭

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, পশ্চিমা পণ্ডিতরা জাগতিক উন্নয়নের ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। ইসলাম জাগতিক উন্নয়নের মতো নৈতিক উন্নয়নকেও গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। পরকালের প্রশ্নকে জড়িত করে ইসলাম নৈতিকতাকে শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। পশ্চিমা পণ্ডিতরাও মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য নৈতিকতার উন্নয়ন চেয়েছেন। ইসলাম ব্যক্তিগত নৈতিকতা ও মূল্যবোধের ওপর বেশি জোর দেয়। পশ্চিমা সমাজে সামাজিক নৈতিকতার ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। তবে এ কথা সত্য যে, কোনো দৃঢ় মতাদর্শের পক্ষে সকল সামাজিক ও মূল্যবোধগত পরিবর্তন মেনে নেওয়া সহজ হয় না। ইসলামের পক্ষেও এটি সম্ভব নয়। পশ্চিমা সমাজ বিজ্ঞানীগণ পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক দেশসমূহকে উন্নয়নশীল দেশের রাজনৈতিক উন্নয়নের মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। জামায়াতে ইসলামীর মতো একটি ইসলামী আদর্শানুসারী রাজনৈতিক দলের পক্ষে পশ্চিমা মডেলের উন্নয়নের সকল বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে (যেমন– ইহজাগতিকতা) একমত হওয়া সম্ভব নয়।

রাজনৈতিক উন্নয়নের পূর্বোল্লেখিত প্রপঞ্চসমূহের মধ্যে ১. একাত্মতার সংকট দূরীকরণ, ২. জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠা, ৩. রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, ৪. বৈধতা, ও ৫. অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান আমাদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। বাংলাদেশ এখনও উপরিউক্ত সমস্যাসমূহ কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়নি। এ ছাড়া উপরিউক্ত প্রপঞ্চসমূহ সম্পর্কিত আলোচনায় রাজনৈতিক উন্নয়নের অন্যান্য প্রপঞ্চের বিভিন্ন দিকও এসে যায়। নিম্নে উপরিউক্ত পাঁচটি প্রপঞ্চ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

১. একাত্মতা প্রতিষ্ঠা : একটি রাষ্ট্রের বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি ও অঞ্চলের মানুষ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বা আলাদা বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেও রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে। কোনো রাষ্ট্রের অধিবাসীদর মধ্যে এ জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হলে সে রাষ্ট্র একাত্মতার সংকট দূরীকরণে সক্ষম হয়েছে বলে ধারণা করা যায়।[১০৭]

২. জাতীয় সংহতি বা ঐক্য : একটি রাষ্ট্রের বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি ও অঞ্চলের মানুষের মধ্যে একাত্মতা প্রতিষ্ঠিত হলে সে রাষ্ট্রের জনগণ নিজেদেরকে কেবল বিশেষ ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি ও অঞ্চলের মানুষ না ভেবে

---

১০৭. দেখুন, L. Binder, 'Crisis in Political', *op. cit.*, pp. 53-56.

সামগ্রিকভাবে একটি রাষ্ট্রের অধিবাসী হিসেবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করে। যে রাষ্ট্রের জনগণ এ জাতীয় মনোভাবে উদ্বুদ্ধ, সে রাষ্ট্রে জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়।[১০৮]

৩. **রাজনীতিতে অংশগ্রহণ** : রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জনগণের বিশেষত গোষ্ঠীসমূহের প্রতিনিধিত্ব থাকলে অংশগ্রহণ সম্পর্কিত সংকট সাধারণত দেখা দেয় না। গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থা জনগণ বা গোষ্ঠীসমূহের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারে।[১০৯]

৪. **বৈধতা অর্জন** : একটি রাষ্ট্রের শাসন কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা জনসম্মতির ওপর নির্ভরশীল হলে সে রাষ্ট্রের শাসকগণ বৈধভাবে দেশ শাসন করছেন বলে ধরে নেওয়া হয়। জনগণ যখন শাসকদেরকে বৈধ বলে মনে করে, তখন দেশ বিশেষের শাসকদের বৈধতা সংকট দূরীভূত হয়।[১১০]

৫. **অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান** : যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য জাতীয় সম্পদের সুষম বণ্টনের ব্যবস্থা করতে পারে, সে রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাজনৈতিক উন্নয়ন সহজতর হয়।[১১১]

রাজনৈতিক উন্নয়নের উপরিউক্ত পাঁচটি প্রপঞ্চকে মানদণ্ড ধরে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের নেতৃত্ব, সংগঠন ও আদর্শ বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নে কী ভূমিকা পালন করতে পারে– এ গ্রন্থের পরবর্তী অধ্যায়সমূহে তা সংক্ষেপে আলোচিত হবে। তবে এক্ষেত্রে স্মরণ রাখতে হবে যে, রাজনৈতিক উন্নয়নের উল্লিখিত প্রপঞ্চসমূহ পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠান প্রয়োজন। 'জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ' এখনও বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হতে পারেনি।

---

১০৮. বিস্তারিত ধারণার জন্য দেখুন, Lucian W. pye, 'Identity and the political Culture' in L. Binder et. al., *op. cit.,* pp. 101-134.

১০৯. এ বিষয়ে আরও ধারণার জন্য দেখুন, Myron Weiner, 'Political Participation', in L. Binder et. al., *op. cit.,* pp. 159-2-4.

১১০. এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে, Lucian W. pye, 'The Legitimacy Crisis', in L. Binder et. al., *op. cit.*, pp. 135-158

১১১. দেখুন, L. W. Pye, *Aspects of Political Development* (Boston, Little Brown and Co., 1966). pp. 71-78

গবেষণা পদ্ধতি

এ গবেষণাকর্মে প্রধানত ঐতিহাসিক, বর্ণনামূলক, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষনমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এতে মূল উপাদান থেকে সরাসরি প্রাপ্ত উপাত্ত (Primary Sources) ও দ্বৈতয়িক উপাত্ত (Secondary Sources) ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমোক্ত উপাত্ত সূত্রগুলো হচ্ছে– জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের গঠনতন্ত্র, মেনিফেস্টো, কার্যবিবরণী, প্রচারপত্র, পুস্তিকা, বক্তৃতা-বিবৃতি, সদস্যপদ লাভের আবেদনপত্র, দায়িত্বশীলদের শপথনামা, কর্মীদের ব্যক্তিগত রিপোর্ট ফরম, সাংগঠনিক রিপোর্ট ফরম, নির্বাচনী ইশতেহার, সিলেবাস, সম্মেলন কর্মসূচি, সম্মেলন-প্রস্তাব, সহযোগী সংগঠনের গঠনতন্ত্র, সহযোগী সংগঠনের সিলেবাস ইত্যাদি। এ ছাড়া আদমশুমারি রিপোর্ট, সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন রিপোর্ট, প্রশ্নমালা পূরণ, সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ ইত্যাদিও প্রাথমিক তথ্যসূত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রশ্নমালা পূরণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের জন্য ৮৫টি প্রশ্ন সংবলিত একটি দীর্ঘ প্রশ্নমালা তৈরি করা হয়। এতে উত্তরদাতার ব্যক্তিগত ও পরিবার সম্পর্কে বিভিন্ন উপাত্ত পাওয়ার জন্য সাধারণ প্রশ্ন, জামায়াত নেতৃত্ব, সংগঠন ও আদর্শ বিষয়ক প্রশ্ন ছিল। উপরিউক্ত প্রশ্নমালার মধ্যে ৭৪টি প্রশ্ন ছিল কাঠামোগত (Strictured) ও ১১টি প্রশ্ন ছিল অকাঠামোগত (Unstructured)। উক্ত প্রশ্নমালার উত্তর দিতে যারা সম্মত হননি, তাদেরকে ব্যক্তিগত ও পরিবার সম্পর্কিত ২৩টি প্রশ্ন সংবলিত ছোটো আকারে একটি প্রশ্নমালা সরবরাহ করা হয়। দীর্ঘ প্রশ্নমালাটি পূরণের আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও অনেকে পুরো প্রশ্নমালাটি পূরণ না করে অংশবিশেষ পূরণ করেন।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সহযোগী সংগঠনগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের নেতা-কর্মী সরবরাহে এ সংগঠনটির ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। ইসলামী ছাত্রশিবিরের একটি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ১৮ জন নেতার ব্যক্তিগত পটভূমি জানার জন্যও একটি ছোট্ট প্রশ্নমালা ব্যবহৃত হয়েছে।

এ গবেষণা কাজের জন্য সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতেও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। জামায়াতের কয়েকজন প্রধান কেন্দ্রীয় নেতা, কয়েকজন জেলা নেতা ও থানা নেতার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। প্রধানত পূর্বোক্ত দীর্ঘ প্রশ্নমালাটির ভিত্তিতে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। তবে সাক্ষাৎকারে উক্ত প্রশ্নমালার বাইরের অনেক

প্রশ্নেরও উত্তর পাওয়া গেছে। আমীরে জামায়াত, ভারপ্রাপ্ত আমীর, নায়েবে আমীর, সেক্রেটারি জেনারেলসহ ২৫ জন কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য (কে ক প-এর মোট সদস্য সংখ্যা বর্তমানে [১৯৯১] ২৭ জন), ৮ জন (১১ জনের মধ্যে) সাংগঠনিক সেক্রেটারি, ১৬ জন সাংগঠনিক জেলা আমীর (দৈব নমুনায়নের মাধ্যমে বির্বাচিত) প্রশ্নমালা পূরণ ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে উপাত্ত সরবরাহ করেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, উপরোল্লিখিত সকল নেতৃবৃন্দ 'জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ' কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরারও সদস্য। বর্তমান (১৯৯১) সংসদে জামায়াতে ইসলামীর যে ২০ জন্য সদস্য রয়েছেন, তন্মধ্যে ১৯ জন্য থেকে প্রশ্নমালা পূরণ ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। জামায়াত সাংসদদের ৩ জন কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ এবং ১ জন সাংগঠনিক সেক্রেটারি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ গবেষণার জন্য সাংগঠনিক জেলা, সাংগঠনিক থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের জামায়াত নেতা-কর্মীদের থেকেও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। নমুনা হিসেবে দুটি সাংগঠনিক জেলা, দুটি সাংগঠনিক থানা ও দুটি ইউনিয়নকে বাছাই করা হয়। চট্টগ্রাম উত্তর সাংগঠনিক জেলা, চট্টগ্রাম উত্তর জেলাধীন হাটহাজারী থানা ও হাটহাজারী থানাধীন দক্ষিণ পাহাড়তলী ইউনিয়ন এবং লক্ষ্মীপুর সাংগঠনিক জেলা, লক্ষ্মীপুর জেলার রায়পুর থানা ও রায়পুর থানার চরপাতা ইউনিয়নকে নমুনা হিসেবে নেওয়া হয়। চট্টগ্রাম ও লক্ষ্মীপুর (বৃহত্তর নোয়াখালীর অংশবিশেষ) অঞ্চলের মানুষ বিশেষভাবে ধর্মপরায়ণ বলে পরিচিত। এ উভয় অঞ্চলে বড়ো বড়ো ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে। এতদ্‌সত্ত্বেও এ দুটি সাংগঠনিক জেলায় গত সংসদ নির্বাচনে জামায়াত কোনো আসন পায়নি। চট্টগ্রাম উত্তর জেলা ও লক্ষ্মীপুর জেলার উপরিউক্ত সাদৃশ্য এবং উভয় উঞ্চল ব্যক্তিগতভাবে এ লেখকের পরিচিত বলে এ দুটি অঞ্চলকে কাজের সুবিধার্থে নমুনা হিসেবে বেছে নেওয়া হয়।

জামায়াতে ইসলামীর চট্টগ্রাম উত্তর জেলা কমটির ১২ জনের মধ্যে ৮ জন, হাটহাজারী থানা (শহর) কমিটির– সকল সদস্য, দক্ষিণ পাহাড়তলী ইউনিয়ন কমিটির ১০ জনের মধ্যে ৭ জন থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। লক্ষ্মীপুর জেলা কর্ম-পরিষদের ১২ জনের মধ্যে ১০ জন, রায়পুর থানা কমিটির ১২ জনের মধ্যে ৯ জন এবং চরপাতা ইউনিয়ন কমিটির সকল সদস্য থেকে তথ্য সংগ্রহ সম্ভব হয়েছে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ, প্রশ্নমালা পূরণ ইত্যাদির জন্য বিভিন্ন স্তরের জামায়াতে ইসলামীর নেতাদের সঙ্গে বারবার দেখা-সাক্ষাৎ করতে হয়েছে। এর ফলে জামায়াতের নেতা, কর্মী, সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ীদের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ পেয়েছি। জামায়াতে ইসলামীর নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, পর্যবেক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে জামায়াতের নেতা-কর্মীদের আচার-আচরণ, জামায়াতের কর্মপদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত হওয়ার সুযোগ হয়েছে। এ গবেষণা কাজে পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতাও কাজে লেগেছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, জামায়াতে ইসলামী হিন্দের কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য আমি ভারতে গিয়েছিলাম। এ সময় জামায়াতে ইসলামী হিন্দের পশ্চিমঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি।

এ গবেষণা কাজে দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত উপাত্ত সূত্র হিসেবে নেতৃত্ব, সংগঠন, আদর্শ, ধর্ম, রাজনৈতিক দল, রাজনৈতিক উন্নয়ন প্রভৃতি সম্পর্কিত গ্রন্থ, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, অপ্রকাশিত সন্দর্ভ, মাওলানা মওদূদী ও অন্যান্য জামায়াত নেতার রচিত বই-পুস্তক, ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাস ও কর্মকাণ্ডবিষয়ক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ, জামায়াত আন্দোলন ও সংগঠনের পক্ষে-বিপক্ষে রচিত বই-পুস্তক ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়েছে। উপরিউক্ত তথ্যসূত্রসমূহ থেকে আহরিত উপাত্ত যাচাই, বাছাই, বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন ইত্যাদির মাধ্যমে নির্মোহভাবে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার আন্তরিক প্রয়াস পেয়েছি।

সীমাবদ্ধতা

এ গবেষণা কর্মের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সীমাবদ্ধতাসমূহ অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি।

১. 'জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ' একটি ধর্মীয় আদর্শভিত্তিক রাজনৈতিক সংগঠন। এ সংগঠনের নেতা-কর্মীগণ অন্যান্য আদর্শভিত্তিক সংগঠনের ন্যায় মূল্যবোধ প্রভাবিত হওয়াই স্বাভাবিক। এ কারণে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ নেতা-কর্মীদের থেকে নির্মোহ তথ্য পাওয়া খুবই কষ্টকর। প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কতটা নির্মোহ তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে, সে সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হয়নি।

২. জামায়াত, এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনসমূহের প্রচুর সংখ্যক প্রকাশনা রয়েছে। বিভিন্ন স্তরের জামায়াত নেতা-কর্মীগণের পাঠ্যরূপে এসব প্রকাশনার একটা বড়ো অংশ জামায়াত সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত। তাই প্রশ্নমালা পূরণ ও

সাক্ষাৎকারের অনেক প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্র থেকে ইউনিয়ন পর্যায়ের অনেক নেতা প্রায় একই ধরনের বক্তব্য দিয়েছেন। এ কারণে উত্তরদাতাদের প্রদত্ত উত্তরের সঙ্গে পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞানকেও কাজে লাগাতে হয়েছে। এ কাজের সাফল্য সম্পর্কেও নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

৩. জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র আন্দোলন ও সংগঠনের পক্ষে-বিপক্ষে কিছু জনপ্রিয় রচনা বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও এ সম্পর্কে এ পর্যন্ত বিশেষ কোনো গবেষণাকর্ম হয়নি। তথ্যধর্মী রচনা নয় বিধায় পূর্বোক্ত জনপ্রিয় রচনাসমূহ এ গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হয়নি।

৪. জামায়াতের আন্দোলন ও সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মওদূদীসহ অবাংলাভাষী জামায়াত নেতাদের অধিকাংশ রচনা জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনসমূহ কর্তৃক ইতোমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। মাওলানা মওদূদীর অনেক রচনা ইংরেজিতেও অনূদিত হয়েছে। এ গবেষণাকাজে মাওলানা মওদূদীর বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় অনূদিত বই-পুস্তক প্রধানত ব্যবহার করা হলেও অনেক ক্ষেত্রে মূল উর্দু বইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়েছে। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ নেতাদের ব্যক্তিগত লাইব্রেরি, ঢাকাস্থ মওদূদী রিসার্চ একাডেমি ইত্যাদিতে পাকিস্তান ও ভারত থেকে প্রকাশিত জামায়াত প্রকাশনার কিছু অংশ দেখার সুযোগ হয়েছে।

এ অধ্যায়ের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব, সংগঠন ও আদর্শের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সামাজিক প্রয়োজনেই মানুষকে রাজনৈতিক সংগঠনসহ বিভিন্ন ধরনের সংগঠন গড়ে তুলতে হয় এবং সব সংগঠনে মুষ্টিমেয় লোকই নেতৃত্বের আসনে আসীন হন। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র ও সংগঠনে জাগতিক-অজাগতিক ক্ষমতার বিভাজন স্বীকৃত হয় না বলে এ জাতীয় রাষ্ট্র ও সংগঠনের নেতৃত্ব ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ও সংগঠনের নেতৃত্বের তুলনায় অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকেন। পশ্চিমা উন্নত দেশসমূহের রাজনীতিতে আদর্শের ভূমিকা বর্তমানে হ্রাস পেলেও উন্নয়নশীল দেশসমূহের রাজনীতিতে আদর্শ এখনও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত হয়। মুসলিমপ্রধান দেশসমূহে রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে ইসলামের আবেদন রয়েছে। বাংলাদেশের রাজনীতিতেও ইসলামের আবেদন সুস্পষ্ট। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষে ধর্ম ইসলামকে রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে ইসলামী আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

রাজনৈতিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়রূপে বিবেচিত হয়। বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মের আবেদন শক্তিশালী বলে এখানকার রাজনীতি অধ্যয়নের ক্ষেত্রেও এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি অধীত হওয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশকে সবচেয়ে সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খল সংগঠন বলে মনে করা হয়। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এক বিরাট কর্মীবাহিনী রয়েছে। নির্বাচনী রাজনীতিতেও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র সাফল্য কম নয়। গত সংসদ নির্বাচনে (১৯৯১) প্রাপ্ত ভোটসংখ্যার দিক দিয়ে তৃতীয় এবং সাংসদের সংখ্যার দিক দিয়ে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র স্থান ছিল চতুর্থ। বাংলাদেশ ইসলামী আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে আগ্রহী সংগঠনসমূহের মধ্যে জামায়াত সবচেয়ে শক্তিশালী। তাই বাংলাদেশের রাজনীতি অধ্যয়নে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ রাজনীতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত হওয়া স্বাভাবিক। যেকোনো রাজনৈতিক দল বিষয়ক আলোচনা বা গবেষণায় তার নেতৃত্ব, সংগঠন ও আদর্শ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠে। এ তিনটি বিষয় আলোচনা করতে গেলে গোটা দলের প্রায় সকল প্রধান প্রধান বিষয় আলোচনায় এসে যায়। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশে'র রাজনীতি অনুসন্ধান বিষয়ক এ গ্রন্থেও তাই জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র নেতৃত্ব, সংগঠন ও আদর্শকেন্দ্রিক আলোচনা প্রাধান্য পাবে। জামায়াতে ইসলামী হিন্দ ও জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান'র উত্তরাধিকার বহন করলেও এ গ্রন্থের আলোচনা আইনানুগভাবে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র প্রকাশ্য কার্যক্রম শুরু (১৯৭৯) থেকে বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাশ (১৯৯১) পর্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রধানত সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

জামায়াতে ইসলামীর মতে– হযরত মুহাম্মাদ সা. মুসলমানদের জন্য আল্লাহ মনোনীত নেতা। তাই তিনি ও তাঁর একান্ত অনুসারী ইসলামের প্রথম চার খলিফা ইসলামী নেতৃত্বের মডেল বা আদর্শ বলে বিবেচিত হন। হযরত মুহাম্মাদ সা.-এর অনুসারী সকল নেতৃত্ব নায়েবে রাসূলের মর্যাদার অধিকারী। রাসুল সা.-এর অনুসারী নেতৃত্বের আনুগত্য মুসলমানদের ধর্মীয় দায়িত্ব বলে মনে করা হয়।

জামায়াতের মতে– ইসলামী নেতৃত্ব কেবল উত্তরাধিকার, সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন লাভ, ব্যক্তিগত যোগ্যতা প্রভৃতির ওপর নির্ভরশীল নয়; বরং মুসলমানদের নেতৃত্বকে আবশ্যিকভাবে ইসলামী আদর্শানুসারী, ধর্ম বিষয়ে জ্ঞানী ও নিষ্ঠাবান ধার্মিক হতে হবে।

জামায়াতে ইসলামীর মতে– ইসলামী সংগঠনের কুরআন ও সুন্নাহর অনুসারী সিদ্ধান্তকে কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশের অনুগামীর মর্যাদা দিতে হবে। ইসলামী সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত হয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা মুসলমানদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বলে জামায়াত বিশ্বাস করে। উন্নততর ইসলামী সংগঠনে যোগদানের উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে কেউ ইসলামী সংগঠন ত্যাগ করতে পারে না। ইসলামী নেতৃত্বের ন্যায় ইসলামী সংগঠনকেও জামায়াত ধর্মীয় মর্যাদার অধিকারী মনে করে। তাই এ সংগঠনে যাঁরা কাজ করেন, তাঁরা মূলত ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করেন।

মাওলানা মওদূদীর মতে– ইসলামী রাষ্ট্র একটি আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র। ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নই এ রাষ্ট্রের লক্ষ্য। মানবজীবনের সকল দিককে এ রাষ্ট্রব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে চায় বলে এটিতে সর্বাত্মক রাষ্ট্রও বলা যায়। ইসলাম ব্যক্তিস্বাধীনতা অনুমোদন করে এবং একনায়কতন্ত্রের বিরোধিতা করে। ইসলাম ইসলামী আদর্শানুসারী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়; ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী পশ্চিমা গণতন্ত্র নয়। ইসলাম ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরোধী। ইসলাম ব্যক্তি বিশেষ বা জনগণের সার্বভৌমত্বে নয়; আল্লাহর সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করে।

মওদূদীর মতে– ইসলামী শাসনতন্ত্র একটি অলিখিত শাসনতন্ত্র। কুরআন, সুন্নাহ, খুলাফায়ে রাশিদিনের আদর্শ ও মুজতাহিদগণের সিদ্ধান্তভিত্তিক এর কয়েকটি নির্দিষ্ট উৎস রয়েছে। এসব উৎসের ওপর ভিত্তি করে দেশ বিশেষের অবস্থানুসারে লিখিত শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে হবে।

জামায়াতের মতে– ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী বিপ্লব সফল করা প্রয়োজন। এ বিপ্লবের সাফল্যের জন্য শক্তিশালী ইসলামী আন্দোলন, ইসলামী সংগঠন, অনুকূল জনমত, দক্ষ ও ত্যাগী নেতা-কর্মী, প্রতিপক্ষকে প্রতিরোধ এবং বিপ্লবের সাফল্য ধরে রাখার ক্ষমতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে মহান আল্লাহর সাহায্যও অবশ্যই লাভ করতে হবে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, নেতৃত্ব, সংগঠন ও আদর্শের বিভিন্ন বিষয়ে ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত রাজনীতি বিজ্ঞানের ধারণার সঙ্গে ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র ধারণার ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে জামায়াত রাজনীতি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে,

আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গির এ ভিন্নতার কারণে বহু জনপ্রিয় যুগদাবি ও রাজনৈতিক বাস্তবতাকে সময়মতো জামায়াতের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। ধর্ম ও রাজনীতির সম্পর্ক, ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ, জাতীয় রাষ্ট্র, পাশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র, জনগণের সার্বভৌমত্ব ও আইন প্রণয়নের অধিকার, রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সংগঠন, রাজনৈতিক আদর্শ প্রভৃতি সম্পর্কিত জামায়াত দৃষ্টিভঙ্গি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে এ অঞ্চলের জনগণের মনে সাধারণভাবে যে দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে, তার অনেকাংশের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ নয়। তবে রাজনৈতিক বাস্তবতার কারণে উপরিউক্ত বিষয়াবলির অনেকগুলোর ক্ষেত্রে জামায়াতকে আপস করতে হয়েছে। এ গবেষণায় নেতৃত্ব, সংগঠন ও আদর্শের বিভিন্ন বিষয়ে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র তত্ত্বগত ধারণা ও প্রয়োগের পার্থক্য আলোচিত হয়েছে।

আধুনিক রাজনীতি বিজ্ঞান আলোচনায় রাজনৈতিক উন্নয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত হয়। ইসলাম উন্নয়ন এবং পরিবর্তন চায়, তবে ধর্ম বিশ্বাস ও নৈতিকতাকে ইসলাম পরিবর্তনযোগ্য মনে করে না। কেবল জাগতিক উন্নয়ন ইসলামের লক্ষ্য নয়। জাগতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিও ইসলাম কামনা করে। উন্নয়ন বিষয়ক উপরিউক্ত ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিকে জামায়াত সমর্থন করে। উন্নয়নশীল দেশের রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য অনেকগুলো প্রপঞ্চ বা মানদণ্ডের কথা বলা হলেও এ গ্রন্থে একাত্মতা সংকট দূরকরণ, জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠা, জনগণ কর্তৃক রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, বৈধতা ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান এ পাঁচটি প্রপঞ্চকে সামনে রেখে বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র নেতৃত্ব, সংগঠন ও আদর্শ কী ভূমিকা পালন করতে পারে– তা বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা করা হয়েছে।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ বর্তমানে পূর্বের যেকোনো সময়ের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে আবির্ভূত হতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম প্রধান দেশেও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশ ও মুসলিম বিশ্বের এ প্রেক্ষাপটে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের নেতৃত্ব, সংগঠন ও আদর্শ সম্পর্কে যথাসম্ভব নিরপেক্ষভাবে গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। এ বিবেচনা থেকেই 'নেতৃত্ব, সংগঠন ও আদর্শ : জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র ওপর একটি সমীক্ষা (Leadership,

Organization and Ideology : A Case Study of Jamaat-e-Islami Bangladesh) বিষয়ে গবেষণা করতে আগ্রহী হই। আমাদের জানামতে উপরিউক্ত বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনো গবেষণা হয়নি। তাই এ গবেষণাকর্ম জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র নেতৃত্ব, সংগঠন ও আদর্শ সম্পর্কিত গবেষণার ক্ষেত্রে একটি প্রাথমিক প্রচেষ্টা বলে বিবেচিত হতে পারে।

*****

দ্বিতীয় অধ্যায়

জামায়াত নেতৃত্ব

মানবসভ্যতার সূচনাকাল থেকে মানুষের সামাজিক তথা যৌথ কর্মকাণ্ড প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। মানুষ তার নিরাপত্তা, কল্যাণ ও উন্নতির জন্য সমাজজীবনকে বেছে নেয় এবং বিভিন্ন ধরনের সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। সামাজিক কর্মকাণ্ডে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি মানুষকে অন্যের নেতৃত্ব মেনে নিতে হয়, নতুবা নিজেকে নেতৃত্ব দানে এগিয়ে যেতে হয়। আমরা জানি, সমাজের সকল সদস্যের সমান যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকে না। তুলনামূলকভাবে বেশি জ্ঞান, দক্ষতা, ব্যক্তিত্ব, সম্মোহন শক্তি ইত্যাদি গুণসম্পন্ন ব্যক্তি সাধারণত সামাজিক নেতৃত্বে আসীন হন।

এ অভিসন্দর্ভের ভূমিকায় নেতৃত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে নেতৃত্ব সম্পর্কিত পাশ্চাত্য, ইসলামী ও জামায়াত ধারণা আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে উপরিউক্ত ধারণাসমূহের মধ্যে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হবে। পাশ্চাত্য, ইসলাম ও জামায়াতের নেতৃত্ব বিষয়ক তত্ত্বগত ধারণার সঙ্গে বাস্তবতার পার্থক্যও আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র নেতৃত্বের ভূমিকাও সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। উপরিউক্ত বিষয়গুলোর একটি সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন উপস্থাপনেরও চেষ্টা করা হয়েছে।

নেতৃত্ব : পাশ্চাত্য ধারণা

বলা হয়, কোনো বিশেষ লক্ষ্যাভিসারী কর্মকাণ্ডে জনগণকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করার কার্যক্রমই নেতৃত্ব।[১১২] একটি সংগঠিত গোষ্ঠীর লক্ষ্য নির্ধারণ

---

১১২. Ordway Tead, *The Art of Leadership* (New York, McGraw Hill Book Company, 1935). p. 20

ও লক্ষ্যার্জন কার্যক্রমকে প্রভাবিত করার প্রক্রিয়াকে স্টগডিল নেতৃত্ব বলে অভিহিত করেছেন।[১১৩] টেনেনবম ও ম্যাসারিকের মতে, নেতা তাঁর অনুসারীদের আচরণে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে থাকেন।[১১৪] ফ্লেইসম্যানও প্রায় অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।[১১৫] ফেডলারের মতে, নেতা হলেন গোষ্ঠীর মধ্যকার সে ব্যক্তি, যিনি গোষ্ঠীর কার্যক্রম পরিচালনা এবং তা সমন্বয় করেন।[১১৬]

নেতৃত্বকে প্রধানত রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক এ দু'ভাগে ভাগ করা যায়। রাজনৈতিক নেতা সরকারি পদ লাভ করে বা সরকার পরিচালনার দায়িত্ব লাভের জন্য কার্যরত রাজনৈতিক দলের (সরকার বিরোধী দল) নেতৃত্বে আসীন হয়ে তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করার প্রয়াস পান।[১১৭]

নেতৃত্ব সম্পর্কিত আধুনিক আলোচনায় এলিটতত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়। তত্ত্ব হিসেবে বিংশ শতাব্দীতে এটি জনপ্রিয় হয়ে উঠলেও প্রাচীনকাল থেকেই নানাভাবে এ সম্পর্কিত আলোচনা চলে আসছে। বিভিন্ন প্রশ্নে ভিন্নমত থাকলেও প্যারেটো, মসকা, মিশেলস, লাসওয়েল, কার্ল মেনহেইম, র‍্যামন্ড অ্যারন ও অন্যান্য আধুনিক এলিট তাত্ত্বিকগণ এ বিষয়ে একমত যে, মানবেতিহাসের সর্বযুগে মুষ্টিমেয় শাসকগণই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে শাসন করেছে এবং ভবিষ্যতের শাসকরাও তা-ই করবে।[১১৮]

---

১১৩. Ralph M. Stogdill, quoted in, Ordway Tead; *Ibid*, p. 208

১১৪. Robert Tannenbaum and Fred Massarik, quoted in F. Kast and J. E. Rosenzweig, *Organisation and Management* (Singapore, McGraw Hill Book Company, 1958). p. 364

১১৫. Edwin A. Fleishman, 'Twenty Years of Consideration and Structure' in Edwin A. Fleishman and James G. Hunt, eds., *Current Development in the Study of Leadership* (Carbondale, Southern Illinois University Press, 1973). p. 3

১১৬. Fred E. Fedler, *A Theory of Leadership Effectiveness* (New York, McGraw Hill Book Company, 1967). p. 8

১১৭. এ প্রসঙ্গে আলোচনা রয়েছে, Zbigniew Brezinski and s.p. Huntington, 'Political Leadership in Modern Society', in R. C., Macridis and B. E. Brown, eds., *Comparative Politics: Notes and Readings* (Illinois, The Dorsey Press, 1965). pp. 557- 59

১১৮. এলিটতত্ত্বের নানা বিষয় সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে Vilfredo Pareto, *The Mind and Society* (New York, Harcourt, Brace and Co.,1935), Gaetano

এঁদের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, সকল ধরনের রাজনৈতিক দল বা সংগঠন মুষ্টিমেয় লোকের শাসনাধীন হয়ে পড়তে বাধ্য হয়। দল পরিচালনার যোগ্যতা ও দক্ষতা মুষ্টিমেয় লোকেরই থাকে। এ মুষ্টিমেয় লোকেরাই দলের তহবিল, যোগাযোগ মাধ্যম ইত্যাদিকে নিয়ন্ত্রণ করেন বলে প্রায় সকল ক্ষমতা এঁদের করায়ত্তে চলে যায়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও জনগণের নামে মুষ্টিমেয় লোকই মূলত শাসন করে।[১১৯]

নেতৃত্ব কোনো বিমূর্ত ধারণা নয়। কার্যক্রম, প্রভাব বিস্তার, লক্ষ্যার্জন, সক্ষমতা ইত্যাদি দ্বারা নেতৃত্বের ধরন ও সফলতা-ব্যর্থতা নিরূপণ করা যায়। সমাজব্যবস্থা ভেদে নেতৃত্বের গুণাবলি, কার্যক্রম ও সাফল্য-ব্যর্থতা ইত্যাদিতে পার্থক্য পরিলক্ষিত হতে পারে।[১২০] অনুসারীদের আত্মবিশ্বাস বর্ধনে অনুপ্রেরণা দান, অনুসারীদের লক্ষ্যাভিমুখে পরিচালনা করা, অনুসারীদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হ্রাস, অনুসারী তথা জনগণের কল্যাণ সাধন, জনগণের অনুভূতি ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অনুধাবন, সংগঠন ও দেশ পরিচালনার উপযোগী জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, সাহস, কৌশল ইত্যাদিকে একজন যোগ্য নেতার প্রয়োজনীয় গুণাবলি বলে মনে করা হয়।[১২১]

Mosca, *The Ruling Class* (New York, McGraw Hill Book Company, 1939), Robert Michels, *Political Parties, op. cit.*, Harold Lasswell, *Politics: Who Gets What, When, How* (New York, Meridian Books, 1958), Robert A. Dahl, *Modern Political Analysis* (New Jersey, Prentice Hall, 1963), T. B. Bottomore, *Elites and Society* (New York, Basic Books, 1964), C. Wright Mill, *The Power Elite* (New York, Oxford University Press, 1956), Raymond Aron, 'Social Class, Political Class, Ruling Class's, in R. Bendix and S. M. Lipset, eds., *Class, Status and Power* (New York, The Free Press, 1966)

১১৯. Robert Michels, *op. cit.*, pp. 73. 365

১২০. Robert J. Blackely, quoted in Jack W. Taylor, *How to Select and Develop Leaders* (New York, McGraw Hill Book Co. inc., 1962). p. 7

১২১. নেতৃত্বের গুণাবলি, যোগ্যতা ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণার জন্য দেখুন, Jack W. Taylor, *op. Cit.*, pp. 31-32. Eric Hoffer, *The True Believer: Thoughts of the Nature of Mass Movements* (New York, The New American Library, 1958). pp. 105-6. Jack R. Gibb, 'Dynamics of Leadership and Communication' in R. Lassy and Richard R. Fernandez, eds., *Leadership and Social Change* (California, University Associates lin., 1976). p. 107

একজন ব্যক্তি কীভাবে নেতৃত্বের পদে আসীন হতে সক্ষম হন, সে সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্ব রয়েছে। এসব তত্ত্বের মধ্যে মহামানব তত্ত্ব ও পরিবেশ বা অবস্থানগত তত্ত্ব অন্যতম। মহামানব তত্ত্বানুসারে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও সামর্থ্যের শক্তিতেই একজন ব্যক্তি নেতৃত্বের পদে আসীন হয়। পরিবেশ বা অবস্থানগত তত্ত্বানুযায়ী একটি বিশেষ পরিস্থিতি বা পরিবেশই একজন ব্যক্তিকে নেতৃত্বের পদে আসীন হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে। আবার কারও কারও মতে, কেবল ব্যক্তিগত গুণাবলি কিংবা পরিবেশ নয়; বরং উপরিউক্ত উভয়দিক একজন ব্যক্তিকে নেতৃত্বের পদ পেতে সহায়তা করে। একটি বিশেষ পরিবেশ একজন বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে নেতৃত্বের পদে আসীন হতে বিশেষভাবে উপযোগী হতে পারে। হঠাৎ করেও সঠিক জায়গায় সঠিক লোকটি আসীন হয়ে যেতে পারেন।[১২২]

নেতৃত্ব, আদর্শ ও উন্নয়ন পরস্পর সম্পর্কিত বিষয়। দেশ বিশেষের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও উন্নয়নের মান ঐ দেশের নেতৃত্বের চরিত্র ও ধরন বিনির্মাণে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। আবার একটি দেশের উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক ধরনও ওই দেশের নেতৃত্ব, রাজনীতি ও আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে।[১২৩]

আগেকার যুগে ভয়, বঞ্চনা কিংবা পুরস্কার লাভের আশায় সাধারণত নেতৃত্বকে মান্য করা হতো। বর্তমানের পরিবর্তিত অবস্থায় পূর্বোক্ত উপাদানগুলোর সঙ্গে আইন মানা, শৃঙ্খলাবোধসহ নানাবিধ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ যুক্ত হয়েছে। বৈধতা সম্পর্কিত অনুভূতিও একজন নেতার নেতৃত্ব মেনে নিতে জনগণকে অনুপ্রাণিত করে।[১২৪] ম্যাক্সওয়েবারের মতে– বৈধ ক্ষমতা আইনগত, ঐতিহ্যগত ও সম্মোহনী এ তিন ধরনের হতে পারে।[১২৫]

---

১২২. William G. Scott, *Organisation Theory: A Behavioral Analysts for Management* (Illisnois, Richard D. Irwin Inc., 1971). p. 213. আরও দেখুন, E. p. Hollander, *Leaders, Group, and influence* (New York, Oxford University Press, 1904). p. 6

১২৩. Bashir Khadra, 'Leadership, Ideology and Development in the Middle East', in Sami Hajjar ed., *The Middle East: From the Transition to Development* (Leiden, E. J. Brill, 1985). P. 108

১২৪. Stephen Cotgrove, *The Science of Society* (London, George Allen and Unwin, 1980). pp. 162-63

১২৫. Maxweber, *The Theory of Social and Economic Organization* (New York, The Free press, 1966). p. 328

নেতার আইনগত কর্তৃত্ব জন-সম্মতির ওপর নির্ভরশীল। এটি নৈর্ব্যক্তিক কর্তৃত্ব। নেতাকে নয়; পদকে মেনে চলা হয়। ঐতিহ্যগত কর্তৃত্ব উত্তরাধিকার ভিত্তিতে প্রাপ্ত হয়। বীরত্ব, দুর্লভ গুণাবলি ইত্যাদি কারণে বিশেষ সময়ে বিশেষ ব্যক্তি তাঁর অনুসারীদের কাছে সম্মোহনী ব্যক্তিত্বে পরিণত হন এবং অনুসারীরা তাঁর নেতৃত্বকে বৈধ বলে গ্রহণ করে নেয়।[১২৬] এ ছাড়া শিক্ষা, অর্থনৈতিক ক্ষমতা, প্রচারণা, শক্তি প্রয়োগ, সন্ত্রাস ইত্যাদিও রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ ও তার বৈধতা আনতে সহায়ক হতে পারে।[১২৭] গণতন্ত্র, কর্তৃত্ববাদ, সর্বাত্মকবাদ ইত্যাদি শাসনব্যবস্থা ভেদে নেতা ও অনুসারীদের সম্পর্কের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নেতা অনুসারীদের কর্তৃক নির্বাচিত ও অপসারিত হন। নেতা তত্ত্বগতভাবে হলেও অনুসারীদের নিকট তাঁর কার্যক্রমের জন্য দায়ী থাকেন। কর্তৃত্ববাদ ও সর্বাত্মকবাদে অনুসারীদের ক্ষমতা এবং নেতার ওপর নিয়ন্ত্রণ অনেক কম হয়। দলব্যবস্থা উদ্ভবের পর থেকে রাজনৈতিক নেতারা দলের মাধ্যমে জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়াস পান। এ ব্যবস্থায় রাজনৈতিক এলিটদের নিকট সাধারণ জনগণের গুরুত্ব পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।[১২৮]

নেতৃত্ব : ইসলামী ধারণা

ইসলাম নেতৃত্বের ওপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। নেতৃত্বের প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বলা হয়েছে–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ... (٥٩)

"হে বিশ্বাসীগণ, আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যকার সেসব ব্যক্তিবর্গের, যারা সামগ্রিকভাবে দায়িত্বসম্পন্ন (নেতৃবৃন্দ)।"[১২৯]

---

১২৬. Maxweber, 'Authority and Legitimacy' in Eric Nordlinger ed., *Politics and Society* (New Jersey, Prentice Hall Inc., 1970). p. 36. ক্যারিশমার সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আরও ধারণার জন্য দেখুন, Gary A. Tuki, *Leadership in Organization* (New Jerscy, Prentice Hall, Inc., 1981). p. 60

১২৭. Alfred dc Grazia Political, *op. cit.,* p 87 আরও দেখুন, Robert A Dhal, *Who Governs?* (New York, Yale University Press, 1961). pp. 266-67

১২৮. Joseph Lapalambora and Myron Weiner, 'The Origin', *op. cit.*, p. 4

১২৯. আল কুরআন, সূরা নিসা : ৫৯

হাদিসে বর্ণিত আছে–

إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

"তিনজন ব্যক্তি একসঙ্গে ভ্রমণে বের হলেই তারা যেন তাদের মধ্য থেকে একজনকে নেতা নির্বাচিত করে নেয়।"[১৩০]

অন্য হাদিসে বলা হয়েছে–

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَى اللهَ وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي.

"যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, প্রকারান্তরে সে আল্লাহর আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি আমাকে অমান্য করল, প্রকারান্তরে সে আল্লাহকে অমান্য করল। যে ব্যক্তি আমীরের (নেতার) আনুগত্য করল, পক্ষান্তরে সে আমার আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি আমীরকে অমান্য করল, সে মূলত আমাকেই অমান্য করল।"[১৩১]

উপরিউক্ত উদ্ধৃতাংশ ছাড়াও কুরআন ও হাদিসে বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিভিন্নভাবে নেতৃত্ব সম্পর্কে আলোচনা এসেছে। কুরআন ও হাদিসের এসব বক্তব্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আল্লাহ ও তাঁর নবি হযরত মুহাম্মাদ সা. সংঘবদ্ধ জীবন ও নেতৃত্বের ওপর নানাভাবে গুরুত্বারোপ করেছেন।

মুসলমানদের ইসলামী আদর্শানুসারী নেতৃত্ব বিশেষত রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে যিনি নেতৃত্ব দেবেন, তাঁকে নিম্নোক্ত গুণাবলিসম্পন্ন হওয়া উচিত। নেতাকে ইসলাম ধর্মাবলম্বী 'মুমিন' (সূরা নিসা : ৫৯), পুরুষ (বুখারি), বয়োপ্রাপ্ত, সুস্থ, বিবেকসম্পন্ন (সূরা নিসা : ৫), ইসলামী রাষ্ট্রের অধিবাসী (সূরা আনফাল : ৭২), ধর্মপরায়ণ, খোদাভীরু (সূরা হুজুরাত : ১৩) আমানতদার ও আস্থাভাজন (সূরা নিসা : ৫৮), জ্ঞানী, স্বাস্থ্যবান (সূরা বাকারা : ২৪৭) ও পদের প্রতি নির্লোভ (বুখারি ও মুসলিম) হতে হবে।[১৩২]

---

১৩০. আল হাদিস, উদ্ধৃত, সুলাইমান ইবনে আশআছ, *সুনানে আবু দাউদ*, প্রথম খণ্ড (কানপুর, আল মাজিদি, তারিখ নেই), পৃ. ৩৫১

১৩১. আল হাদিস, উদ্ধৃত, মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল বুখারি, *সহিহুল বুখারি*, ২য় খণ্ড (দিল্লি, কুতুবখানা রশিদিয়া, তারিখ নেই), পৃ. ১০৫৭

১৩২. দেখুন, আবদুর রাজ্জাক, *ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য* (ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭), পৃ. ৬৯-৭৩

এখানে উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন মুসলিম পণ্ডিত যুগের প্রয়োজনের নিরিখে মুসলমানদের নেতৃত্বকে আরও বিভিন্ন গুণ ও যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়ার কথা বলেছেন।

ইসলাম 'শূরা' বা পরামর্শভিত্তিক শাসনব্যবস্থার পক্ষে নির্দেশনা দিয়েছে। ইসলামের মতে– নেতা বা শাসক তাঁর অনুসারীদের সঙ্গে পরামর্শ করে রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

...وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ... ﴿١٥٩﴾

"(হে নবি,) আপনি সামগ্রিক বিষয়ে তাঁদের (পরামর্শকদের) সঙ্গে পরামর্শ করুন।"[১৩৩]

কুরআনে আরও বলা হয়েছে–

...وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ... ﴿٣٨﴾

"তাঁদের সকল কাজ পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়।"[১৩৪]

হযরত মুহাম্মাদ সা. তাঁর অনুসারীদের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রায় সকল ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। এ প্রসঙ্গে আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত হাদিস হচ্ছে– "সঙ্গীদের সঙ্গে রাসূল সা. অপেক্ষা বেশি পরামর্শ করতে আমি কাউকে দেখিনি।"[১৩৫] ইসলামের 'শূরা' বা পরামর্শভিত্তিক শাসনব্যবস্থাকে এক ব্যক্তির শাসন ও জনগণের শাসনের মধ্যবর্তী ভারসাম্যমূলক ব্যবস্থা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এ অর্থে খিলাফতকে 'বহুজনের পরামর্শভিত্তিক একজনের শাসন' বলা যেতে পারে। আবার 'মজলিশে শূরা'র ধারণা আধুনিক আইন পরিষদের সঙ্গে তুলনীয় বলে কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন।[১৩৬]

ইসলামে নেতার আনুগত্য শর্তহীন নয়। হাদিসে বর্ণিত আছে–

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ.

---

১৩৩. *আল কুরআন*, সূরা আলে ইমরান : ১৫৯

১৩৪. *আল কুরআন*, সূরা শূরা : ৩৮

১৩৫. আল হাদিস, উদ্ধৃত, সাখাওয়াতুল আম্বিয়া, *ইসলামী শাসনব্যবস্থা* (ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭), পৃ. ১২

১৩৬. মুহাম্মাদ আসাদ, *ইসলামের রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার মূলনীতি* (ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬), পৃ. ৫৩-৬২

"পাপ কাজে আনুগত্যের সুযোগ নেই; কেবল সৎকাজের ক্ষেত্রেই আনুগত্য করতে হবে।"[১৩৭]

এ ছাড়া আরও অনেক হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানদের আনুগত্য কেবল ইসলাম অনুযায়ী সৎ শাসক ও সৎ সরকারের প্রতিই বাধ্যতামূলক।

ইসলামী বিশ্বাস অনুসারে– হযরত মুহাম্মাদ সা. মুসলমানদের জন্য আল্লাহ মনোনীত নেতা। হযরত মুহাম্মাদ সা. কাউকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যাননি। এটি তৎকালীন আরব ঐতিহ্যের সঙ্গেও সংগতিপূর্ণ ছিল। তৎকালীন আরবে কোনো গোত্রপতি মৃত্যুবরণ করলে গোত্রের প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ এমন একজনকে নেতৃত্বের পদে বরণ করে নিতেন, যাকে তাঁরা তাদের মধে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন। ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর রা. হযরত মুহাম্মাদ সা.-এর বিশিষ্ট সাহাবাগণ কর্তৃক নির্বাচিত হয়েছিলেন।[১৩৮] আবু বকর রা. উমর রা.-কে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। পরে বিশিষ্ট সাহাবাগণও উমর রা.-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। উমর রা. মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় ছয়জন সাহাবার সমন্বয়ে একটি নির্বাচনী সংস্থা গঠন করেন এবং উক্ত ছয়জনকে তাঁদের মধ্য থেকে একজনকে খলিফা নির্বাচনের দায়িত্ব দেন। এভাবে উসমান রা. খলিফা হন। উসমান রা.-এর মৃত্যুর পর হযরত আলী রা. মুসলমানদের একটি প্রধান অংশ কর্তৃক খলিফা মনোনীত হয়েছিলেন। ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হবেন– এ সম্পর্কে স্পষ্ট বক্তব্য থাকলেও শরিয়ায় নির্বাচনের কোনো সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির কথা উল্লেখ নেই। প্রথম চার খলিফার উপরোল্লিখিত নির্বাচন পদ্ধতিও এটি প্রমাণে সহায়তা করে। তাই মুসলিম সমাজের জন্য কল্যাণকর এবং যুগোপযোগী নির্বাচন ব্যবস্থা গ্রহণ ইসলামসম্মত বলা যায়।[১৩৯]

---

১৩৭. আল হাদিস, উদ্ধৃত, আবুল হুসাইন মুসলিম বিন হাজ্জাজ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫

১৩৮. Thomas Arnold, *The Caliphate* (London, Routedge & Kegan Paul Ltd., 1967). pp. 20-22

১৩৯. মুহাম্মাদ আসাদ, *ইসলামের রাষ্ট্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩-৩৫। এ প্রসঙ্গে আরও দেখুন, সাইয়েদ কুতুব, *ইসলাম ও সামাজিক সুবিচার* (ঢাকা, শিরীন পাবলিকেশনস, ১৩৮১), পৃ. ৪৮১-৮২। Abdur Rahman Abdul Kadir Kurdy, *The Islamic State: A study Based on the Islamic Holy Constutution* (London, Mansell Publishing Ltd., 1984). p. 71

এখানে উল্লেখ্য যে, নেতা নির্বাচন সম্পর্কিত উপরিউক্ত ধারণা প্রধানত সুন্নি মতাবলম্বীদের; শিয়া ও খারেজিদের নয়।[১৪০]

নেতা নির্বাচন সম্পর্কিত ইসলামী ধারণায় সংখ্যা ও যোগ্যতার মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। গণতান্ত্রিক নির্বাচন ব্যবস্থায় সংখ্যার গুরুত্ব বেশি। অগণতান্ত্রিক নির্বাচনব্যবস্থায় সংখ্যা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে না।[১৪১] ইসলাম মুসলিম সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে নেতা নির্বাচনের অধিকার দিয়ে সংখ্যা ও যোগ্যতার মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছে বলে ধারণা করা যায়।

ইসলামের বিধান অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি কোনো পদের জন্য নিজেকে প্রার্থী হিসেবে উপস্থাপিত করতে পারেন না। হযরত মুহাম্মাদ সা. মুসলমানদের নেতৃত্ব প্রার্থনা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন– "আমি এমন কোনো লোকের ওপর শাসনভার অর্পণ করি না, যে নিজে তা প্রার্থনা করে।"[১৪২] এ কারণে ইসলামের প্রথম চার খলিফার কেউ-ই নিজেকে নেতৃত্বের জন্য প্রার্থী হিসেবে উপস্থাপিত করেননি।

হযরত মুহাম্মাদ সা. ও প্রথম চার খলিফাকে ইসলামী নেতৃত্বের সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ মনে করা হয।[১৪৩] এ সময় আধ্যাত্মিক, নৈতিক, দার্শনিক ও রাজনৈতিক দিকসহ সকল ধরনের কার্যক্রমের নেতৃত্ব একই ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল। প্রথম চার খলিফার শাসন পরবর্তীকালে ইসলামী নেতৃত্বের উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যের স্থলে কার্যত শাসকদের হাতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং আলেমদের হাতে আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব চলে যায়।[১৪৪]

নেতৃত্ব সম্পর্কিত ইসলামের তত্ত্বগত ধারণার সঙ্গে মুসলমানদের ইতিহাসে প্রয়োগগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর

---

১৪০. শিয়া ও খারিজি মতাবলম্বীদের এ সম্পর্কিত ধারণা আলোচিত হয়েছে, W. Montogomery Watt, *Islamic Political Thought* (Edinburgh, Edinburgh University Press, 1968). pp. 42-45

১৪১. আল হাদিস, উদ্ধৃত, মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল বুখারি, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫৮

১৪২. ঐ, পৃ. ১০৫৮

১৪৩. W. Montogomery Watt, *Muhammad at Medina* (Karachi, Oxford University Press, 1981). pp. 334-35

১৪৪. মোহাম্মদ ওমর ফারুক, *নতুন বিপ্লবের পদধ্বনি* (ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩), পৃ. ৬১

মাত্র ৩০ বছর সময়কালের ভেতর হযরত মুয়াবিয়া রা. ইসলামী আদর্শের বিপরীত রাজতান্ত্রিক শাসন ও নেতৃত্ব ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন। মুসলিম বিশ্বের অনেক দেশে এখনও রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা চলছে। কুরআন ও হাদিসে নেতাকে যেসব গুণাবলি ও যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেসব গুণাবলি ও যোগ্যতা খুলাফায়ে রাশিদিন পরবর্তীকালীন খুব কমসংখ্যক মুসলমান নেতার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়।

নেতৃত্ব : জামায়াত ধারণা

জামায়াতে ইসলামীর আন্দোলন ও সংগঠনে নেতৃত্বের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মাওলানা মওদূদীর মতে, ইসলাম ও মুসলমানদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কল্যাণ প্রচলিত অনৈসলামিক নেতৃত্ব পরিবর্তন করে সর্বস্তরে ইসলামী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ওপর নির্ভর করে।[১৪৫] গোলাম আযমের মতে, কোনো সমাজে যখন কোনো বিশেষ আদর্শভিত্তিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই সে সমাজে সে আদর্শ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। ইসলামের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য।[১৪৬] জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র বর্তমান সহকারি সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক ইউসুফ আলীর মতে, নেতৃত্বই যেকোনো আন্দোলনের সাফল্যের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে। নেতৃত্বই আন্দোলনের ডাক দেয় এবং সাড়াদানকারী জনশক্তিকে সংগঠিত করে। নেতৃত্বের যোগ্যতা, দক্ষতা ও নিষ্ঠা সংগঠনের চালিকাশক্তি বলে বিবেচিত হয়।[১৪৭]

মাওলানা মওদূদীর মতে, ইসলামী আন্দোলনের সাফল্যের জন্য মুসলমানদের হযরত মুহাম্মাদ সা. প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করতে হবে। হযরত মুহাম্মাদ সা. তাঁর পরিচালিত আন্দোলনের প্রথম ধাপে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসসমূহ প্রচার করেন। এরপর ইসলামের মৌল বিশ্বাসে বিশ্বাসীদের তিনি একটি

---

১৪৫. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি* (ঢাকা, ইসলামিক পাবলিকেশন্স লমিটেড, ১৯৭১), পৃ. ১২-২৪। এ প্রসঙ্গে আরও দেখুন, Charles J. Adams, 'The Ideology of Mawlana Maududi' in donald Engene Smith ed., *South Asian Politics and Religion* (New Jersey, Princeton University Press, 1966) pp. 388-89

১৪৬. গোলাম আযম, 'বিশ্বনবীর জীবনে রাজনীতি', *বাংলাদেশের রাজনীতি* (ঢাকা, আল-আযামী পাবলিকেশন্স, ১৯৮৭), পৃ. ৫১

১৪৭. মুহাম্মদ ইউসুফ আলী, *ইসলামী বিপ্লব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭-২৮

প্ল্যাটফরমে সংগঠিত করেন এবং তাঁদেরকে ইসলামী পদ্ধতিতে জীবন পরিচালনায় প্রশিক্ষণ দেন। ইসলামী আন্দোলনের উপযোগী চারশত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুসলমানের একটি দল তৈরি হওয়ার পর হযরত মুহাম্মাদ সা. মদিনায় একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হন। বর্তমান যুগেও ইসলামী আন্দোলনের সাফল্যের জন্য উপরিউক্ত কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে বলে মাওলানা মওদূদী মত প্রকাশ করেছেন। জামায়াতের আন্দোলন ও সংগঠনকে তিনি উপরিউক্ত পথে পরিচালিত করতে চেষ্টা করেছেন বলে দাবি করেন।[১৪৮] বলা হয়, ইসলামী আদর্শের ব্যাপক প্রচার, ইসলামী আন্দোলনে সাড়াদানকারী লোকদের সংগঠিতকরণ ও প্রশিক্ষণ দান, শক্তিশালী ইসলামী সংগঠন গড়ে তোলা এবং প্রচলিত অনৈসলামিক সমাজব্যবস্থা পরিবর্তন করে ইসলামী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জামায়াত কাজ করছে।[১৪৯]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ইসলামী আন্দোলনের সাফল্যের জন্য যোগ্য নেতা-কর্মী সৃষ্টির লক্ষ্যে জামায়াত কাজ করছে। জামায়াতের গঠনতন্ত্রের ধারা-৫ (দাওয়াত)-এ সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাজের সকল ক্ষেত্রে হতে অসৎ, খোদাদ্রোহী, জালিম ও ফাসিক নেতৃত্ব অপসারিত করে সৎ খোদাভীরু, ন্যায়পরায়ণ ও আল্লাহর নেক বান্দাদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানানো হয়েছে।[১৫০] মাওলানা নিজামীর মতে, ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্বকে খলিফা, ইমাম ও আমীর– এই তিনটি পদবাচ্যের মর্মার্থের ধারক হতে হবে। ইসলামের প্রথম চার খলিফা আল্লাহ, রাসূল ও মুসলিম জনগণের প্রতিনিধি (খলিফা) হিসেবে শাসনকার্য চালিয়েছেন। যিনি পথ প্রদর্শন করেন, তাঁকে ইমাম বলা হয়। আদেশদাতাকে বলা হয় আমীর। আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়নই আমীরের কাজ। এ যুগের ইসলামী আন্দোলনের নেতাকেও খলিফা, ইমাম ও আমীরের যোগ্যতা অর্জন করে মুসলিম সমাজকে ইসলামের পথে পরিচালিত করতে হবে।[১৫১]

---

১৪৮. Syed Abul Ala Mawdudi, *The Process of Islamic Revolution* (Delhi, Markazi Maktaba Jamaat-e-Islami Hind, 1970). p. 41

১৪৯. A. Rashid Moten, *op. cit.*, pp. 220-233

১৫০. *গঠনতন্ত্র : জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ* (ঢাকা, প্রকাশনা বিভাগ, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৯৯০), পৃ. ১২

১৫১. মতিউর রহমান নিজামী, *ইসলামী আন্দোলন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩-৬৪

জামায়াতের নেতৃত্ব লাভের জন্য কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন লাভ যথেষ্ট নয়; বরং ব্যক্তিগত ত্যাগ, জ্ঞান, বুদ্ধি, সচেতনতা ইত্যাদির সঙ্গে জামায়াত নেতৃত্বকে নৈতিক গুণাবলিসম্পন্ন হতে হয়।[১৫২] জামায়াতের মতে, আইন যত ভালোই হোক না কেন নেতৃত্ব বা শাসক অসৎ হলে সে আইন অপ-প্রয়োগের শিকার হয়। অসৎ নেতৃত্বই জনগণের দুঃখ-দুর্দশার প্রধান কারণ।[১৫৩] জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ঘোষিত ইসলামী বিপ্লবের সাত দফা গণদাবির ২য় দফায় তাই ঈমানদার ও যোগ্য লোকের সরকার কায়েমের আহ্বান জানানো হয়েছে।[১৫৪] সৎ নেতৃত্ব তৈরি ও কায়েমের জন্য জামায়াত নিম্নোক্ত ব্যবস্থাবলি গ্রহণ করার পক্ষে কাজ করছে বলে দাবি করে থাকে–

১. সমাজে যারা সৎ এবং যারা নিজেদেরকে সৎ লোক হিসেবে গড়ে তুলতে চান, তাদেরকে ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমে সুসংগঠিত করে জনগণের সামনে বিকল্প নেতৃত্ব হিসেবে তুলে ধরা।

২. রাজনৈতিক নেতৃত্বই জাতীয় জীবনের প্রায় সকল দিক নিয়ন্ত্রণ করে বলে চরিত্রহীন, দুর্নীতিবাজ ও অসৎ রাজনৈতিক নেতৃত্বের কবল থেকে জাতিকে মুক্ত করার জন্য রাজনৈতিক সংগঠনগুলোকে উদ্বুদ্ধ করা।

৩. সকল স্তরের নেতৃত্ব থেকে নির্বাচনের মাধ্যমে অসৎ লোকদের অপসারণ করা।[১৫৫]

মওদূদীর মতে– ইসলামী রাষ্ট্রের নেতৃত্বকে ইসলাম ধর্মাবলম্বী, পুরুষ, বোধশক্তিসম্পন্ন, প্রাপ্তবয়স্ক এবং ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হতে হবে।[১৫৬] এ ছাড়াও ইসলামী নেতৃত্বকে বিশ্বাসী, খোদাভীরু, প্রজাদরদি, প্রজা-কল্যাণকামী, ক্ষমতা ও পদের প্রতি নির্লোভ প্রভৃতি গুণসম্পন্ন হতে হয়।[১৫৭]

---

১৫২. আব্বাস আলী খান, *জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস*, আবু নুমান মাসাউদুয্যামান প্রকাশিত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭৩-৭৪

১৫৩. *মেনিফেস্টো : জামায়াতে*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২। আরও দেখুন, *Eletion Manifesto 1991: Jamaat-e- Islami Bangladesh* (Dhaka, Jamaat-e-Islami Bangladesh, 1991). p. 8

১৫৪. *ইসলামী বিপ্লবের ৭ দফা গণদাবি*, পুস্তিকা (ঢাকা, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৯৮৩). পৃ. ৭

১৫৫. *মেনিফস্টো : জামায়াতে*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২

১৫৬. Syed Abul Ala Mawdudi, *The Islamic Law and Constitution* (Delhi, Taj Company, 1986). pp. 242-45

১৫৭. *Ibid*, pp. 261-62

নয়া স্বাধীনতাপ্রাপ্ত উন্নয়নশীল দেশসমূহের রাজনীতিতে কখনও কখনও সম্মোহনী নেতৃত্বকে শক্তিশালী ভূমিকায় আবির্ভূত হতে দেখা যায়।[১৫৮] বাংলাদেশের জনগণের নিকটও এ জাতীয় নেতৃত্বের আবেদন কম নয়। কিন্তু জামায়াত নীতিগতভাবে কোনো নেতার এ জাতীয় ভাবমূর্তি সৃষ্টিতে বিশ্বাস করে না বলে দাবি করে।[১৫৯] কোনো নেতার নয়; আল্লাহ ও রাসূলের নীতি অনুসরণের জন্য জামায়াত আহ্বান জানায়।[১৬০] জামায়াত তার আন্দোলন ও সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মওদূদীর জন্ম-মৃত্যু বার্ষিকীও উদ্‌যাপন করে না। জামায়াতের নিকট হযরত মুহাম্মাদ সা.-ই হচ্ছেন নেতৃত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মডেল। তাঁকে সর্বাবস্থায় সর্বক্ষেত্রে অনুসরণ করাই জামায়াতের লক্ষ্য বলে দাবি করা হয়।[১৬১] জামায়াতের মতে, কেবল আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি আনুগত্যই শর্তহীন। রাসূল ব্যতীত অন্য কোনো নেতার প্রতি মুসলমানরা ততক্ষণই অনুগত থাকবেন, যতক্ষণ ঐ নেতা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি অনুগত থাকবেন।[১৬২]

কুরআন-হাদিসের নিম্নোক্ত বাণীদ্বয় উদ্ধৃত করে মাওলানা মওদূদী রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বভার নারীর ওপর অর্পণ করা যায় না বলে মত প্রকাশ করেন–

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ ... ﴿٣٤﴾

"পুরুষগণ মেয়েদের কর্তা।" সূরা নিসা : ৩৪

لَنْ يُّفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا اَمْرَهُمْ امْرَاَةً

"যে জাতি নিজেদের সার্বজনীন কাজ মহিলাদের হাতে অর্পণ করে, সে জাতি কখনও কল্যাণ লাভ করতে পারে না।"[১৬৩]

---

১৫৮. দেখুন, Lester Seligman, 'Elitte Recruitment in Political Development' in John J. Finkle and R. W. Gable, eds., *Political Development and Social Change* (New York, John Wiley and Sons, Inc., 1981). p. 242

১৫৯. গোলাম আযম, *জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮-১৯

১৬০. Ghulam Azam, *A Guide to Islamic Movement* (Dhaka, Azami Publications, 1968). p. 63

১৬১. গোলাম আযম, *জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮-১৯

১৬২. মতিউর রহমান নিজামী, ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬-৮৭

১৬৩. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *ইসলামী শাসনতন্ত্রের মূলনীতি* (ঢাকা, ইসলামিক পাবলিকেশন্স লি., ১৯৬৩), পৃ. ১৯-২০

মাওলানা মওদূদীর মতে– ইসলাম পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদা কর্মক্ষেত্র নির্দিষ্ট করেছে এবং সে অনুসারে রাজনীতি ও প্রশাসনিক দায়িত্ব পুরুষদের ওপর বর্তেছে। ইসলামী বিধানানুসারে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাজে মহিলারা সংশ্লিষ্ট হওয়া উচিত নয়।[১৬৪]

মাওলানা মওদূদীর উপরিউক্ত মতের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় পূর্বোল্লিখিত ইসলামী বিপ্লবের সাত দফা গণদাবির সপ্তম দফায়। এতে মেয়েদের জন্য আলাদা শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের কথা বলা হয়েছে।[১৬৫]

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র গঠনতন্ত্রে পুরুষ ও মহিলা রুকনদের জন্য আলাদা দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারিত রয়েছে। পরিবারের সদস্য ও মহিলাদের মধ্যে জামায়াতের আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রচার করা, নিজের সন্তান-সন্ততিকে ইসলামী আদর্শনুযারী গঠন করতে চেষ্টা করা ইত্যাদির মধ্যে জামায়াতে ইসলামীর মহিলা সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রধানত সীমাবদ্ধ করা হয়েছে।[১৬৬] এ কারণে মহিলা বিভাগ ছাড়া জামায়াত সংগঠনের অন্য কোথাও মহিলা নেতৃত্ব নেই। জামায়াতের মহিলা বিভাগে আমীরের পদও রাখা হয়নি। জামায়াত সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের আমীরদের নেতৃত্বে মহিলা বিভাগ পরিচালিত হয়। মহিলা বিভাগের সেক্রেটারি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র বিভিন্ন স্তরের আমীরের সঙ্গে যোগাযোগ করে সংগঠন পরিচালনা করেন।

গোলাম আযমের মতে, নারী ও পুরুষদের সম্মিলিত কাজ যেসব ক্ষেত্রে রয়েছে, সেসব ক্ষেত্রের নেতৃত্ব পুরুষদের হাতে থাকবে। মহিলাদের আলাদা কর্মক্ষেত্রে মহিলা নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। জামায়াতের সমর্থন নিয়ে

---

১৬৪. Syed Abul Ala Mawdudi, *the Islamic Law, op. cit.*, pp. 262-63

১৬৫. জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ঘোষিত (১৯৮১ সালের ৩০ জানুয়ারি) ইসলামী বিপ্লবের ৭ দফার অন্তর্ভুক্ত দাবিগুলো হচ্ছে, ১. বাংলাদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা, ২. ঈমানদার ও যোগ্য লোকের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা, ৩. বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষা, ৪. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা, ৫. ইসলামী অর্থনীতি চালু করা, ৬. ইসলামী আইন ও সংস্কৃতি প্রবর্তন ও ৭. ইসলামী বিধানানুসারে মহিলাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা। দেখুন, *ইসলামী বিপ্লবের ৭ দফা, পূর্বোক্ত*। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ মহিলা বিভাগের সম্পাদিকা ও জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্যা (১৯৯১) হাফেজা আসমা খাতুনের মতে, ইসলাম মহিলাদেরকে রাষ্ট্রপ্রধান বা সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান হতে অনুমতি দেয় না। দেখুন, *দৈনিক ইনকিলাব*, ঢাকা, এপ্রিল ৪, ১৯৯১

১৬৬. *গঠনতন্ত্র : জামায়াতে, পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭

বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপির সরকার গঠন (১৯৯১) প্রশ্নে গোলাম আযমের বক্তব্য হচ্ছে, জামায়াত সরকার গঠনে বিএনপিকে সমর্থন দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বিএনপি কাকে মনোনীত করবে– সেটি বিএনপির নিজস্ব ব্যাপার; জামায়াতের নয়।[১৬৭]

জামায়াতের বিভিন্ন স্তরের নেতাদের সঙ্গে আলাপ করে এ গবেষকের ধারণা হয়েছে যে, রাজনীতিতে মহিলাদের ভূমিকার প্রশ্নে জামায়াত ক্রমশ নমনীয় ভূমিকা গ্রহণের দিকে এগোচ্ছে। জামায়াতের মহিলা বিভাগের নেতৃবৃন্দকে বর্তমানে কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। মহিলাদেরকে কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার সদস্য করা যায় কিনা– এ নিয়েও চিন্তা-ভাবনা চলছে। বর্তমান (১৯৯১) সংসদের জামায়াতের দুজন মহিলা এম.পি. রয়েছেন। এটিও মহিলা নেতৃত্ব প্রশ্নে জামায়াতে ইসলামীর দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে। মহিলা নেতৃত্ব প্রশ্নে জামায়াত দৃষ্টিভঙ্গিতে বর্তমানে নমনীয়তা পরিলক্ষিত হলেও এ কথা সত্য যে, পুরুষ নেতৃত্বের ওপরই জামায়াত বিশেষভাবে জোর দেয়।

মাওলানা মওদূদীর মতে, ইসলামী আদর্শের ধারক ও বাহকরাই কেবল ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করতে পারেন। ইসলামী রাষ্ট্রের কোনো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ইসলামী আদর্শে অবিশ্বাসীরা নিয়োজিত হতে পারেন না।[১৬৮] জামায়াত ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে চায় বলে ইসলামী রাষ্ট্র ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকামী সংগঠনের নেতৃত্ব ও সদস্য পদে ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী নয়– এমন কোনো লোককে স্থান দিতে সম্মত নয়।[১৬৯]

গোলাম আযমের মতে– কুরআন-হাদিসের বক্তব্যের আলোকে সিদ্ধান্ত প্রদান করতে হয়, এমন দায়িত্বে অমুসলিমদের নিয়োজিত করা যায় না। অমুসলিমরা অন্যান্য দায়িত্বে নিয়োগ লাভ করতে পারেন। তাঁর মতে– ইসলামী রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীতে অমুসলিমদের নেওয়া হবে কি-না তা রাষ্ট্রবিশেষের সার্বিক অবস্থানুসারে সে দেশের আইন পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত হওয়া উচিত।[১৭০]

---

১৬৭. সাক্ষাৎকার : অধ্যাপক গোলাম আযম।

১৬৮. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *রাসায়েল ও মাসায়েল*, ১ম খণ্ড (ঢাকা, মওদূদী রিসার্চ একাডেমি, ১৯৮৯), পৃ. ২৯৩-৯৬

১৬৯. গোলাম আযম, *অমুসলিম নাগরিক ও জামায়াতে ইসলামী* (ঢাকা, প্রকাশনা বিভাগ, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৯৮৫), পৃ. ১১-১২, ৪০

১৭০. সাক্ষাৎকার : অধ্যাপক গোলাম আযম।

অমুসলিমদের জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র সদস্য পদ দেওয়া না হলেও তাঁরা সহযোগী সদস্য হতে পারেন।[১৭১] প্রত্যেক অমুসলিম সহযোগী সদস্য জামায়াতের একটি সাংগঠনিক স্তরের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। প্রত্যেক স্তরের একজন জামায়াত নেতা অমুসলিম সহযোগী সদস্যদের নানা বিষয় দেখাশোনা করেন। এ গবেষক জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে অমুসলিমদের মধ্যে জামায়াতের কাজ সম্পর্কে আলোচনা করে জানতে পেরেছেন যে, এক্ষেত্রে তাঁদের কাজের অগ্রগতি আশানুরূপ নয়। জামায়াতের অমুসলিম সহযোগী সদস্যের সংখ্যা ২০-২৫ হাজারের বেশি হবে না বলে জানা গেছে।[১৭২] জামায়াতের চট্টগ্রাম উত্তর ও লক্ষ্মীপুর সাংগঠনিক জেলার নেতৃবৃন্দ তাঁদের সাংগঠনিক স্তরে অমুসলিম সহযোগী সদস্য রয়েছে বলে জানিয়েছেন। রায়পুর উপজেলায় ৩১ জন অমুসলিম সহযোগী সদস্য রয়েছেন। হাটহাজারী উপজেলায় অমুসলিমদের ভেতর জামায়াতের কাজ উল্লেযোগ্য নয়। রায়পুরের চরপাতা ইউনিয়ন শাখায় অমুসলিম সহযোগী সদস্য আছেন। হাটহাজারীর দক্ষিণ পাহাড়তলী ইউনিয়নে অমুসলিমদের ভেতর জামায়াতের কাজ নেই।[১৭৩]

ওপরের আলোচনা থেকে দেখা যায়, অমুসলিমদের ভেতরে জামায়াতের কাজের (প্রধানত ইসলাম প্রচারমূলক) সাফল্য খুব বেশি নয়। অবশ্য এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, জামায়াত ব্যতীত বাংলাদেশের অন্য কোনো ইসলামী রাজনৈতিক সংগঠনের অমুসলিমদের ভেতর কোনো কর্মতৎপরতা দেখা যায় না।

জামায়াতের মতে, মুসলমানদের নেতা কে হবেন তা যদি শুধু মুসলমানরা নির্বাচনের মাধ্যমে নির্ধারণ করেন, তা হলেই কেবল সঠিক মুসলিম নেতৃত্ব গড়ে উঠতে পারে। যুক্ত নির্বাচন দ্বারা যথার্থ মুসলিম নেতৃত্ব বাছাই হতে পারে না। অমুসলিমদের ভোটের জোরে যে মুসলিম প্রার্থী বিজয়ী হন, তিনি মুসলিম কিংবা অমুসলিম কারোরই সত্যিকার প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম হন না।[১৭৪]

---

১৭১. দেখুন, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ফরম নম্বর ১২ (মুদ্রণ, অক্টোবর, ৮৪)

১৭২. সাক্ষাৎকার : অধ্যাপক গোলাম আযম।

১৭৩. সাক্ষাৎকার : অধ্যাপক আহসান উল্লাহ, আমীর, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম উত্তর জেলা। হোসাইন আহমদ, সেক্রেটারি, লক্ষ্মীপুর জেলা। রুহুল আমীন, থানা আমীর, রায়পুর। মাওলানা জামাল হোসেন, সেক্রেটারি, হাটহাজারী থানা (শহর)। তোফায়েল আহমদ, সদস্য, চরপাতা ইউনিয়ন, রায়পুর। আলহাজ মোহাম্মদ শরীফ, নাযেম, দক্ষিণ পাহাড়তলী ইউনিয়ন, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

১৭৪. *ইসলামী বিপ্লবের ৭. দফা গণদাবি*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২

মাওলানা মওদূদীর মতে, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী আন্দোলন অপরিহার্য। ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীকে অবশ্যই ইসলামী আদর্শ অনুসারে জীবন গড়তে হবে। সমাজকেও অনুরূপ আদর্শ ও নৈতিক প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করতে হবে। এ কাজে ইসলামী শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তন অত্যন্ত সহায়ক হতে পারে। ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে চিন্তা ও কাজ করতে সক্ষম এরূপ জনশক্তি গড়ে উঠতে পারে।[১৭৫]

অধ্যাপক গোলাম আযমের মতে, ইসলামী আন্দোলনের সাফল্যের প্রধান দুটি শর্ত হচ্ছে– ১. আদর্শবাদী ও ত্যাগী নেতা-কর্মী সৃষ্টি করা ও ২. যে সমাজে ইসলাম বাস্তবায়নের আন্দোলন চলছে, সে সমাজের অধিকাংশ মানুষ ইসলামের পক্ষে আসা। এ দুটি শর্ত পূরণ হলে ইসলামী আন্দোলনের মুজাহিদ বাহিনীকে আল্লাহ সাফল্য দান করবেন।[১৭৬] আল্লাহ প্রদত্ত এ সাফল্য নিম্নোক্ত চারভাবে আসতে পারে–

> ১. যে বিশেষ দেশে ইসলামী আন্দোলন চলছে, সে দেশের নেতৃত্ব ও শাসনভার ঐ আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের নিয়ন্ত্রণে আসা।
>
> ২. যেখানে আন্দোলন শুরু করা হয়েছিল, সেখানে সাফল্য না এলে অন্য কোথাও হিজরত এবং পরবর্তী স্থানে সাফল্য লাভ।
>
> ৩. প্রচেষ্টা সত্ত্বেও একটি বিশেষ স্থানের অধিবাসীদের বিরোধিতার কারণে সাফল্য না এলে আল্লাহ ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের অন্যস্থানে সরিয়ে নেন এবং ওই স্থানের (যে স্থানে সাফল্য আসেনি) অধিবাসীদের শাস্তি দেন।
>
> ৪. ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের ইসলামবিরোধী শক্তি কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে শাহাদাত বরণের সুযোগ দান।[১৭৭]

---

১৭৫. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *ইসলামী বিপ্লবের ধারা* (ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮৭), পৃ. ১৭-১৯

১৭৬. গোলাম আযম, *ইকামতে দ্বীন* (ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮৩), পৃ. ৩১-৩৪। ইসলাম ধর্ম রক্ষা অথবা ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী বাহিনীকে সাধারণত মুজাহিদ বাহিনী বলা হয়।

১৭৭. গোলাম আযম, *ইসলামী আন্দোলন : সাফল্য ও বিভ্রান্তি* (ঢাকা, প্রকাশনা বিভাগ, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৯৮৮), পৃ. ৯-১১

বাংলাদশে ইসলামী বিপ্লব সফল করার জন্য জামায়াতের দায়িত্ব হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার উপযোগী 'মুমিন' ও 'সালিহ' নেতা-কর্মী এবং একটি শক্তিশালী ইসলামী সংগঠন সৃষ্টি করা। জামায়াত এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারলে বাংলাদেশে 'ইসলামী বিপ্লবের ভবিষ্যৎ নিঃসন্দেহে উজ্জ্বল' বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন গোলাম আযম।[১৭৮]

আমীরে জামায়াত, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ, কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা ও রুকন সম্মেলন এই ৪টি পদ ও সংস্থা নিয়ে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় সংগঠন গঠিত।[১৭৯] জামায়াতের সদস্যরাই উপরিউক্ত পদ ও সংস্থার সদস্য হওয়ার যোগ্যতা রাখেন। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র গঠনতন্ত্রের ৬১ ধারায় বলা হয়েছে– আমীরে জামায়াত ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্বসহ যেকোনো দায়িত্বপূর্ণ পদে নির্বাচন অথবা নিযুক্তিকালে যে ব্যক্তি নির্বাচিত অথবা মনোনীত হবেন, তাঁর ধর্মীয় জ্ঞান, আল্লাহ-ভীতি, আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি আনুগত্য, সাংগঠনিক প্রজ্ঞা, শৃঙ্খলা রক্ষার যোগ্যতা, উদ্ভাবন ও বিশ্লেশণ শক্তি, দূরদৃষ্টি, অনড় মনোবল, কর্মে দৃঢ়তা, সদ্ব্যবহার এবং আমানতদারি ইত্যাদি যোগ্যতা ও গুণ রয়েছে কিনা সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।[১৮০]

জামায়াত সংগঠন ও আন্দোলন পরিচালনার প্রধান দায়িত্ব আমীরের জামায়াতের ওপর ন্যস্ত। কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার পরামর্শানুসারে তিনি জামায়াতে ইসলামীকে পরিচালিত করেন। জামায়াতের তহবিলেরও তিনি হেফাজতকারী। জামায়াত সংগঠনে নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষা করা তাঁর দায়িত্ব। জামায়াত কর্তৃক নেওয়া বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন কর্মকাণ্ড তাঁর নেতৃত্বেই পরিচালিত হয়।[১৮১] মাওলানা নিজামীর মতে–

> ইসলামী সংগঠনের ... নেতৃত্ব হবে আন্দোলনের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁকে সংগঠনের স্বীকৃত ক্যাডারের আস্থাভাজন হতে হবে এবং ক্যাডারদের স্বতস্ফূর্ত পছন্দের ভিত্তিতে নির্বাচিত হতে হবে। ইসলামী সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বই যেহেতু আন্দোলনের প্রধান ব্যক্তিত্ব, এ কারণে অধস্তন

---

১৭৮. গোলাম আযম, *বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ও জামায়াতে ইসলামী* (ঢাকা, প্রকাশনা বিভাগ, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৯৮৭), পৃ. ১৮

১৭৯. *গঠনতন্ত্র : জামায়াতে*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮

১৮০. ঐ. পৃ. ৪৬

১৮১. ঐ, পৃ. ২০

> সংগঠনের নেতৃত্ব হবে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রতিনিধি স্থানীয়। ক্যাডারদের প্রতিনিধি স্থানীয় এবং আহলে রায় লোকদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা পরামর্শ সভা বা মজলিশে শূরা নেতৃত্বকে সংগঠন পরিচালনায়, নীতি নির্ধারণে, কুরআন ও সুন্নাহর Spirit অনুসরণে সহযোগিতা দান করবে। নীতিগতভাবে ইসলামে যৌথ নেতৃত্বের কোনো ধারণা নেই, কিন্তু ইসলামে শূরায়ি নেজাম অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে অনৈসলামিক পরিবেশে একক নেতৃত্বের যেসব খারাপ দিক যথা– স্বেচ্ছাচারিতা, একনায়কত্বের শ্রবণতা ইত্যাদি ঘটে থাকে, এখানে এগুলোর কোনো অবকাশ থাকে না।[১৮২]

মাওলানা মওদূদী আমীরে জামায়াতের কার্যক্রমের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে– আমীরের যোগ্যতা, সততা, নিষ্ঠা ও খোদাভীরুতার প্রতি অনুসারীদেরকে আস্থাশীল হতে হবে।[১৮৩] লিউনার্ড বাইন্ডার 'জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান'-কে আমীর নির্ভর রাজনৈতিক দল বলে অভিহিত করেছেন।[১৮৪] 'জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র গঠনতন্ত্রে আমীরে জামায়াতকে প্রদত্ত ক্ষমতা ও দায়িত্ব বিশ্লেষণ করলেও এটি স্পষ্ট হয়েছে উঠে যে, তিনিই জামায়াত রাজনীতির মূল পরিকল্পক, পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক।[১৮৫]

মাওলানা মওদূদীর মতে, নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া বা নেতৃত্ব কামনা করা ইসলামসম্মত কাজ নয়। জনগণের দায়িত্ব হচ্ছে সত্যিকার আদর্শ চরিত্র ও ইসলামী ভাবধারার নেতৃত্ব বেছে নেওয়া।[১৮৬] জামায়াত সদস্যদের গোপন ভোটে জামায়াতের আমীর নির্বাচিত হন। নির্বাচনে কেউ প্রার্থী হতে পারেন না। তবে সংগঠন নির্বাচনে প্রার্থী দেয়। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলেও ইসলামী সংগঠন নির্বাচনে প্রার্থী দিতে পারে।[১৮৭] জামায়াতের নেতা নির্বাচনে কোনো

---

১৮২. মতিউর রহমান নিজামী, *ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৫

১৮৩. দেখুন, *জামায়াতে ইসলামীর কার্যবিবরণী*, ১ম খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫-১৬

১৮৪. L. Binder, *Religion and Politics, op. cit.*, pp. 42-44

১৮৫. দেখুন, *গঠনতন্ত্র : জামায়াতে*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০

১৮৬. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *মুসলমানদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কর্মসূচি*, ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮৬, পৃ. ৬৯-৭৫

১৮৭. সাক্ষাৎকার : অধ্যাপক গোলাম আযম।

প্রতিযোগিতা হয় না। সদস্যগণ যাঁকে পছন্দ করেন, তাঁকে ভোট দেন এবং যাঁর পক্ষে বেশি ভোট পড়ে, তিনি নির্বাচিত বলে ঘোষিত হন।[১৮৮] জামায়াতের নেতৃত্ব নির্বাচনের জন্য নির্বাচন পরিচালক নিযুক্ত করা হয়। কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা মনোনীত একজন প্রধান নির্বাচন পরিচালক ও চারজন সহকারী নির্বাচন পরিচালক সমন্বয়ে গঠিত নির্বাচন কমিশন কেন্দ্রীয় নির্বাচনসমূহ পরিচালনা করেন। জেলা, থানাসহ অন্যান্য স্তরের নির্বাচনের জন্যও নির্বাচন পরিচালক নিযুক্ত করা হয়।[১৮৯]

জামায়াতের গঠনতন্ত্রের ধারা ১৫-তে বলা হয়েছে যে, সদস্যদের গোপন ভোটে তিন বছরের জন্য আমীরে জামায়াত নির্বাচিত হবেন। আমীরে জামায়াত নির্বাচনের জন্য কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা তিনজনের একটি প্যানেল তৈরি করে। অবশ্য প্যানেল বহির্ভূত কোনো সদস্যকেও আমীর পদের জন্য ভোট দেওয়ার অধিকার নির্বাচকদের সংরক্ষিত থাকে। আমীরে জামায়াতের তিন বছর মেয়াদকাল শেষ হওয়ার আগেই কেন্দ্র ও সাংগঠনিক জেলাসমূহে আমীরে জামায়াতের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচিত হওয়ার পর আমীরে জামায়াত প্রধান নির্বাচন পরিচালকের সম্মুখে শপথ গ্রহণ করেন।[১৯০] আমীরে জামায়াত অনুর্ধ্ব ছয় মাসের জন্য স্বীয় দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের পরামর্শক্রমে নায়েবে আমীরগণের মধ্য থেকে যেকোনো একজনকে তিনি ভারপ্রাপ্ত আমীর নিয়োগ করবেন। কিন্তু আমীরের অক্ষমতাকাল ছয় মাসের বেশি হলে অথবা আকস্মিকভাবে আমীরের পদ শূন্য হলে কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ কেন্দ্রীয় শূরার অনুমোদন সাপেক্ষে নায়েবে আমীরগণের মধ্য হতে একজনকে অস্থায়ীভাবে ভারপ্রাপ্ত আমীর নিযুক্ত করেন। ভারপ্রাপ্ত আমীর অনুর্ধ্ব ছয় মাসের মধ্যে অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য নতুন আমীর নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন।

আমীরে জামায়াত কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন। কিন্তু দৈনন্দিন কার্য সম্পাদন এবং কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার সিদ্ধান্ত নেই– এমন কোনো বিষয়ে কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার পরবর্তী অধিবেশনে অনুমোদন

১৮৮. গোলাম আযম, *জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭-১৮

১৮৯. দেখুন, *গঠনতন্ত্র : জামায়াতে*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৬

১৯০. ঐ, পৃ. ৫২

সাপেক্ষে কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ-এর পরামর্শক্রমে জরুরি ও সাময়িক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবেন।[১৯১] জামায়াতের গঠনতন্ত্রের ১৬ ধারানুসারে আমীরে জামায়াত নিম্নোক্ত ক্ষমতা ও অধিকার ভোগ করার অধিকারী–

১. আমীরের জামায়াত সদস্য সম্মেলন, কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা অধিবেশন ও কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ বৈঠক আহ্বান করবেন।

২. কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার পরামর্শক্রমে কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ গঠন করবেন।

৩. যদি কোনো বিষয়ে জরুরি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় এবং কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা কিংবা কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ বৈঠক আহ্বান করা সম্ভব না হয়, তাহলে কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা কিংবা কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ-এর যে সকল সদস্যের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব, তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

৪. কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার পরামর্শক্রমে নায়েবে আমীর, সেক্রেটারি জেনারেল, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল, বিভাগীয় সেক্রেটারি ও কর্মপরিষদের অন্যান্য সদস্য নিয়োগ ও অপসারণ করবেন।

৫. কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের সঙ্গে পরামর্শ করে বিভিন্ন অঞ্চলের সাংগঠনিক তদারকির জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সাংগঠনিক সেক্রেটারি নিয়োগ ও অপসারণ করবেন।

৬. কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা আরোপিত বাধ্যবাধকতার আওতায় জামায়াতের অর্থ ও সম্পত্তি ব্যয় করবেন।

৭. জামায়াতের সদস্যপদ মঞ্জুর ও বাতিল করবেন।

৮. অধস্তন জামায়াত সাসপেন্ড কিংবা ভেঙে দিতে পারবেন।

৯. প্রয়োজনবোধে কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার মেয়াদ অনুর্ধ্ব তিন মাস পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে পারবেন।

১০. কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার সদস্য নন, এমন কোনো সদস্যকেও তিনি মজলিশের বৈঠকে শরিক করতে পারবেন।

১১. নিজের ক্ষমতা ও অধিকারের কোনো অংশ অন্য কাউকে অর্পণ করতে পারবেন।[১৯২]

---

১৯১. ঐ, পৃ. ২০-২১

জামায়াতের গঠনতন্ত্রের ধারা ১৭ অনুসারে– আমীরে জামায়াত যদি সদস্যপদের যোগ্যতা অথবা কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার বিবেচনায় অধিকাংশ সদস্যদের আস্থা হারিয়ে ফেলেন, তাহলে কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে তাঁকে অপসারণ করতে পারে। কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার এক-তৃতীয়াংশ সদস্য কর্তৃক আমীরে জামায়াতের নিকট লিখিতভাবে তাঁর প্রতি অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশ প্রদানের এক মাসের মধ্যে আমীরে জামায়াত কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার অধিবেশন আহ্বান করে উক্ত প্রস্তাব বিবেচনার জন্য পেশ করবেন। কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলে এবং আমীরে জামায়াত তা মেনে নিলে আমীর পদ তখনই শূন্য হবে। কিন্তু আমীরে জামায়াত শূরার সিদ্ধান্ত মেনে না নিলে তিন মাসের মধ্যে সদস্য সম্মেলন আহ্বান করে বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে হবে। যদি সদস্যদের ভোটে আমীরে জামায়াত জয়লাভ করেন, তবে অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণকারী কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং অনধিক তিন মাসের মধ্যে নতুন কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা নির্বাচন করতে হবে। নতুন শূরা গঠনপূর্বকালে কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ শূরার কাজ পরিচালনা করবে।[১৯৩]

জামায়াতের গঠনতন্ত্রের ধারা ২৩ অনুসারে আমীরে জামায়াকে সহযোগিতা করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক নায়েবে আমীর (বর্তমানে ৩ জন), একজন সেক্রেটারি জেনারেল, প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল (বর্তমান ৩ জন), বিভাগীয় সেক্রেটারি ও কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের অন্যান্য সদস্য সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় কর্ম-পরিষদ গঠিত হয়। কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার সঙ্গে পরামর্শক্রমে আমীরে জামায়াত কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্যদের মনোনয়ন দেন। সামষ্টিকভাবে কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ ও ব্যক্তিগতভাবে এর সদস্যগণ তাদের কাজের জন্য আমীরে জামায়াতের নিকট দায়ী থাকেন।[১৯৪] জামায়াতের সাংগঠনিক জেলাসমূহের কাজকর্ম আমীরে জামায়াতের পক্ষ থেকে দেখাশোনার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সাংগঠনিক সেক্রেটারি নিয়োগ করা হয়। একজন সাংগঠনিক সেক্রেটারি কয়েকটি সাংগঠিনক জেলার দায়িত্বে থাকেন।

---

১৯২. ঐ

১৯৩. ঐ, পৃ. ২১-২২

১৯৪. নায়েবে আমীর, সেক্রেটারি জেনারেল, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল, বিভাগীয় সেক্রেটারিদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণার জন্য দেখুন, ঐ, পৃ. ২৩-২৯

জেলা শূরা, জেলা কর্মপরিষদ ও অন্যান্য বৈঠকে তিনি আমীরে জামায়াতের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত থাকেন। সাংগঠনিক সেক্রেটারিরগণ কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্যদের সমান মর্যাদা ভোগ করেন।[১৯৫]

আমীরে জামায়াতের প্রতিনিধি হিসেবে জেলা আমীর জেলা সংগঠনের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি তাঁর কাজকর্মের জন্য আমীরে জামায়াতের নিকট দায়ী থাকেন। জেলার সদস্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে আমীরে জামায়াত দুই বছরের জন্য জেলা আমীর নিয়োগ করেন। গঠনতন্ত্রে উল্লেখ না থাকলেও জানা গেছে যে, জেলার সদস্যগণ জেলা আমীর পদের জন্য তিনজনের একটি প্যানেল গোপন ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন করে আমীরে জামায়াতের নিকট প্রেরণ করেন। আমীরে জামায়াত উক্ত প্যানেল থেকে একজনকে জেলা আমীর পদে নিযুক্তি দেন। জেলা আমীর সদস্য পদের যোগ্যতা হারালে অথবা সংগঠনের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে অথবা জেলার অধিকাংশ সদস্যের আস্থা হারালে আমীরে জামায়াত কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁকে অপসারণ করতে পারেন। জেলা আমীর আমীরে জামায়াতের সম্মতিক্রমে প্রয়োজনে জেলা নায়েবে আমীর নিয়োগ করতে পারেন। জেলা মজলিশে শূরার পরমর্শক্রমে জেলা সেক্রেটারি ও অন্যান্য কর্মপরিষদ সদস্যদেরকে তিনি নিয়োগ ও অপসারণ করতে পারেন।[১৯৬] সামষ্টিকভাবে জেলা কর্মপরিষদ ও ব্যক্তিগতভাবে এর সদস্যগণ জেলা আমীরের নিকট তাঁদের কার্যক্রমের জন্য দায়ী থাকেন।[১৯৭] দেশের চারটি মহানগরীর জামায়াত সংগঠনের আমীরগণ জেলা আমীরের সমান মর্যাদা ও ক্ষমতার অধিকারী।

আমীরে জামায়াত থানা সদস্যদের মতামত যাচাই করে এবং জেলা আমীরের সুপারিশক্রমে এক বছরের জন্য থানা আমীর নিয়োগ করেন। থানা আমীর তাঁর কার্যাবলির জন্য জেলা আমীরের মাধ্যমে আমীরে জামায়াতের নিকট দায়ী থাকেন। থানা আমীর যদি সদস্য পদের যোগ্যতা হারান, সংগঠনের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন অথবা থানার অধিকাংশ সদস্যদের আস্থা হারান, তাহলে আমীরে জামায়াত তাঁকে অপসারণ করতে পারবেন।[১৯৮] দেশের জেলা শহরের

১৯৫. সাক্ষাৎকার : মকবুল আহমদ, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ।

১৯৬. *গঠনতন্ত্র : জামায়াতে, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩০-৩১

১৯৭. ঐ. পৃ. ৩৪

১৯৮. ঐ, পৃ. ৩৫-৩৮

পৌরসভার সংগঠনের আমীরগণ থানা সংগঠনের আমীরের সমান মর্যাদা ও ক্ষমতা ভোগ করেন। বাংলাদেশের চারটি মহানগরীর অধীনস্থ থানা সংগঠনের নায়েমগণ আমীরে জামায়াতের পক্ষ থেকে উপরিউক্ত থানা সংগঠনসমূহ পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ : নেতৃত্ব কাঠামো
(১৯৯১)

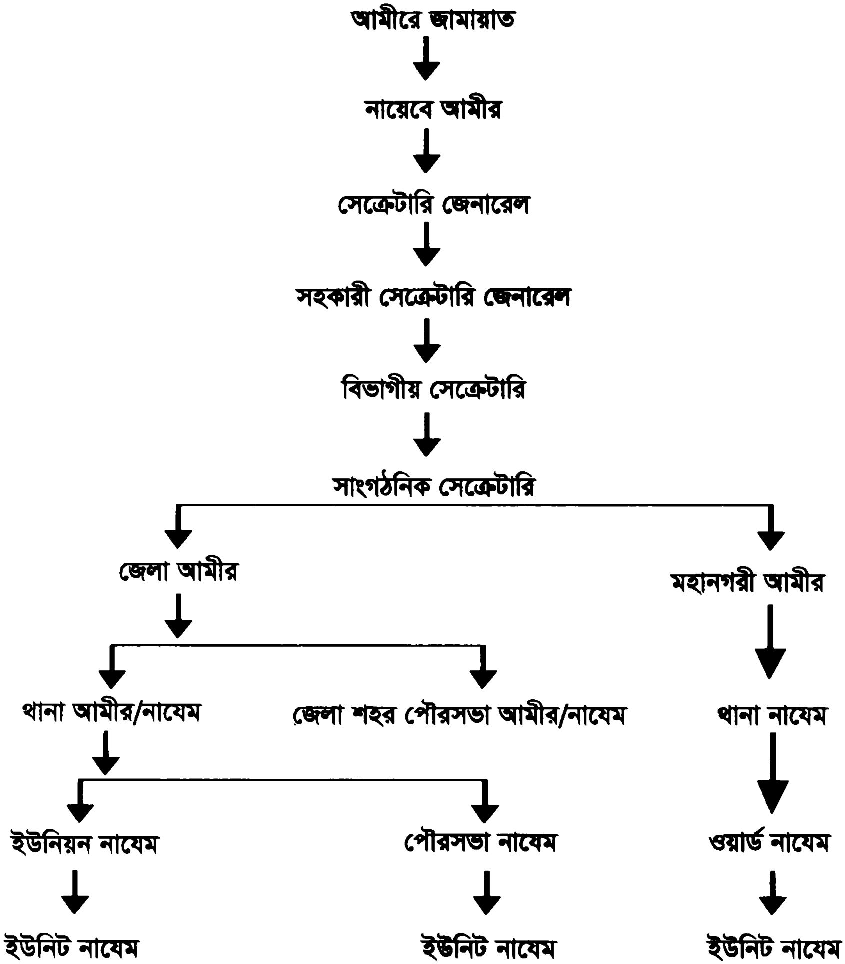

আমীরে জামায়াত ইউনিয়ন সদস্যদের মতামত যাচাই করে থানা ও জেলা আমীরের সুপারিশক্রমে এক বছরের জন্য ইউনিয়ন নাযেম নিয়োগ করেন। ইউনিয়ন নাযেম নিজ ইউনিয়নে আমীরে জামায়াতের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করবেন এবং তাঁর কাজকর্মের জন্য তিনি থানা ও জেলা আমীরের মাধ্যমে আমীরে জামায়াতের নিকট দায়ী থাকবেন।[১৯৯] জেলা শহর নয়– এমন পৌরসভার নাযেমগণ ইউনিয়ন নাযেমের সমান ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী হন।

জামায়াত আন্দোলন ও সংগঠনে সদস্যদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও মর্যাদা অত্যন্ত বেশি। জামায়াতের প্রায় সকল কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা প্রধানত সদস্যদের সংখ্যা ও যোগ্যতার ওপর ভিত্তি করে গ্রহণ করা হয়। কারণ, পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সদস্যরাই সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব পালন করেন।

সদস্যরাই জামায়াতের সকল শক্তিকে কাজে লাগান। সদস্যদেরকে আল্লাহর পথে তাঁদের জান, মাল, শ্রম ও মেধাকে কুরবানি দেওয়ার শপথ গ্রহণ করতে হয়। কোনো বৈরী অবস্থায় অন্য কেউ এগিয়ে না এলেও সদস্যদের এগিয়ে আসতে হয়। সদস্যরাই জামায়াতের নীতি নির্ধারণ ও পরিকল্পনা গ্রহণকারী পদ ও সংস্থা আমীরে জামায়াত ও কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার সদস্যদের নির্বাচিত করেন। অন্যান্য সাংগঠনিক স্তরের সকল নির্বাচনেও কেবল সদস্যরাই ভোটাধিকার প্রয়োগ ক্ষমতার অধিকারী হলেও সকল সদস্য সকল পদে নির্বাচিত বা মনোনীত হতে পারেন না। গঠনতন্ত্র বা অন্য কোনো দলিলে উল্লেখ না থাকলেও জানা গেছে যে, জামায়াতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ যেমন আমীরে জামায়াত, কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা, জেলা আমীর ইত্যাদি পদে নির্বাচনের পূর্বে সদস্যদের নিকট সরকারি কর্মচারী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা সদস্যদের তালিকা পাঠিয়ে তাঁদের ভোট না দেওয়ার জন্য বলা হয়। মহিলা সদস্যরা সকল স্তরের নির্বাচনে ভোটদান ক্ষমতার অধিকারী হলেও পূর্বোক্ত কোনো পদে নির্বাচিত বা মনোনীত হতে পারে না। নিম্নতম (অন্তত ৩ জন) সংখ্যায় সদস্য সংগৃহীত না হওয়া পর্যন্ত জামায়াতের কোনো ইউনিট গঠনতান্ত্রিক মর্যাদা পায় না। সদস্য মর্যাদা প্রাপ্তি ব্যতীত জামায়াতের মনোনয়ন নিয়ে কেউ সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারেন না।[২০০]

---

১৯৯. ঐ, পৃ. ৩৮-৩৯

২০০. গোলাম আযম, *রুকনিয়াতের দায়িত্ব* (ঢাকা, প্রকাশনা বিভাগ, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৯৮৭), পৃ. ৪-৬

জামায়াত তার সদস্যদের শুধু দলীয় সংগঠনের নেতৃত্বে নয়; বরং দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের নেতৃত্বেও প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।[২০১] গোলাম আযমের মতে–

> সামরিক বাহিনীতে কখনও কখনও হঠাৎ করে এমন ধরনের বিউগল বাজানো হয়, যখন সবাইকে নির্দিষ্ট স্থানে হাজির হতে হয়। তেমনিভাবে জামায়াতের যেকোনো ডাকে যারা সাড়া দিলো না, তারা আনুগত্যের পরিচয় দিতেই ব্যর্থ হলো। জামায়াত তাদেরকেই রুকন গণ্য করবে, যাদের ওপর এ ভরসা করা যায় যে– যখনই ডাক দেওয়া হবে, তখনই আর সব দায়িত্ব ফেলে চলে আসবে। তা না হলে জামায়াতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই যে তার জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য, সে কথা কী করে প্রমাণ হবে? রুকনিয়াতের শপথের দাবি এমন ভাব ছাড়া পূরণ হতে পারে না।[২০২]

জামায়াতের দায়িত্বশীল সংস্থা কর্তৃক গৃহীত সকল সিদ্ধান্ত সদস্যদের মেনে নিতে হয়। কোনো সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কোনো সদস্যের ভিন্নমত থাকলে তিনি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট সে ব্যাপারে আপত্তি জানাতে পারেন। কিন্তু সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত না হলেও তাঁকে তা মেনে চলতে হয়।[২০৩]

জামায়াতের আদর্শ, উদ্দেশ্য, কর্মনীতি ও কর্মসূচির সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করে যাঁরা জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এ যোগ দেন, তাঁদেরকে সহযোগী সদস্য গণ্য করা হয়। যে সহযোগী সদস্য ক. সাপ্তাহিক, মাসিক ও অন্যান্য বৈঠকসমূহে নিয়মিত যোগদান, খ. মাসিক চাঁদা প্রদান, ব্যক্তিগত রিপোর্ট তৈরি ও সংরক্ষণ এবং ঘ. নিয়মিত দাওয়াতের কাজ করা ইত্যাদির যেকোনো একটি কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পাদন করেন, তাঁকে সক্রিয় সহযোগী সদস্য বলে গণ্য করা হয়। যে সক্রিয় সহযোগী সদস্য উপরিউক্ত চারটি কাজের প্রত্যেকটি সম্পাদন করেন, তিনি জামায়াতে ইসলামীর কর্মীর মর্যাদা লাভ করেন। একজন কর্মী যখন জামায়াতের নেতৃত্বের বিবেচনানুসারে খাঁটি মুসলিম জীবনের ন্যূনতম মানে পৌঁছেন, তখন তাঁকে জামায়াতের সদস্য গণ্য করা হয়। যেসব সদস্য জামায়াতবিরোধী শক্তির বিভিন্ন রকম বাধা অতিক্রম করে জামায়াতের কাজে এগিয়ে যেতে সক্ষম হন, তাঁরাই জামায়াতের বিভিন্ন স্তরের

---

২০১. ঐ, পৃ. ১২-১৩

২০২. ঐ, পৃ. ১৬

২০৩. ঐ, পৃ. ১২

নেতৃত্বের পদে আসীন হন। জামায়াতের উপরোল্লিখিত ক্যাডার-ব্যবস্থার ফলে ত্যাগী নেতৃত্ব এবং কর্মীবাহিনী গড়ে উঠা সম্ভব হয় বলে দাবি করা হয়।[২০৪] আদর্শভিত্তিক আন্দোলনে দায়িত্ব পালনক্ষম উপযুক্ত নেতা ও কর্মী তৈরি করার জন্য ক্যাডার ব্যবস্থা অনুসরণ করতে হয়। হযরত মুহাম্মাদ সা. পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনেও একধরনের ক্যাডার পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে।[২০৫] গোলাম আযামের মতে–

> ... জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী ছাত্রশিবির ও ইসলামী ছাত্রী সংস্থা ইসলামী বিপ্লবের যোগ্য মন, মগজ ও চরিত্র বিশিষ্ট এক বাহিনী গঠন করার মহান উদ্দেশ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে। এসব সংগঠন মানের ভিত্তিতে শ্রেণিবিন্যাস করে লোক তৈরি করছে। এ পদ্ধতিই 'ক্যাডার সিস্টেম' নামে পরিচিত। ... ইসলামবিরোধী শক্তির সঙ্গে সময় সময় জামায়াতের যে টক্কর (বিরোধ) হয়েছে, তাতে দেখা গেছে যে– কোনো লোক পেছনের কাতার থেকে সামনে এগিয়ে গিয়েছে এবং কেউ কেউ নিজ স্থান থেকে পিছিয়ে পড়েছে। এটাই 'ন্যাচারাল ক্যাডার সিস্টেম'। জামায়াত যে সহযোগী সদস্য, কর্মী ও রুকনের ক্যাডার সিস্টেম চালু করেছে, তা ওই আসল ক্যাডারে পৌঁছার প্রস্তুতি মাত্র। .... হক ও বাতিলের সংঘর্ষের শেষ পর্যায়ে যারা টিকে থাকবে, তারাই আসল ক্যাডার। ওই আসল ক্যাডার হিসেবে টিকে থাকার যোগ্য বানানোর জন্যই বর্তমান ক্যাডার সিস্টেমের প্রচলন করা হয়েছে।[২০৬]

কোনো ব্যক্তি জামায়াতের সদস্য হতে চাইলে তাকে জামায়াতের সহযোগী সদস্য, সক্রিয় সহযোগী সদস্য, কর্মী, অগ্রসর কর্মী ও সদস্যপদ প্রার্থীদের জন্য নির্ধারিত কোর্সের বইসমূহ অধ্যয়ন করতে হয়। উপরিউক্ত স্তরসমূহে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সফলতা প্রদর্শন করতে হয়।[২০৭] এ ছাড়া সদস্যপ্রার্থীকে ইসলামী আন্দোলন ও জামায়াত সংগঠনে তাঁর ভূমিকা, পারিবারিক পরিবেশ,

---

২০৪. *জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ পরিচিতি* (ঢাকা, প্রকাশনা বিভাগ, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৯৮৪), পৃ. ১১-১২

২০৫. গোলাম আযম, *ইকামতে দ্বীন*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৫-৩৬

২০৬. গোলাম আযম, *ইসলামী আন্দোলন : সাফল্য ও বিভ্রান্তি*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭-২৯

২০৭. জামায়াত নেতা-কর্মীদের জন্য পাঠ্য বইয়ের (১-৫ কোর্স) তালিকা রয়েছে, *সংগঠন পদ্ধতি : জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ* (ঢাকা, প্রকাশনা বিভাগ, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৯৮৯), পৃ. ৬৫-৭৬

জামায়াত সংগঠনে অন্তর্ভুক্তির ঝুঁকি ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতনতা ও প্রস্তুতি বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্নের লিখিত উত্তর প্রদান করতে হয়। সদস্যপদের জন্য প্রার্থীকে যে নির্ধারিত ফরম পূরণ করতে হয়, তাতে নিম্নোক্ত অঙ্গীকারমূলক বাক্য রয়েছে–

> আমি আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি লাভের আশায় এবং দ্বীনের পরিপূর্ণ দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে নিজের জান ও মাল আল্লাহ্ তায়ালার নিকট সম্পূর্ণরূপে সোপর্দ করে জামায়াতে ইসলামীর রুকন (সদস্য) হতে চাই।[২০৮]

নিম্নলিখিত শর্তাবলি পূরণ সাপেক্ষে যেকোনো সুস্থ, বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ও পূর্ণবয়স্ক নর-নারী জামায়াতের সদস্য হতে পারেন–

১. জামায়াতের মৌলিক আকিদা নিজের আকিদা বলে মেনে নেওয়া।[২০৯]

২. জামায়াতের উদ্দেশ্য-লক্ষ্যকে নিজের জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বলে গ্রহণ করা।

৩. জামায়াতের নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলা।

৪. শরিয়তের ফরজ ও ওয়াজিবসমূহ রীতিমতো আদায়করণ।

৫. অনৈসলামিক উপার্জন পন্থা ত্যাগ।

৬. অনৈসলামিক পথে অর্জিত সম্পদ ত্যাগ।

৭. জামায়াতের আকিদা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যবিরোধী দল বা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক না রাখা।

৮. জামায়াতের সাংগঠনিক দায়িত্বশীলদের দৃষ্টিতে সদস্য হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হওয়া।[২১০]

উপরিউক্ত শর্তাবলি পূরণক্ষম ব্যক্তি সদস্যপদের জন্য নির্ধারিত আবেদনপত্র পূরণ করলে তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আমীরে জামায়াতের নিকট প্রেরিত হয়। জানা গেছে যে, নির্ধারিত ফরম পূরণের পরও সদস্যপ্রার্থীর আচার-আচরণ, মানসিক দৃঢ়তা, চরিত্র, বিশ্বাসযোগ্যতা সর্বোপরি জামায়াতের আদর্শ

---

২০৮. দেখুন, জামায়াতে ইসলামী ফরম, নম্বর ১৩ (মুদ্রণ, ডিসেম্বর, ১৯৮৯)।

২০৯. জামায়াতের মৌলিক আকিদাসমূহ সম্পর্কে ধারণার জন্য দেখুন, *গঠনতন্ত্র : জামায়াতে*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮-১০

২১০. ঐ, পৃ. ১৪

ও কর্মপদ্ধতি মেনে নিতে উক্ত ব্যক্তি শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত কি-না ইত্যাদি প্রশ্নে নিশ্চিত হওয়ার জন্য বেশ কিছুদিন তাঁকে নানাভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়। এরপর আমীরে জামায়াত মজলিশে শূরা কর্তৃক নির্ধারিত পন্থানুসারে উক্ত ব্যক্তির সদস্যপদ মঞ্জুর করেন। সদস্যপধ প্রদানের জন্য মনোনীত ব্যক্তিকে আমীরে জামায়াত বা তাঁর কোনো প্রতিনিধির সামনে সদস্যপদ প্রাপ্তির শপথ গ্রহণ করতে হয়।[২১১] কয়েক লক্ষ সহযোগী সদস্য ও কর্মী থাকা সত্ত্বেও জুলাই, ১৯৯১-এ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র সদস্য সংখ্যা ছিল ৫,৪৮২ জন।[২১২] সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য জামায়াত তার আদর্শবাদী চরিত্র, শৃঙ্খলা ইত্যাদি পরিত্যাগ করতে সম্মত নয় বলে দাবি করে। এ কারণে এ সংগঠনের সদস্য সংখ্যা খুব বেশি বাড়ার সম্ভাবনা কম বলে মনে করা হয়।[২১৩] সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির চেয়ে গুণগত মানসম্পন্ন সদস্য তৈরির ওপর জামায়াত বেশি জোর দিয়ে থাকে।[২১৪]

গোলাম আযমের মতে– ইসলামের বিধানানুসারে মুসলমানদের সংগঠিত জীবনযাপন করতে হয় এবং যিনি সংগঠনের নেতা নির্বাচিত হন, তাঁর কাছে 'বাইয়াত' (আনুগত্যের শপথ) নিতে হয়। জামায়াতের সদস্যগণ শপথ গ্রহণের মাধ্যমে জামায়াতের নিকট 'বাইয়াত' হন বিধায় আমীরে জামায়াতের নিকট পৃথকভাবে 'বাইয়াত' হওয়ার প্রয়োজন হয় না। যিনি 'বাইয়াত' গ্রহণ করেন, তিনি তাঁর জীবন ও ধন-সম্পদসহ গোটা সত্তা ইকামতে দ্বীনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার শপথ নেন। ইসলামী সংগঠনের শরীয়তসম্মত যেকোনো নির্দেশ নির্দ্বিধায় 'বাইয়াত' গ্রহণকারীকে পালন করতে হয়। যাঁরা জামায়াতের সদস্য পদের শপথ নেননি, কিন্তু কর্মী ও সহযোগী সদস্য হিসেবে জামায়াতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তাঁরা সদস্যদের মতো পূর্ণাঙ্গ 'বাইয়াত' গ্রহণ না করলেও ইকামতে দ্বীনের উদ্দেশ্যে আংশিক 'বাইয়াত' গ্রহণ করেন। মুসলমানদের ঈমানের দাবি হলো পূর্ণাঙ্গ 'বাইয়াত'। তাই কর্মী ও সহযোগী সদস্যসহ সকল মুসলমানকে পূর্ণাঙ্গ 'বাইয়াতের' পথে অর্থাৎ, সদস্যপদপ্রাপ্তির পথে এগিয়ে যেতে হবে।[২১৫]

---

২১১. ঐ, পৃ. ৫১

২১২. সাক্ষাৎকার : অধ্যাপক গোলাম আযম।

২১৩. Ghulam Azam, *A Guide to, op. cit.*, pp. 40-41

২১৪. আবুল আ'লা মওদূদী, *ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কর্মসূচি*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৬

২১৫. গোলাম আযম, *বাইয়াতের হাকীকত* (ঢাকা, আল-আযামী পাবলিকেন্স, ১৯৮৯), পৃ. ১, ৪, ৮, ১০, ১৮, ১৯

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র সদস্যদের অনেকগুলো ধর্মীয় ও সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করতে হয়। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র গঠনতন্ত্রে এসব দায়িত্ব ও কর্তব্যের তালিকা উল্লেখিত হয়েছে।[২১৬]

জামায়াতের সহযোগী সদস্য, কর্মী ও সদস্যদেরকে তাঁদের দৈনিক কাজকর্মের রিপোর্ট রাখতে হয়। ব্যক্তিগত রিপোর্ট রাখার জন্য নির্ধারিত ফরম বা বই সংগঠন সরবরাহ করে। কুরআন, হাদিস ও ইসলামী বই অধ্যয়ন, জামায়াতে নামাজ আদায়, দাওয়াতি টার্গেট ও কর্মী টার্গেট সাক্ষাৎ, কর্মী যোগাযোগ, বই বিলি ও বিক্রয়, সাংগঠনিক ও পারিবারিক বৈঠক, বায়তুলমাল বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে কর্মী ও সদস্যদের রিপোর্ট রাখতে হয়। থানা, জেলা ও অন্যান্য পর্যায়ের বৈঠকে এসব ব্যক্তিগত রিপোর্ট পর্যালোচনা করা হয়।[২১৭]

বর্তমান যুগের ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মী হিসেবে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ধর্মানুরাগী লোকজন ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত লোকজন অপেক্ষা বেশি কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেন বলে মাওলানা মওদূদী মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, আধ্যাত্মিক ও দ্বীনি জ্ঞানে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিতরা প্রাগ্রসর হলেও দেশ শাসন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁদের যোগ্যতার অভাব রয়েছে। তাই ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মী হিসেবে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ধর্মনিষ্ঠ লোকজনকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।[২১৮] কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণকারী লোকজনের নিকট ইসলামী আন্দোলনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরার জন্য জামায়াত বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় ইসলামী সাহিত্য রচনা ও প্রকাশের ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। জামায়াত দাবি করে যে, তাদের ইসলামী প্রকাশনাসমূহ অধ্যয়ন ও বিভিন্নভাবে প্রদত্ত প্রশিক্ষণের ফলে মাদরাসা শিক্ষায় শিক্ষিত আলেমগণের এক উল্লেখযোগ্য অংশ বর্তমানে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের নিকট ইসলামের শিক্ষা

---

২১৬. দেখুন, *গঠনতন্ত্র : জামায়াতে*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫-১৬

২১৭. দেখুন, জামায়াতে ইসলামী ফরম, নম্বর ১ (কর্মী রিপোর্ট ফরম), ফরম নম্বর ২ (রুকন/রুকন পদপ্রার্থী রিপোর্ট ফরম) ও *ব্যক্তিগত রিপোর্ট বই* (কর্মী) (ঢাকা, প্রকাশনা বিভাগ, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৯৮৯)

২১৮. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *মুসলিম বিশ্বে ইসলামী আন্দোলনের কর্মধারা* (ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮৬), পৃ. ১৫

উপস্থাপনের যোগ্যতা অর্জন করেছে। আর আধুনিক শিক্ষাধারীদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠেছে। এভাবে উভয় ধারার শিক্ষা গ্রহণকারী লোকজন থেকে একদল ইসলামী চিন্তাবিদ, নেতা ও কর্মী সৃষ্টিতে জামায়াত সফল হয়েছে।[২১৯] অন্য কোনো ইসলামী সংগঠনের পক্ষে এ কাজে বিশেষ ভূমিকা পালন এখনও সম্ভব হয়নি। জামায়াত, এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনে স্কুল-কলেজ ও মাদরাসা শিক্ষায় শিক্ষিত লোকজন পাশাপাশি কাজ করছেন।

উন্নয়নশীল দেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের নিজস্ব সমর্থন ভিত্তি থাকে। বিভিন্ন অর্থনৈতিক শ্রেণি, পেশা, ধর্মীয় সম্প্রদায় ইত্যাদির সমর্থন লাভের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্নভাবে প্রয়াস পায়। প্রভাব-বলয় ও শক্তি বাড়ানোর জন্য নিজস্ব সমর্থন ভিত্তির বাইরে থেকেও সমর্থন লাভের জন্য রাজনৈতিক দলগুলো চেষ্টা করে। জি. এইচ. জানসেন ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম উৎসাহী সমর্থক হিসেবে মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে চিহ্নিত করেছেন।[২২০]

বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত বিশেষত নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণি জামায়াতে ইসলামীর প্রধান সমর্থন ভিত্তি বলে বিবেচিত হতে পারে। তালুকদার মনিরুজ্জামানের মতে, যে বর্ধিষ্ণু শিক্ষিত নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণি বাংলাদেশে জামায়াতের সামাজিক ভিত্তি প্রদান করেছে, সেটি ভবিষ্যতে আরও স্ফীত হতে থাকবে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণির সঙ্গে চাকুরি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার প্রতিযোগিতায় এ শ্রেণিটি নিদারুণ বঞ্চণা ও নিরাপত্তাহীনতার মনোভাবে পীড়িত হতে পারে। এ জাতীয় বিক্ষুব্ধ ব্যক্তিরা জামায়াত অথবা কমিউনিস্ট ধাঁচের সর্বাত্মকবাদী আন্দোলনের দিকে ঝুঁকে পড়তে পারে। কমিউনিস্ট শিবিরের বহুধা বিভক্তি ও ব্যর্থতার কারণে বিক্ষুব্ধ নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে জামায়াতের শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।[২২১]

---

২১৯. *পরিচিতি : জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ* (ঢাকা, প্রকাশনা বিভাগ, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৯৯০), পৃ. ১৯

২২০. G. H. Jansen, *Miltant Islam* (New York, Harper and Row Publishers, 1979). p. 46

২২১. Talukder Maniruzzaman, 'Bangladesh Politics: Secular and', *op cit.*, p. 68

জামায়াত রাজনীতিতে উদার ও সমাজ সচেতন আলেম, শিক্ষক, আইনজীবী, ডাক্তার, প্রকৌশলী, লেখক, সৎ ব্যবসায়ী ইত্যাদি পেশার লোকজন প্রধানত যোগ দিয়েছেন বলে গোলাম আযম মত প্রকাশ করেছেন।[২২২] জানসেনের মতে– জামায়াত হচ্ছে একটি এলিটভিত্তিক সংগঠন।[২২৩]

জামায়াত নেতা ও কর্মীরা বিভিন্ন ধরনের অনেকগুলো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। জামায়াতের নেতা-কর্মীরাই এসব প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছেন। জামায়াতে ইসলামীর নেতা-কর্মীদের অর্থনৈতিক অবস্থা এ কারণে ক্রমশ উন্নত হচ্ছে বলে মনে করা হয়।[২২৪] জামায়াতের সঙ্গে রাজতান্ত্রিক দেশ সৌদি আরবসহ অন্যান্য তেলসমৃদ্ধ মুসলিম দেশ এবং পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী দেশসমূহের সঙ্গে অর্থনৈতিক যোগাযোগের কথাও শোনা যায়। জামায়াত নেতা-কর্মীদের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনে এ যোগাযোগের ভূমিকার কথাও বলা হয়।[২২৫] জামায়াত অবশ্য এ জাতীয় যোগাযোগের কথা স্বীকার করে না।

নিম্নে বিভিন্ন স্তরের জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র নেতৃত্বের সামাজিক পটভূমি উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হলো।[২২৬]

সারণী ২ : ১-তে দেখা যাচ্ছে যে, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র নেতৃত্বে মধ্য বয়সি অর্থাৎ, ৪০-৫০ বছর লোকদের প্রাধান্য রয়েছে। ৩০-৪০ বছর অর্থাৎ, যুব বয়সের লোকজন দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন। (পৃষ্ঠা নং ৮৫)

সারণী ২ : ২ দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র নেতৃত্বের সর্বস্তরে স্কুল-কলেজ ও মাদরাসা শিক্ষায় শিক্ষিত লোকেরা রয়েছেন। বিভিন্ন স্তরের জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র নেতৃত্বে এমন কিছু লোক আছেন, যাঁদের উপরিউক্ত উভয় শিক্ষা রয়েছে। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র

---

২২২. Ghulam Azam, A Guide to, *op. cit.*, p. 53

২২৩. G. H. Jansen, *op. cit.*, p. 177

২২৪. U. A. B. Razia Akter Banu, op. cit

২২৫. মাওলানা আবদুল আউয়াল, 'জামায়াতের অর্থের উৎস', লেখকের প্রবন্ধ সংকলন, *জামায়াতের আসল চেহারা* (ঢাকা, আওয়ামী ওলামা পরিষদ, ১৯৮৮), পৃ. ৯৮-১০৪

২২৬. নিজস্ব জরিপ থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত অনুসারে। বিস্তারিত ধারণার জন্য উপক্রমণিকা অধ্যায়ে 'গবেষণা পদ্ধতি', দেখুন।

নেতৃত্বে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী লোকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। কামিল ডিগ্রিধারী লোকজন দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন। সারণী ২ : ২ পরিবেশিত তথ্যানুসারে, মাদরাসা শিক্ষা গ্রহণকারী আলিমদের তুলনায় স্কুল-কলেজের শিক্ষাধারী লোকজন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র নেতৃত্বে বেশি সংখ্যায় রয়েছেন। (পৃষ্ঠা নং ৮৬)

সারণী ২ : ৩-এ দেখা যাচ্ছে যে, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র নেতৃত্বের উল্লেখযোগ্য অংশের পিতার কোনো শিক্ষাগত যোগ্য নেই বা ছিল না। এ সারণী থেকে এটি স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, উচ্চ ডিগ্রিধারী আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত লোকজনের সন্তানগণ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র রাজনীতিতে খুব বেশি আসেননি। (পৃষ্ঠা নং ৮৭)

সারণী ২ : ৪-এ দেখা যায় যে, মধ্যবিত্ত শ্রেণি-পেশা হিসেবে পরিচিত বিভিন্ন পেশায় জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র অধিকাংশ নেতৃত্ব নিয়োজিত রয়েছেন বা ছিলেন। শিক্ষকতা পেশার লোকেরাই জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র নেতৃত্বে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় আসীন রয়েছেন। (পৃষ্ঠা নং ৮৮)

সারণী ২ : ৫ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র নেতৃত্বে মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রাধান্য স্পষ্ট করে। সর্বাধিক সংখ্যক জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র নেতার বার্ষিক আয় ৬০,০০০ থেকে ১ লক্ষ টাকার ভেতর।[২২৭] (পৃষ্ঠা নং ৮৯)

সারণী ২ : ৬-এর তথ্যানুসারে অধিকাংশ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ নেতার পিতার অর্থনৈতিক অবস্থান হচ্ছে বা ছিল মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণিতে। (পৃষ্ঠা নং ৯০)

---

২২৭. জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র নেতৃত্বের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি নেতৃত্বের বয়স, শিক্ষা, পেশা ও আয় বিষয়ক পার্থক্য সম্পর্কে ধারণার জন্য দেখুন, Raunaq Jahan, *Bangladesh Politics: Problems and Issues* (Dhaka, University Press Ltd., 1980). pp. 146-149. Golam Hossain, *General Ziaur Rahman and the BNP* (Dhaka, Unirersity Press Ltd., 1988). pp. 114-118 আওয়ামী লীগ এম.পি. (১৯৭০ ও ১৯৭৩) ও বিএনপি নেতাদের (১৯৮২) সামাজিক পটভূমি সম্পর্কিত তথ্যাদি (উপরিউক্ত গ্রন্থ দুটিতে পরিবেশিত) বেশ কয়ে বছর আগে নেওয়া হলেও দেখা যায় যে, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র বর্তমান (১৯৯১) নেতাদের তুলনায় উপরিউক্ত দল দুটির নেতাদের বার্ষিক আয় অনেক বেশি ছিল।

সারণী ২ : ৭ দ্বারা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, বর্তমানে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র নেতৃত্বে গ্রামে জন্মগ্রহণকারী লোকজন সর্বাধিক সংখ্যায় আসীন রয়েছে। (পৃষ্ঠা নং ৯১)

সারণী ২ : ৮ স্পষ্ট করেছে যে, ৭৭.৭৮% জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র নেতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁদের অনেকেই বর্তমানে স্থায়ীভাবে শহরে বাস করছেন। (পৃষ্ঠা নং ৯২)

উপরিউক্ত সারণীসমূহে যেসব জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র নেতার তথ্য পরিবেশিত হয়েছে, সেসব নেতাদের ৯.৭৩%-এর পিতা রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন না; আর ১১.১১% মুসলিম লীগ, ১০.৪২% জামায়াত, ১.৩৯% খেলাফতে রাব্বানী পার্টি, ০.৬৯% নেজামে ইসলাম, ০.৬৯% কে.এস.পি., ০.৬৯% অন্য ইসলামী দল ও ০.৬৯% অন্য ডানপন্থি দল করতেন। ২.০৯% এ প্রশ্নের উত্তর দেননি। ১২.৫০%-কে উত্তরদানের জন্য পাওয়া যায়নি।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র নেতাদের ৭০.৮৪% জামায়াতে যোগদানের পূর্বে অন্য কোনো রাজনৈতিক দলে কাজ করেননি। ৫.৫৬% আওয়ামী লীগ, ৪.৮৬% মুসলিম লীগ, ২.০৪% জাসদ, ২.০৪% নেজামে ইসলাম, ১.৩৯% আইডিএল, ০.৬৯% জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ করতেন। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র নেতাদের ১২.৫০%-কে উত্তরদানের জন্য পাওয়া যায়নি।[২২৮]

২২৮. নিজস্ব জরিপ

সারণী ২ : ১
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ নেতৃত্বের বয়সগত বৈশিষ্ট্য
(১৯৯১)

শতকরা হারে

স্তর	৩০ বছরের নীচে	৩০-৪০	৪০-৫০	৫০-৬০	৬০ উর্ধ্ব	উত্তর পাওয়া যায়নি
কে ক প		৭.৪১	৩৭.০৪	২৫.৯২	২২.২২	৭.৪১
সাংগঠনিক সেক্রেটারি			৯.০৯		৬৩.৬৪	২৭.২৭
সংসদ সদস্য		২৫.০০	২৫.০০	৩৫.০০	১০.০০	৫.০০
জেলা আমীর		৪৩.৭৫	৩১.২৫	১৮.৭৫	৬.২৫	
চট্টগ্রাম উত্তর জেলা	৮.৩৩	৩৩.৩৩	২৫.০০			৩৩.৩৪
লক্ষ্মীপুর জেলা		১৬.৬৭	৬৬.৬৭			১৬.৬৬
হাটহাজারী থানা (শহর)	৩৩.৩৩	৫৮.৩৩	৮.৩৪			
রায়পুর থানা	৮.৩৩	৮.৩৩	৫০.০০	৮.৩৪		২৫.০০
দক্ষিণ পাহাড়তলী ইউনিয়ন	১০.০০	৪০.০০	২০.০০			৩০.০০
চরপাতা ইউনিয়ন		৬৬.৬৭	১৬.৬৭	১৬.৬৬		
মোট	৪.৮৬	২৭.৭৮	২৯.৮৬	১৩.৮৯	১১.১১	১২.৫০

উৎস : নিজস্ব জরিপ

সারণী ২ : ২

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ নেতৃত্বের শিক্ষাগত বৈশিষ্ট্য

(১৯৯১)

শতকরা হারে

স্তর	স্নাতকোত্তর	স্নাতক	উচ্চ মাধ্যমিক	মাধ্যমিক	কামিল	ফাজিল	আলিম	ডিপ্লোমা	মাধ্যমিক ও আলিমের নীচে	উত্তর পাওয়া যায়নি
কে ক প	৪৮.৩৯	১৯.৩৫		৩.২৩	২২.৫৮					৬.৪৫
সাংগঠনিক সেক্রেটারি	৩৮.৪৬			৭.৬৯	২৩.০৮	৭.৬৯				২৩.০৮
সংসদ সদস্য	২০.৮৩	২৫.০০	৮.৩৩		৩৭.৫০	৪.১৭				৪.১৭
জেলা আমীর	৪৫.০০	২০.০০		১০.০০	২০.০০	৫.০০				
চট্টগ্রাম উত্তর জেলা	২৮.৫৭	১৪.২৯			২১.৪৩			৭.১৪		২৮.৫৭
লক্ষ্মীপুর জেলা	১৩.৩৩	২৬.৬৭	৬.৬৭	১৩.৩৩	২৬.৬৭					১৩.৩৩
হাটহাজারী থানা (শহর)	১৪.২৯	২১.৪৩	২৮.৫৭	৭.১৪	২৮.৫৭					
রায়পুর থানা		৭.১৪	৭.১৪	৩৫.৭২	২১.৪৩				৭.১৪	২১.৪৩
দ. পাহাড়তলী ইউনিয়ন		২০.০০	৩০.০০			১০.০০	১০.০০			৩০.০০
চরপাতা ইউনিয়ন	৭.১৪	৭.১৪	২১.৪৩	২১.৪৩	৩৫.৭২				৭.১৪	
মোট	২৯.৮৬	১৬.৬৭	৮.৩৩	৭.৬৪	২০.১৪	২.০৯	০.৬৯	০.৬৯	১.৩৯	১২.৫০

উৎস : পূর্বোক্ত

সারণী ২ : ৩
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ নেতাদের পিতার শিক্ষাগত বৈশিষ্ট্য
(১৯৯১)
শতকরা হারে

স্তর	স্নাতকোত্তর	স্নাতক	উচ্চ মাধ্যমিক	মাধ্যমিক	কামিল	ফাজিল	আলিম	যোগ্যতা নেই	এ প্রশ্নের উত্তর নেই	উত্তর পাওয়া যায়নি
কে ক প				১৭.৮৬	১০.৭১	২১.৪৩	৭.১৪	৩৫.৭২		৭.১৪
সাংগঠনিক সেক্রেটারি				১৮.১৮	২৭.২৭			২৭.২৭		২৭.২৮
সংসদ সদস্য		৫.০০	১০.০০	৫.০০	৫.০০			৭০.০০		৫.০০
জেলা আমীর		৬.২৫				৬.২৫	৬.২৫	৮১.২৫		
চট্টগ্রাম উত্তর জেলা					৮.৩৩			৫৮.৩৩		৩৩.৩৪
লক্ষীপুর জেলা				১৬.৬৭	৮.৩৩				৫৮.৩৩	১৬.৬৭
হাটহাজারী থানা (শহর)				৮.৩৩				৬৬.৬৭	২৫.০০	
রায়পুর থানা					৮.৩৩		৮.৩৩	২৫.০০	৩৩.৩৪	২৫.০০
দ. পাহাড়তলী ইউনিয়ন				২০.০০	১০.০০			১০.০০	৩০.০০	৩০.০০
চরপাতা ইউনিয়ন							৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	৩৩.৩৪	
মোট		১.৩৮	১.৩৮	৮.৯৭	৭.৫৯	৪.৮৩	৫.৫২	৪৩.৪৫	১৪.৪৮	১২.৪১

উৎস : পূর্বোক্ত

সারণী ২ : ৪
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ নেতৃত্বের পেশাগত বৈশিষ্ট্য
(১৯৯১)
শতকরা হারে

স্তর	শিক্ষক	প্রাক্তন শিক্ষক	ব্যবসা	লেখালেখি	সাংবাদিকতা	অন্য চাকুরি	ডাক্তার	আইনজীবী	কৃষিবিদ	কৃষি কাজ	ইমামতি	গৃহিনী	উত্তর পাওয়া যায়নি
কে ক প		৭.৪১	৪০.৭৪	১১.১১	১৪.৮১	১১.১১		৩.৭০	৩.৭১				৭.৪১
সাংগঠনিক সেক্রেটারি	১৮.১৮	৯.১০	৩৬.৩৬							৯.০৯			২৭.২৭
সংসদ সদস্য		৪০.০০	২৫.০০	৫.০০			৫.০০	৫.০০		১০.০০		৫.০০	৫.০০
জেলা আমীর	৩৭.৫০		১২.৫০			৬.২৫	৬.২৫	১২.৫০		২৫.০০			
চট্টগ্রাম উত্তর জেলা	৫০.০০		৮.৩৩			৮.৩৩							৩৩.৩৪
লক্ষীপুর জেলা	৫০.০০		১৬.৬৭			৮.৩৩				৮.৩৩			১৬.৬৭
হাটহাজারী থানা (শহর)	৫৮.৩৩		১৬.৬৭			১৬.৬৭	৮.৩৩						
রায়পুর থানা	৫০.০০		১৬.৬৭			৮.৩৩							২৫.০০
দ. পাহাড়তলী ইউনিয়ন	৩০.০০		২০.০০			১০.০০					১০.০০		৩০.০০
চরপাতা ইউনিয়ন	৫৮.৩৩		২৫.০০			৮.৩৩				৮.৩৪			
মোট	২৯.৮৬	৭.৬৪	২৩.৬১	২.৭৮	২.৭৮	৭.৬৪	২.০৮	২.৭৮	০.৬৯	৬.২৫	০.৬৯	০.৭০	১২.৫০

উৎস : পূর্বোক্ত

সারণী ২ : ৫
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ নেতৃত্বের বার্ষিক আয়
(১৯৯১)
শতকরা হারে

স্তর	৬ হাজারের নীচে	৬–১২	১২–২৪	২৪–৬০	৬০–১ লাখ	১ লাখের উপর	উত্তর পাওয়া যায়নি
কে ক প				৭.৪১	৬৬.৬৭	১৮.৫১	৭.৪১
সাংগঠনিক সেক্রেটারি				৪৫.৪৬	২৭.২৭		২৭.২৭
সংসদ সদস্য				১০.০০	৭০.০০	১৫.০০	৫.০০
জেলা আমীর			৬.২৫	৫০.০০	৩৭.৫০	৬.২৫	
চট্টগ্রাম উত্তর জেলা			৮.৩৩	২৫.০০	২৫.০০	৮.৩৩	৩৩.৩৪
লক্ষীপুর জেলা			১৬.৬৭	৫০.০০	১৬.৬৭		১৬.৬৬
হাটহাজারী থানা (শহর)			৩৩.৩৩	৪১.৬৭	২৫.০০		
রায়পুর থানা		৮.৩৪	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩			২৫.০০
দক্ষিণ পাহাড়তলী ইউনিয়ন			৫০.০০	১০.০০	১০.০০		৩০.০০
চরপাতা ইউনিয়ন		৮.৩৩	৮.৩৩	৩৩.৩৪	৫০.০০		
মোট		১.৩৯	১২.৫০	২৭.৭৮	৩৮.৮৯	৬.৯৪	১২.৫০

উৎস : পূর্বোক্ত

সারণী ২ : ৬
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ নেতাদের পিতার বার্ষিক আয়
(১৯৯৯১)
শতকরা হারে

স্তর	৬ হাজারের নীচে	৬-১২	১২-২৪	২৪-৬০	৬০-১ লাখ	১ লাখের উপর	উত্তর নেই	উত্তর পাওয়া যায়নি
কে ক প	৭.৪১	২২.২২	১৪.৮১	১৮.৫২	৭.৪১	৩.৭০	১৮.৫২	৭.৪১
সাংগঠনিক সেক্রেটারি	১৮.১৮	১৮.১৮	৯.০৯	১৮.১৮	৯.০৯			২৭.২৮
সংসদ সদস্য	৫.০০	৩৫.০০	৫.০০	১০.০০	৩০.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০
জেলা আমীর	১৮.৭৫		১৮.৭৫	৫০.০০	১২.৫০			
চট্টগ্রাম উত্তর জেলা	১৬.৬৭	৮.৩৩	৮.৩৩	২৫.০০			৮.৩৩	৩৩.৩৪
লক্ষ্মীপুর জেলা		৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	৮.৩৩			৮.৩৩	১৬.৬৭
হাটহাজারী থানা (শহর)		৮.৩৩	২৫.০০	৮.৩৩	৮.৩৪		৫০.০০	
রায়পুর থানা	৮.৩৩	১৬.৭		৮.৩৩			৪১.৬৭	২৫.০০
দক্ষিণ পাহাড়তলী ইউনিয়ন		১০.০০		৩০.০০	২০.০০		১০.০০	৩০.০০
চরপাতা ইউনিয়ন	৮.৩৩	৩৩.৩৩	১৬.৬৭	১৬.৬৭	১৬.৬৭		৮.৩৩	
মোট	৮.৩৩	১৯.৪৫	১৩.১৯	১৯.৪৫	১১.১১	১.৩৯	১৪.৫৮	১২.৫০

উৎস : পূর্বোক্ত

সারণী ২ : ৭
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ নেতাদের জন্মস্থান (১৯৯১)
শতকরা হারে

স্তর	গ্রাম	রাজধানী শহর	বিভাগীয় শহর	জেলা শহর	থানা শহর	উত্তর পাওয়া যায়নি
কে ক প	৭০.৩৭	১১.১১		১১.১১		৭.৪১
সাংগঠনিক সেক্রেটারি	৭২.৭৩					২৭.২৭
সংসদ সদস্য	৭৫.০০	৫.০০		১৫.০০		৫.০০
জেলা আমীর	৯৩.৭৫			৬.২৫		
চট্টগ্রাম উত্তর জেলা	৬৬.৬৭					৩৩.৩৩
লক্ষ্মীপুর জেলা	৭৫.০০			৮.৩৩		১৬.৬৭
হাটহাজারী থানা (শহর)	৯১.৬৭				৮.৩৩	
রায়পুর থানা	৬৬.৬৭				৮.৩৩	২৫.০০
দ. পাহাড়তলী ইউনিয়ন	৭০.০০					৩০.০০
চরপাতা ইউনিয়ন	১০.০০					
মোট	৭৭.৭৮	২.৭৮		৫.৫৫	১.৩৯	১২.৫০

উৎস : পূর্বোক্ত

সারণী ২ : ৮

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ নেতাদের স্থায়ীবাস

(১৯৯১)

শতকরা হারে

স্তর	শহর	গ্রাম	উত্তর পাওয়া যায়নি
কে ক প	৮৫.১৮	৭.৪১	৭.৪১
সাংগঠনিক সেক্রেটারি	৬৩.৬৪	৯.০৯	২৭.২৭
সংসদ সদস্য	৬০.০০	৩৫.০০	৫.০০
জেলা আমীর	৮১.২৫	১৮.৭৫	
চট্টগ্রাম উত্তর জেলা	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩
লক্ষ্মীপুর জেলা	৮.৩৩	৭৫.০০	১৬.৬৭
হাটহাজারী থানা (শহর)	৩৩.৩৩	৬৬.৬৭	
রায়পুর থানা	৮.৩৩	৬৬.৬৭	২৫.০০
দক্ষিণ পাহাড়তলী ইউনিয়ন		৭০.০০	৩০.০০
চরপাতা ইউনিয়ন	৮.৩৩	৯১.৬৭	
মোট	৪৫.৮৩	৪১.৬৭	১২.৫০

উৎস : পূর্বোক্ত

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র লোক সংগ্রহের উর্বর ক্ষেত্র বলে পরিচিত বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির'র একটি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ১৮ জন নেতা (সবাই সদস্য বা রুকন) থেকে আহরিত উপাত্ত অনুসারে এদের ৮৮.৮৯% গ্রামে এবং ১১.১১% শহরে জন্মগ্রহণ করলেও বর্তমানে ৬৬.৬৭% গ্রামে এবং ৩৩.৩৩% শহরে স্থায়ীভাবে বাস করেন। উক্ত শিবির নেতাদের পিতার শিক্ষাগত যোগ্যতা নিম্নরূপ : স্নাতক ১১.১১%, উচ্চ মাধ্যমিক ৫.৫৬%, মাধ্যমিক ৬১.১২%, কামিল ৫.৫৫%, ফাযিল ১১.১১%। ৫.৫৫%-এর কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই। ১১.১১% শিবির নেতার পিতার মাসিক আয় ১০ হাজার টাকার উর্ধ্বে। ৫-১০ হাজার টাকা আয় করেন ১৬.৬৭% জন। ৬১.১১%-এর আয় ২-৫ হাজার টাকা। ৫০% শিবির নেতার পিতা রাজনীতিতে জড়িত ছিলেন না। জামায়াত করতেন ২৭.৮০%। এ ছাড়া মুসলিম লীগ, বিএনপি, আওয়ামী লীগ ও অন্য একটি ইসলামী দলের প্রত্যেকটির সঙ্গে জড়িত ছিলেন ৫.৫৫% জন করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আগে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির নেতাদের ৭২.২২% স্কুল-কলেজ ও ২৭.৭৮% মাদরাসায় পড়তেন। উপরিউক্ত শিবির নেতাদের ৬১.১২% অন্য কোনো ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে কখনও যুক্ত ছিলেন না। অবশিষ্টদের মধ্যে আওয়ামী লীগপন্থি ছাত্রলীগ করতেন ৫.৫৫%। ৫.৫৫% বাসদ সমর্থক ছাত্রলীগ, ৫.৫৫% জাসদ সমর্থক ছাত্রলীগ ও ৫.৫৫% বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন করতেন।[২২৯]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র অধিকাংশ নেতা মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছেন। জামায়াতের রাজনীতিতে উপরিউক্ত শ্রেণির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হওয়া তাই স্বাভাবিক। স্কুল-কলেজ শিক্ষায় শিক্ষাধারীদের সংখ্যা জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র নেতৃত্বে তুলনামূলক বেশি হলেও মাদরাসা শিক্ষাধারীদের সংখ্যাও খুব কম নয়। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র অধিকাংশ নেতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র নেতাদের পিতার শিক্ষাগত যোগ্যতার যে চিত্র সারণী ২ : ৩-এ ফুটে উঠেছে, তাতে দেখা যায় যে, এদের অধিকাংশের শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই। শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন লোকদের মধ্যে মাদরাসা শিক্ষাধারীদের সংখ্যা বেশি। বাংলাদেশে শহরের তুলনায় গ্রামে ধার্মিক লোকের সংখ্যা বেশি দেখা যায়। আমাদের দেশের দরিদ্র, নিম্নমধ্যবিত্ত,

---

২২৯. ঐ

মধ্যবিত্ত ও পাশ্চাত্য শিক্ষাবিহীন লোকজন ধনী ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত লোকজন অপেক্ষা ধর্ম পালনে সাধারণত বেশি নিষ্ঠাবান হয়ে থাকেন। গ্রামের লোকজনের মধ্যে রক্ষণশীল মনোভাবও বেশি পরিলক্ষিত হয়। যে পরিবারের পরিচালক ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত, সে পরিবারের সদস্যরা সাধারণত ধর্ম পালনে বেশি যত্নবান হন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতদের চেয়ে মাদরাসা শিক্ষা গ্রহণকারী লোকজন সাধারণত বেশি ধার্মিক হয়ে থাকেন। এসব কারণে উপরিউক্ত পরিবেশের লোকজন ধর্মীয় আদর্শানুযায়ী রাজনীতিতে তুলনামূলক বেশি আগ্রহী হওয়াই স্বাভাবিক। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র নেতৃত্বের সামাজিক পটভূমি বিশ্লেষণ উপরিউক্ত ধারণাকে আরও স্পষ্ট করেছে।

এ সন্দর্ভের উপক্রমণিকায় বলা হয়েছে যে, রাজনৈতিক উন্নয়নের ৫টি প্রপঞ্চকে সামনে রেখে বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নে জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্ব, সংগঠন ও আদর্শের ভূমিকা পর্যালোচনা করা হবে। নিম্নে বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নে জামায়াত নেতৃত্বের ভূমিকা আলোচনা করা হলো।

জামায়াতে ইসলামীর আবেদন বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যেই প্রধানত সীমিত। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৮৬.০৬% মুসলমান, ১২.০১% হিন্দু, ০.০৬% বৌদ্ধ ও ০.০৩% হচ্ছে খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী।[২৩০] ১৯৮১ সালের জরিপ অনুসারে বাংলাদেশে ৪,৬০,২৭০ জন উপজাতীয় বাস করেন। এখানকার উপজাতীয়রা ১২টিরও অধিক গোত্রে বিভক্ত। বাংলাদেশের সমতল অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে নানা দিক দিয়ে এসব উপজাতীয়দের ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে।[২৩১] উপজাতীয়সহ বাংলাদেশের অমুসলিম জনগণকে জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতিতে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা চলছে। অমুসলিমদেরকে জামায়াতের রাজনীতির সঙ্গে কীভাবে আরও বেশি সম্পৃক্ত করা যায়, তা নিয়ে জামায়াতের নেতাগণ চিন্তা-ভাবনা করছেন।

সরকারপ্রধানরূপে একজন মহিলার অধিষ্ঠানে সহযোগিতা দান, সংসদে (১৯৯১) মহিলা সদস্যা প্রেরণ ইত্যাদি মহিলা নেতৃত্ব সম্পর্কে জামায়াতে

---

২৩০. দেখুন, *Statistical Year Book of Bangladesh 1990* (Dhaka, Bangladesh Bureau of Statistics, 1990). p. 57

২৩১. এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত ধারণার জন্য দেখুন, Rafuqul Islam Chowdhury *et. al.*, *Tribal Leadership and Political Integration: A Study of Chakma and Mong Tribes of Chittagong Hill Tracts* (Mimeograph) (Chittagong, Uniersity of Chittagong, 1979). pp. 3-4

ইসলামী বাংলাদেশ'র ধারণা নমনীয় হওয়ার আভাস দিচ্ছে। এখানে উল্লেখ্য যে, জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মওদূদী ও তৎকালীন জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান ১৯৬৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সম্মিলিত বিরোধী দলের প্রার্থী ফাতেমা জিন্নাহকে সমর্থন দিয়েছিলেন।

রাজনীতি উদাসীন ধর্মনিষ্ঠ মুসলমানদের (বিশেষত আলিম সমাজ ও মাদরাসা শিক্ষার্থী) রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে উৎসাহী করার জন্য জামায়াত নেতৃত্ব নানাভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এ কাজে ইত্তেহাদুল উম্মাহ বাংলাদেশ, বাংলাদেশ মসজিদ মিশন, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন প্রভৃতি সহযোগী সংগঠনকে জামায়াত ব্যবহার করে থাকে। জামায়াতের সহযোগী ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ও জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়া মাদরাসা ছাত্র-ছাত্রীদের এক উল্লেখযোগ্য অংশকে রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণে উৎসাহী করে তুলতে সক্ষম হয়েছে। ধর্মপরায়ণ রাজনীতিবিমুখ মুসলিম মহিলাদেরও রাজনীতিতে উৎসাহী করতে জামায়াতে ইসলামী চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

জামায়াতে ইসলামীর মতে, নেতৃত্বকে অবশ্যই জনসম্মতির ওপর নির্ভরশীল হতে হবে। এ কারণে আত্মপ্রকাশের পর থেকে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত প্রায় সকল নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করেছে। নির্বাচনের মাধ্যমেই জামায়াতে ইসলামী রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব লাভ করতে চায়। তাই বলা যায় যে, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বকে বৈধ ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার নীতিতে বিশ্বাসী। তবে এক্ষেত্রে এ কথাও স্মরণীয় যে, ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী একটি রাজনৈতিক দল বিধায় নেতৃত্ব, নির্বাচন, জনসম্মতি বৈধতা ইত্যাদি সম্পর্কে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে (আদর্শ বিষয়ক অধ্যায়ে উপরিউক্ত বিষয়াবলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে)।

এ গ্রন্থের উপক্রমণিকায় রাজনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত আলোচনায় বলা হয়েছে যে, ইসলাম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যাপক উন্নয়ন ও ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের জাগতিক সুযোগ-সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করতে চায়। জামায়াতে ইসলামীর মতে, ইসলামী আদর্শানুসারী সৎ নেতৃত্ব ও সৎ কর্মীবাহিনী বাংলাদেশের জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষত দরিদ্র জনগণের মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণে যথার্থ ভূমিকা পালন করতে পারে। সৎ নেতৃত্ব ও সৎ

কর্মীবাহিনী তৈরির জন্য জামায়াতে ইসলামী শিক্ষা, নৈতিকতা, খোদাভীরুতা ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব দেয়। জামায়াতে ইসলামীর মতে, নেতৃত্ব সৎ না হলে ব্যাপক সামষ্টিক কল্যাণ অর্জন সম্ভব নয়। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এখনও বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হতে সক্ষম হয়নি। জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র নেতৃত্বের সাফল্য নির্ধারণ ও মূল্যায়ন তাই এখনও সম্ভব নয়। তবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বাইরে অবস্থান করেও জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্ব জনগণের বিশেষত দেশের দরিদ্র জনগণের অর্থনৈতিক কল্যাণের জন্য বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে।

এ অধ্যায়ের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, নেতৃত্ব সম্পর্কিত পাশ্চাত্য ধারণা কোনো বিশেষ রাজনৈতিক বা ধর্মীয় মতাদর্শ কেন্দ্রিক নয়। কোনো বিশেষ লক্ষ্যাভিসারী কর্মকাণ্ডে জনগণকে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত বা প্রভাবিতকরণ কার্যক্রমকে পাশ্চাত্য ধারণায় নেতৃত্ব বলা হয়। এসব কার্যাবলিতে পারঙ্গম ব্যক্তিই নেতৃত্বের পদে আসীন হতে সক্ষম হন। রাজনৈতিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য হয়। তত্ত্বগত ধারণা যা-ই হোক না কেন, কার্যত প্রায় সকল ধরনের শাসনব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় লোকই নানা কারণে নেতা বা শাসক হিসেবে আবির্ভূত হন। বিশেষ পরিস্থিতি বা সময় কোনো ব্যক্তির নেতৃত্ব লাভের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করলেও বর্তমানে ব্যক্তির ব্যক্তিগত যোগ্যতাই নেতৃত্ব লাভের ক্ষেত্রে মুখ্য নির্ণায়ক বলে বিবেচিত হয়। অন্তত তত্ত্বগতভাবে হলেও রাজনৈতিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে পুরুষ-মহিলার পার্থক্য স্বীকৃত হয় না। নেতৃত্ব লাভের জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলি সম্পর্কিত পাশ্চাত্য ধারণায় ধার্মিকতার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়নি। গণতান্ত্রিক আদর্শানুসারে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনের ভিত্তিতে যেকোনো ব্যক্তি নেতারূপে নির্বাচিত হতে পারেন। কিন্তু কর্তৃত্ববাদ, সর্বাত্মকবাদ ইত্যাদি ব্যবস্থায় নেতা নির্বাচনে অনুসারীদের ভূমিকা থাকে খুবই সীমিত। ভয়, স্বার্থ, আইন মানা ইত্যাদি কারণে মানুষ সাধারণত নেতৃত্ব মেনে চলে। জনসম্মতির ওপর নির্ভরশীল আইনানুগ নেতৃত্বই বর্তমানে বৈধ নেতৃত্ব বলে বিবেচিত হয়।

ইসলাম নেতৃত্বের ওপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। ইসলামের মতে, ইসলাম অনুসারী নেতৃত্বের প্রতি অনুগত থাকাই কেবল মুসলমানদের জন্য বাধ্যতামূলক। হযরত মুহাম্মাদ সা. ও ইসলামের প্রথম চার খলিফা ইসলামী নেতৃত্বের মডেল হিসেবে বিবিচেত হন। মুসলমানদের নেতৃত্বকে নিষ্ঠাবান

ধার্মিক, পুরুষ, জ্ঞানী ইত্যাদি গুণাবলিসম্পন্ন হতে হয়। শূরা বা পরমর্শকদের সঙ্গে পরামর্শ করে মুসলমানদের নেতৃত্বকে শাসনকার্য পরিচালনা করতে হয়। ইসলামের এ নীতিকে এক ব্যক্তির শাসন ও জনগণের শাসনের মধ্যে একটি ভারসাম্যমূলক ব্যবস্থা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। কোনো কোনো মুসলিম পণ্ডিত সেকালের মজলিশে শূরার কার্যক্রমকে একালের আইনসভার কার্যক্রমের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ বলে মনে করেন। ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানকে নির্বাচিত হতে হয়। তবে নির্বাচনের কোনো সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ইসলাম নির্দেশ করেনি। ইসলামের প্রথম চার খলিফার নির্বাচন বা মনোনয়নকে সামনে রেখে নির্বাচন সম্পর্কিত ইসলামী ধারণাকে সংখ্যা ও যোগ্যতার মধ্যে সমন্বয় সাধন প্রচেষ্টাও বলা যায়। প্রথম চার খলিফার নির্বাচন বা মনোনয়ন প্রসঙ্গ উল্লেখ করে কোনো কোনো ইসলামী বিশেষজ্ঞ যে সমাজের জন্য যেরূপ নির্বাচন পদ্ধতি কল্যাণকর, সেরূপ নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণ ইসলামসম্মত বলে মত প্রকাশ করেছেন। ইসলাম নেতৃত্ব প্রার্থিতা অনুমোদন করে না। অব্যশ্য এ কথা সত্য যে, নেতা নির্বাচন, নেতার যোগ্যতা, নেতৃত্বের বৈধতা ইত্যাদি সম্পর্কিত ইসলামের ধারণা প্রথম চার খলিফার পরবর্তীকালে অনেক ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়নি।

নেতৃত্ব সম্পর্কিত উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, আধুনিক পাশ্চাত্য ধারণার সঙ্গে এ সম্পর্কিত ইসলামী ধারণার কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাদৃশ্য থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে।

জামায়াতের আন্দোলন ও সংগঠনে নেতৃত্বের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নেতৃত্বকে ইসলামী সমাজ, রাষ্ট্র ও সংগঠনের চালিকাশক্তি বলে জামায়াত মনে করে। কোনো সমাজের নেতৃবৃন্দ ইসলামকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ না করলে অথবা ইসলামী আদর্শানুসারী নেতৃত্ব ঐ সমাজে সৃষ্টি না হলে সে সমাজে ইসলাম বাস্তবায়িত হতে পারে না।

জামায়াতের মতে, ব্যক্তি বিশেষের ব্যক্তিগত ও ঈমানি যোগ্যতাই নেতৃত্ব লাভের মাপকাঠি হওয়া উচিত। সৎ নেতৃত্বের ওপর জামায়াত সবিশেষ গুরুত্বারোপ করে থাকে। রাজনৈতিক নেতৃত্ব জাতীয় জীবনের প্রায় সকল দিক নিয়ন্ত্রণ করে বলে জামায়াতের মতে রাজনৈতিক নেতৃত্বকে অবশ্যই সততার অধিকারী হতে হবে। সমাজের সকল স্তরকে অসৎ নেতৃত্ব মুক্ত করতে হবে। সমাজের নানা স্তরে সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য জামায়াতের নিজস্ব কর্মসূচি রয়েছে। মাওলানা মওদূদী ইসলামী রাষ্ট্রের নেতৃত্বের অত্যাবশ্যক যোগ্যতা ও

গুণাবলির বিবরণ দিয়েছেন। জামায়াতের গঠনতন্ত্রেও সৎ, ধর্মভীরু, ন্যায়পরায়ণ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানানো হয়েছে। উপরিউক্ত গুণাবলিসম্পন্ন নেতৃত্ব তৈরিতে জামায়াত প্রচেষ্টা চালাচ্ছে বলে দাবি করে। তবে এ কথা সম্ভবত সত্য যে, নেতৃত্বের জন্য যে যোগ্যতা, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, আদর্শবাদিতা, নিষ্ঠা, ধর্মভীরুতা ইত্যাদি জামায়াত কামনা করে, সেরূপ গুণাবলিসম্পন্ন নেতা-কর্মী তৈরিতে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র সাফল্য সম্পর্কে পূর্ণ নিশ্চিত হওয়া যায় না।

জামায়াত হযরত মুহাম্মাদ সা.-কে ইসলামী নেতৃত্বের সর্বোৎকৃষ্ট মডেল বলে বিবেচনা করে। নেতৃত্ব সম্পর্কিত উপরিউক্ত মডেল অনুসরণ করাই জামায়াতের লক্ষ্য বলে দাবি করা হয়। জামায়াতের মতে, কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা.-এর অনুসারী নেতৃত্বই বৈধ নেতৃত্ব এবং এ জাতীয় নেতৃত্ব অনুসরণ করতেই মুসলমানরা বাধ্য। জামায়াত তাই উত্তরাধিকার, নিছক ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও সম্মোহন শক্তির অধিকারী নেতৃত্বে বিশ্বাসী নয়।

মহিলা নেতৃত্বকে জামায়াতে ইসলামী ইসলামসম্মত মনে করে না। জামায়াতের মতে, রাজনীতি ও প্রশাসন পুরুষদের কর্মক্ষেত্র। এ কারণেই জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র গঠনতন্ত্রে মহিলা সদস্যাদের জন্য স্বতন্ত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারিত করা হয়েছে। জামায়াতের মহিলা বিভাগের মূল নেতৃত্বও জামায়াতের আমীরের হাতে কেন্দ্রীভূত। একান্তভাবে মহিলাদের কর্মক্ষেত্রে মহিলা নেতৃত্ব অনুমোদন করে জামায়াত। মহিলা নেতৃত্ব সম্পর্কিত জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র ধারণা বর্তমানে নমনীয় হওয়ার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। মহিলা নেতৃত্বাধীন বিএনপি'কে সরকার গঠনে সমর্থন দান (১৯৯১), জামায়াতে ইসলামীর মহিলা বিভাগের নেত্রীদের সংসদ সদস্য হওয়ার অনুমতি দান ইত্যাদি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

ইসলামী রাষ্ট্র একটি আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র বিধায় ইসলামী আদর্শে অবিশ্বাসীরা এ জাতীয় রাষ্ট্রের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হতে পারেন না বলে জামায়াত বিশ্বাস করে। তবে কুরআন ও হাদিসের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দিতে হয় না– এমন সকল দায়িত্বে অমুসলিমরা নিয়োগ লাভ করতে পারেন বলে জামায়াত নেতারা মত প্রকাশ করেছেন। এ কারণে অমুসলিমদের জামায়াতে ইসলামীতে সংগঠনের পূর্ণাঙ্গ সদস্যপদ দেওয়া হয় না। অমুসলিমরা জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র সহযোগী সদস্য হতে পারেন। এ জাতীয় সহযোগী সদস্য লাভের ক্ষেত্রে জামায়াতের সাফল্য খুব বেশি নয়।

জামায়াতের মতে, বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে, এ আন্দোলনের উপযোগী নেতা-কর্মী সৃষ্টি করা। ইসলামী আন্দোলনের উপযোগী যথার্থ নেতা-কর্মী তৈরি হলে এ আন্দোলনের সাফল্য আল্লাহ কীভাবে দেবেন– তা তাঁর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশে ইসলামী বিপ্লব সম্পন্ন করার জন্য জামায়াতে ইসলামী আদর্শবাদী নেতা-কর্মী সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে বলে দাবি করে।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র আন্দোলন ও সংগঠনের প্রধান পরিচালক, নিয়ন্ত্রক ও শৃঙ্খলা রক্ষাকারী হলেন আমীরে জামায়াত। তিনি জামায়াতের তহবিলেরও তত্ত্বাবধায়ক। নায়েবে আমীর, সেক্রেটারি জেনারেলসহ অন্যান্য নেতৃত্ব এবং অধস্তন (জেলা, থানা, ইউনিয়ন ইত্যাদি) আমীর নিয়োগ ও অপসারণের ক্ষমতা আমীরে জামায়াতের হাতে ন্যাস্ত। এঁরা সবাই আমীরে জামায়াতের প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। রুকন সম্মেলন ও কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার সিদ্ধান্তসমূহ কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ ও অন্যান্য অধস্তন নেতৃবর্গের সাহায্যে আমীরে জামায়াতই বাস্তবায়িত করেন, জামায়াতের দৈনন্দিন কাজকর্ম সম্পর্কিত সিদ্ধান্তসমূহ পরবর্তী কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা বৈঠকে অনুমোদন সাপেক্ষে কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি গ্রহণ করেন। জামায়াতের সদস্যপদ মঞ্জুর ও বাতিল করার চূড়ান্ত ক্ষমতাও আমীরের হাতে কেন্দ্রীভূত। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, জামায়াতের রাজনীতিতে আমীরে জামায়াত ব্যাপক ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী।

জামায়াতের নেতৃত্ব প্রার্থিতা ইসলামসম্মত কাজ নয়। নিজেদের জন্য সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব বেছে নেওয়া মুসলিম জনগণের দায়িত্ব। তবে ব্যাপক মুসলিম জনগণের পক্ষে সৎ ও যোগ্য নেতা বেছে নেওয়া সুসাধ্য নয় বলে ইসলামী সংগঠন নেতা নির্বাচনে প্রার্থী দিতে পারে। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র আমীর নির্বাচনে কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা তিনজন সদস্যের একটি প্যানেল সদস্যদের সম্মুখে উপস্থাপন করে। অবশ্য সদস্যরা ইচ্ছে করলে উক্ত প্যানেল বহির্ভূত সদস্যকেও আমীর পদে ভোট দিতে পারেন। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ সংসদ নির্বাচনসহ অন্যান্য নির্বাচনেও প্রার্থী দেয়।

জামায়াতের সদস্যগণ প্রত্যক্ষ ও গোপন ভোটে আমীরে জামায়াতকে নির্বাচিত করেন। সদস্যরা আমীরে জামায়াতকে তাঁর পদ থেকে অপসারণেরও চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। তবে আমীরে জামায়াত অপসারণের পদ্ধতি এতই জটিল যে, একজন নির্বাচিত আমীরকে তাঁর পদ থেকে অপরসারণ প্রায় অসম্ভব।

রুকন বা সদস্যরাই জামায়াতে ইসলামীর আন্দোলন ও সংগঠনের প্রাণ বলে বিবেচেত হন। তবে কেবল পুরুষ সদস্যরাই জামায়াতের বিভিন্ন স্তরের নেতা নির্বাচিত ও মনোনীত হতে পারেন। নেতা নির্বাচনে ভোট দানের ক্ষমতাও কেবল সদস্যদের রয়েছে। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র ক্যাডার ব্যবস্থার চারটি ধাপের সর্বোচ্চ ধাপে সদস্যদের অবস্থান। কোনো ব্যক্তির পক্ষেই প্রথমোক্ত তিনটি ধাপ অতিক্রম ব্যতীত সরাসরি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র সদস্যপদ লাভ সম্ভব হয় না। জামায়াতে ইসলামীর সদস্যদের ইসলামী সংগঠনের কাজে তাঁদের সকল শক্তি ও শ্রম ব্যয় করার শপথ নিতে হয়। জামায়াত সদস্যদের ইসলামী জীবনপদ্ধতি অনুসরণ করে জীবন পরিচালনা করতে হয়। সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হয়। সংগঠন কর্তৃক অর্পিত যেকোনো দায়িত্ব পালনে সদস্যদের প্রস্তুত থাকতে হয়।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র নেতৃত্বে মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোকজনের সুস্পষ্ট প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। এ সংগঠনের নেতৃত্বে আধুনিক শিক্ষা এবং ধর্মীয় শিক্ষাধারীদের সমন্বয় পরিলক্ষিত হলেও আধুনিক শিক্ষাধারী নেতৃত্বের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। জামায়াতের নেতৃত্বে মধ্য বয়সি (৪০-৫০ বছর) লোকজন বেশি আসীন রয়েছেন। শিক্ষিত উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের সঙ্গে চাকুরি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা লাভের প্রতিযোগিতায় পেরে না ওঠার কারণে বাংলাদেশের শিক্ষিত নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ চরম আদর্শবাদী সংগঠনের দিকে আকৃষ্ট হয়ে উঠেছেন বলে মত প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশের এ জাতীয় সংগঠনসমূহের মধ্যে (কমিউনিস্ট পার্টিসহ) জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ সবচেয়ে শক্তিশালী ও সুসংগঠিত বলে উপরিউক্ত বিক্ষুব্ধ লোকজন এ সংগঠনের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের শহুরে সমাজের তুলনায় গ্রামীণ সমাজ কম গতিশীল। গ্রামীণ মানুষ ধর্মীয় মূল্যবোধ দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়ে থাকেন। এ কারণে শহরের তুলনায় গ্রামের মানুষের নিকট জামায়াতে ইসলামী বেশি গ্রহণীয় হয়েছে বলে ধারণা করা যায়। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র নেতৃত্বের সামাজিক পটভূমি বিশ্লেষণও এটি প্রমাণে সহায়ক হয়েছে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নে জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্ব ভূমিকা পালন করছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাজনৈতিক উন্নয়ন প্রশ্নে পাশ্চাত্য সমাজচিন্তকদের ধারণার সঙ্গে ইসলামী চিন্তাবিদ ও জামায়াতে ইসলামীর নেতাদের ধারণার পার্থক্য রয়েছে। জামায়াতের মতে, ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী

পুরুষরাই কেবল ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের নেতৃত্ব পদ লাভ করতে পারেন। এ কারণে দেশের সমগ্র জনগণের মধ্যে একাত্মতা ও সংহতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জামায়াতের ভূমিকা প্রশ্নাতীত নয়। এ প্রসঙ্গে জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্য হচ্ছে, বাংলাদেশের ৮৬.০৬% মানুষ ইসলাম ধর্মাবলম্বী। সংখ্যাগুরু মুসলিম অধিবাসীরা যদি ইসলামী আদর্শ গ্রহণ করেন, তাহলে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত মেনে নেওয়ার গণতান্ত্রিক নীতি অনুসারে নেতৃত্ব সম্পর্কিত জামায়াতে ইসলামীর ধারণা অমুসলিদের নিকটও অগ্রহণীয় হওয়া সংগত হবে না। বর্তমানে মহিলা ও অমুসলিমদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ এবং নেতৃত্ব লাভ সম্পর্কিত জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র পূর্বতন ধারণায় পরিবর্তন সূচিত হওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যে একাত্মতা ও সংহতি বর্ধনে জামায়াতের নেতৃত্ব প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। সাধারণভাবে রাজনীতিতে উদাসীন মাদরাসা শিক্ষাধারী উলামা ও গ্রামীণ ধর্মভীরু মানুষকে রাজনীতিতে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র নেতৃত্বের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। জামায়াতের মতে, নেতৃত্ব বা শাসকদের জনসম্মতির ওপর নির্ভরশীল হতে হবে। জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত ইসলামী আদর্শানুসারী নেতৃত্বকেই জামায়াত বৈধ নেতৃত্ব বলে মনে করে।

জনগণের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র বিভিন্ন কর্মসূচি রয়েছে। জামায়াতের মতে– সৎ, যোগ্য ও খোদাভীরু নেতৃত্বের পক্ষে জনগণের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে যথার্থ ভূমিকা পালন করা সম্ভব। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এখনও পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হতে পারেনি। তাই জনগণের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বের সাফল্য-ব্যর্থতা নিরূপণ এখনও পুরোপুরিভাবে সম্ভব নয়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, নেতৃত্বের বিভিন্ন দিক সম্পর্কিত ইসলামী ধারণার সঙ্গে জামায়াত ধারণার অধিকতর সাদৃশ্য থাকলেও নেতৃত্ব লাভের যোগ্যতা, নেতার গুণাবলি, নেতৃত্ব প্রার্থিতা, নেতৃত্বের বৈধতা ইত্যাদি প্রশ্নে আধুনিক গণতান্ত্রিক ধারণার সঙ্গে জামায়াতে ইসলামীর তত্ত্বগত ধারণার পার্থক্য রয়েছে। মহিলা নেতৃত্ব সম্পর্কিত জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র তত্ত্বগত ধারণায় পরিবর্তন না এলেও এ বিষয়ে বাস্তবতার বিরোধিতা না করার মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠছে। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র সংগঠনেও

মহিলাদের ভূমিকা ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তত্ত্বগত ধারণা যাই হোক না কেন বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব নির্বাচনের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জামায়াতে ইসলামী অংশ নিচ্ছে। এভাবে দেখা যায় যে, নেতৃত্ব বিষয়ক ইসলামের তত্ত্বগত ধারণার সঙ্গে সংগতি রেখে বাস্তবতার সঙ্গে যথাসম্ভব খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

*****

তৃতীয় অধ্যায়

জামায়াত সংগঠন

একজন মানুষের পক্ষে একা যে কাজ করা সম্ভব হয় না, সংগঠনের মাধ্যমে সে কাজ একাধিকজনের সাহায্যে সম্পন্ন করা হয়। প্রাচীনকাল থেকে সংগঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের কাজ সম্পন্ন হতে দেখা যায়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের তুলনায় আধুনিক সমাজ অনেক জটিল বলে বর্তমানের সংগঠনও পূর্বের তুলনায় জটিল হয়ে পড়েছে। আধুনিক সংগঠন পূর্বের সংগঠনের তুলনায় অনেক বেশি দক্ষ ও প্রভাবশালী। সংগঠন ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্যও আধুনিক সমাজ পূর্বের সমাজের তুলনায় বেশি উপযোগী।[২৩২]

এ গ্রন্থের উক্রমণিকায় সংগঠন বিশেষত রাজনৈতিক সংগঠন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

সংগঠন : আধুনিক ধারণা

সংগঠন হচ্ছে ব্যক্তিগত সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রমণের জন্য মানুষের মধ্যকার সামর্থ্য ও উদ্যোগের ঐক্য।[২৩৩] কার্টরাইটের মতে– সংগঠন হচ্ছে পরস্পর নির্ভরশীল অনেকগুলো শাখার সমষ্টি, মূল লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে সমগ্রের (Whole) অংশ হিসেবে যে শাখাগুলোর প্রত্যেকটির একটি বিশেষ

---

২৩২. Amital Eizioni, *Modern Organizations* (New Dethi, Prentice Hall of Inia Pvt .Ltd., 1972). pp. 1-2

২৩৩. আবু তাহের খান, 'সংগঠন তত্ত্বে চিন্তার বিবর্তন ও তার প্রয়োগিক বিশ্লেষণ', *বাংলা একাডেমি পত্রিকা*, ঢাকা, কার্তিক-পৌষ সংখ্যা, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৮

দায়িত রয়েছে।[২৩৪] আধুনিক সংগঠনসমূহের মধ্যে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সংগঠনই রাজনৈতিক দলের নেতা নির্বাচন, নেতা ও সদস্যদের কার্যাবলি, ক্ষমতা ইত্যাদি নির্ধারণ করে।[২৩৫] এল্ডারসবেলের মতে– নেতা-নিয়োগ, নীতি নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নেতা ও জনগণের মধ্যে সংযোগ রক্ষা, জনসচেনতা বৃদ্ধি, সমাজের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-সংঘাত দূরীকরণ ইত্যাদি একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের মূল কাজ বলে বিবেচিত হতে পারে।[২৩৬] সরকার গঠনের ন্যায়বিরোধী দল হিসেবে ভূমিকা পালন করেও রাজনৈতিক দল দেশ গঠনে সহায়ক হয়। স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব, সরকারকে প্রকৃত ঘটনা ও তথ্য জানানো, সরকারের সমালোচনা, সরকারের কর্মসূচির বিকল্প কর্মসূচি প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে বিরোধী রাজনৈতিক দল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিকাশে সাহায্য করে।[২৩৭] একটি দেশের জনগণের মধ্যে একাত্মতা ও সংহতির পরিবেশ সৃষ্টিতেও রাজনৈতিক দলের ভূমিকা রয়েছে।[২৩৮] আধুনিক যুগের রাজনৈতিক কার্যক্রম প্রধানত রাজনৈতিক দল দ্বারাই পরিচালিত হয়। আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যক্রম পরিচালনায় ও রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ডুভারজারের মতে, সারা দেশে বিস্তৃত অনেকগুলো ছোটো ছোটো গোষ্ঠীর সম্মিলনের ফলে রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠে। কার্যক্রম, সদস্য সংখ্যা ও গুণগত পার্থক্যের ভিত্তিতে এ গোষ্ঠীগুলোকে তিনি ককাস (Caucus), ব্রাঞ্চ (Branch), সেল (Cell), মিলিশিয়া (Militia) ইত্যাদির নামে অভিহিত করেছেন। এবং তিনি এর ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলকে ক্যাডার পার্টি (ককাস), মাস পার্টি (ব্রাঞ্চ) ও ডিভোটি পার্টি (সেল ও মিলিশিয়া)– এ তিনভাগে ভাগ করেছেন।

---

২৩৪. Dorwin Cartwright, 'Influence, Leadership, Control', in James G. March ed., *Handbook of Organizations* (Chieago, Rand Menally and Co., 1972). p. 1

২৩৫. Maurice Duverger, *Political Parties: Their Organizations and Activites in the Modern State* (London, Methuen and Co. Ltd., 1967). p. 4

২৩৬. Samuel J. Eldersveld, *Political Parties. op. cit.*, p. 22

২৩৭. David E. Apter, *Some Conceptual Approaches to the Study of Modernization* (New Jersey, Prentice Hall, Englewood Citffs, 1968). p. 87

২৩৮. Sigmund Neumann, 'Toward a Comparative Studey of Political Parties' in Harty Eckstein and David E. Apter, eds., *Comparative Politics: A Reader* (New York, The Free Press, 1963). pp. 352-54

গণ ভোটাধিকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্বে ইংল্যান্ডে ক্যাডার পার্টির (বর্তমান রক্ষণশীল দল) আবির্ভাব ঘটে। সমাজের উচ্চস্তরের লোকদের নিয়ন্ত্রণাধীন এ দলকে পরবর্তীকালে দলের স্বার্থে নানা স্তরে সংগঠন বিস্তৃত করতে হলেও নেতৃত্ব ওপরের স্তরের লোকদের হাতেই রয়ে যায়। ব্যাপক ভোটাধিকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর গণ রাজনৈতিক দল হিসেবে শ্রমিক দল আবির্ভূত হয়। ক্ষমতা ও সমর্থন বৃদ্ধির জন্য এ দলকেও সমাজের উচ্চস্তরসহ নানা স্তরে সংগঠন বিস্তৃত করতে হয়। দলের নিয়ন্ত্রণ অবশ্য প্রধানত নিম্নস্তরের লোকদের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক মর্যাদা, সম্পর্ক, নির্বাচনে জয়লাভের ক্ষেত্রে দক্ষতা, ধন-সম্পদ ইত্যাদিতে বলীয়ান ব্যক্তিবর্গই ক্যাডার পার্টিতে গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে বিবেচিত হন। এ জাতীয় দলে যোগ্যতাকে সংখ্যার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। অন্যদিকে গণ রাজনৈতিক দলে সংখ্যার গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে বেশি হয়ে থাকে।[২৩৯]

পেশাগত কারণে সেল সদস্যরা একই স্থানে অবস্থান করে বলে পারস্পরিক নৈকট্য অনুভব করেন। মিলিশিয়া সদস্যদের বেসামরিক বাহিনীর সঙ্গে তুলনা করা যায়। সেল ও মিলিশিয়া ভিত্তিক ডিভোটি পার্টি এ কারণে ক্যাডার ও মাস পার্টি অপেক্ষা সুশৃঙ্খল ও নিয়মানুবর্তী হয়।[২৪০] ডিভোর্টি পার্টি সাধারণত চরম রাজনৈতিক মতাদর্শানুসারী হয়ে থাকে। এফ. ডব্লিউ. রিগস রাজনৈতিক দলকে নেতাকেন্দ্রিক, সক্রিয় কর্মীকেন্দ্রিক, সদস্যকেন্দ্রিক, নির্বাচনকেন্দ্রিক ইত্যাদি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেছেন।[২৪১] প্রতিনিধি নির্বাচনে রাজনৈতিক এলিটদের

---

২৩৯. Maurice Duverger, *op. cit.*, pp. 63-64

২৪০. Aaron B. Wildavsky, 'A Methodogical Critique of Durerger's Polities' in H. Eckstein and D. E. Apter eds., 1963. pp. 371.73

ক্যাডার শব্দের ভাষাগত অর্থ হচ্ছে কাঠামো। রাজনৈতিক দলের মূল কর্মীদের নিয়ে কাঠামো গঠিত হয়। আদর্শ ও নীতি বাস্তবায়নের জন্য রাজনৈতিক দল মূল কর্মীদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। মূল কর্মীরাই কার্যক্ষেত্রে দলের নেতৃস্থানীয় কর্মী। এঁদেরকে কেন্দ্র করেই পার্টির সাধারণ সদস্য ও অনুসারীরা সংগঠিত হয়। ক্যাডারগণই দলের প্রাণশক্তি বলে বিবেচিত হন। দেখুন, *রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিভাষা-কোষ*, ১ম খণ্ড (ঢাকা, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৭০), পৃ. ৪১। ক্যাডার পদবাচ্যটি বর্তমানে উপরিউক্ত অর্থেই প্রধানত ব্যবহৃত হয়।

২৪১. Fred W. Riggs, 'Comparative Politics and the Study of Political Parties: A Structural Approach' in William J. Crothy, *Approaches to the Study of Party Organization* (Bosion, Allyn and Bacon, Inc., 1968. p. 63

ভূমিকা বিবেচনায় এনে সেলিগম্যান রাজনৈতিক দলকে গণ-সমর্থন প্রত্যাশী বা গণবাদী (Populist), অনুদার (Sectarian) ও বহুত্ববাদী (Pluralist)-এ তিনভাগে বিভক্ত করেছেন। অনুদার রাজনৈতিক দল বিশেষ বিশেষ প্রশ্নে বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর নিকট আবেদন সৃষ্টি করতে আগ্রহী হয়। নির্বাচনে জয়লাভের চেয়ে আদর্শগত বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য এ জাতীয় সংগঠন বেশি চেষ্টা করে থাকে।[২৪২] নেইল এ. ম্যাকডোনাল্ড রাজনৈতিক দলকে মতবাদ-কেন্দ্রিক (Doctrine based) ও অমতবাদ-কেন্দ্রিক (Non-doctyrinal) এ দু'ভাগে ভাগ করেছেন। সমাজতন্ত্র, কমিউনিজম, ধর্ম ইত্যাদি মতাদর্শ ভিত্তিক রাজনৈতিক দলকে মতবাদ-কেন্দ্রিক রাজনৈতিক দল বলা যেতে পারে।[২৪৩]

রাজনৈতিক সংগঠন সামাজিক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন প্রকার আইন প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন করে সামাজিক পরিবর্তনে ভূমিকা পালন করে। সামাজিক পরিবর্তনের জন্য আন্দোলন সৃষ্টি করে বিরোধী দলও এক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করতে পারে। সামাজিক পরিবর্তন প্রশ্নে বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে মতবিরোধ ও দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে দ্বন্দ্বের চেয়ে সংগঠনে সংগঠনে দ্বন্দ্ব সমাজকে অনেক বেশি প্রভাবিত করে। এ জাতীয় দ্বন্দ্বের ফলে অনেক সময় সামাজিক পরিবর্তন দ্রুততর হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, সংগঠন বিশেষ সামাজিক পরিবর্তন প্রতিহত করার জন্যও কাজ করতে পারে।[২৪৪]

মিশেলস, ডুভারজার প্রমুখ রাজনৈতিক দল সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞগণ রাজনৈতিক দলের কার্যক্রমের তত্ত্বগত ধারণার সঙ্গে প্রয়োগের ব্যাপক পার্থক্যের কথা উল্লেখ করেছেন।[২৪৫] মিশেলসের মতে– তত্ত্বগত ধারণা যা-ই হোক না কেন, সংগঠন মাত্রই মুষ্টিমেয় লোকের কর্তৃত্বাধীন হয়ে পড়ে।[২৪৬]

---

২৪২. Lester G. Seligman, 'Elite Recruitment', *op. cit.*, p. 244

২৪৩. Neil A. McDonald, 'Party Perspectives: A Survey of Writings', in H. Eckstcin and D. E. Apter, eds., *op. cit.*, pp. 346-47

২৪৪. দেখুন, Richard II. Hall, *Organizations: Structure and Process* (New Jersey, Prentice Hall Inc., 1982). pp. 12.19

২৪৫. দেখুন, Joseph A. Schlesinger, *op. cit.*, pp. 765-767

২৪৬. দেখুন, Robert Michles, Political, *op.cit.*, pp. 15. 341

উন্নয়নশীল দেশসমূহের রাজনৈতিক উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের জন্য শক্তিশালী রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। শক্তিশালী সংগঠনের পৃষ্ঠপোষকতা ও সমর্থন ব্যতীত কোনো নেতার পক্ষেই এসব দেশের জটিল রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা সম্ভব হয় না। এমনকি সরকারের পক্ষেও সুসংগঠিত এবং শক্তিশালী সংগঠন ব্যতীত জনগণের জন্য কাজ করা দুরূহ হয়ে পড়ে।[২৪৭]

সংগঠন : ইসলামী ধারণা

মহান আল্লাহ ও তাঁর নবি হযরত মুহাম্মাদ সা. মুসলমানদের সংঘবদ্ধ হওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا ... ﴿١٠٣﴾

"তোমরা সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে (ইসলামকে) ধারণ করো।"[২৪৮]

হাদিসে আছে–

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْكُنَ بَحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ.

"যে ব্যক্তি জান্নাতে অবস্থানের আনন্দ উপভোগ করতে চায়, সে যেন সংগঠনকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে।"[২৪৯]

مَنْ مَاتَ وَهُوَ مُفَارِقٌ لِلجَمَاعَةِ. فَإِنَّهُ يَمُوتُ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.

"যে ব্যক্তি সাংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তার মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যু।[২৫০]

أَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ بِالْجَمَاعَةِ وَبِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ

---

২৪৭. Myron Weiner, *Party Building in a New Nation: The Indian National Congress* (Chicago, The University of Chicago Press, 1967). pp. 3-4

২৪৮. *আল কুরআন*, সূরা আলে ইমরান : ১০৩

২৪৯. আল হাদিস, উদ্ধৃত, আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা আত তিরমিযি, *জামে আত তিরমিযি*, ২য় খণ্ড (দিল্লি, আমিন কোম্পানি, তারিখ নেই), পৃ. ৩৯

২৫০. আল হাদিস, উদ্ধৃত, আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৮

الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى؟ قَالَ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ

"'আমি তোমাদের পাঁচটি বিষয়ে নির্দেশ দিচ্ছি; আল্লাহই আমাকে এগুলো সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেন। এগুলো হচ্ছে– সংগঠন, নেতার নির্দেশ শ্রবণ, নেতার নির্দেশ পালন, হিজরত ও আল্লাহর পথে জিহাদে অংশগ্রহণ। যে লোক ইসলামী সংগঠন ত্যাগ করে এক বিঘৎ পরিমাণ দূরে সরে যায়, পুনরায় সংগঠনে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত সে তার গলদেশ থেকে ইসলামের রজ্জু খুলে ফেলে। আর যে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের দিকে আহ্বান জানায় সে জাহান্নামি।' সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, ওই ব্যক্তি যদি সালাত কায়েম ও রোজা পালন করে তবুও কি সে জাহান্নামি?' রাসূল সা. বললেন, 'যদি ওই ব্যক্তি সালাত কায়েম করে, রোজা পালন করে এবং নিজেকে মুসলিম মনে করে, তবুও সে জাহান্নামি'।" [২৫১]

কুরআন ও হাদিসের উপরিউক্ত বাণীসমূহ থেকে বোঝা যায় যে, ইসলাম সংঘবদ্ধতা বা সংগঠনের ওপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। আবু ইয়ালা, মাওয়ারদি, ইবনে খালদুন, ইবনে তায়মিয়া, শাহ ওয়ালি উল্লাহ, ইকবালসহ বিভিন্ন ইসলামী চিন্তাবিদের রচনা থেকেও এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ইসলাম যে আদর্শের বাণী প্রচার করেছে, তা একটি মূল্যবোধ ও লক্ষ্য ভিত্তিক রাষ্ট্র বা সংগঠন ব্যতীত পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব নয়।[২৫২] স্মিথের মতে, হযরত মুহাম্মাদ সা. মদিনায় একটি ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করার পর এটি স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ইসলাম কেবল একটি ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস নয়; বরং ইসলাম রাষ্ট্র, সরকার, আইন ও প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠা করতে চায়।[২৫৩]

---

২৫১. আল হাদিস, উদ্ধৃত, আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবনে তিরমিযি, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৯

২৫২. এ সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে, M. Umar Chapra, 'The Islamic Welfare State and Its Role in the Economy' in Khurshid Almad and Zafar Ishaq Ansari eds., *op. cit.*, p. 195-96

২৫৩. D. E. Smith, 'The Political Implications of Asian Religions' in his ed., South Asian, *op cit.*, pp. 17-18

রাজনৈতিক দলব্যবস্থার প্রশ্নে ইসলামী চিন্তাবিদরা ঐকমত্য পোষণ করেন না।[২৫৪] দলব্যবস্থার বিরোধীরা ইসলামের আলাপ-আলোচনা ও সর্বজনসম্মত শাসননীতির কথা উল্লেখ করে এ ব্যবস্থার বিরোধিতা করেন।[২৫৫] দলব্যবস্থা অনুমোদনকারীদের বক্তব্য হচ্ছে, ইসলাম জামায়াত বা সংগঠিত জীবনযাপনকে বাধ্যতামূলক করেছে। নামাজ, জুমা, ঈদ, হজ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় দায়িত্ব পালনে মুসলমানদের জামায়াতবদ্ধ হতে হয়। মানবসমাজে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের জন্যও তাই মুসলমানদের সংগঠিত হতে হবে। হযরত মুহাম্মাদ সা. ইসলামী সংগঠনের নেতা ছিলেন। মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রাষ্ট্রীয় সংগঠনের বাইরে আলাদা কোনো সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা ইসলামের তৎকালীন নেতারা অনুভব করেননি। ইসলামী রাষ্ট্র বা খিলাফতই ছিল তখন ইসলামী সংগঠন। ইসলাম যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন থাকবে না, তখন ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মুসলমানদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালাতে হবে। আর তার জন্য অবশ্যই সংগঠনভুক্ত হওয়া জরুরি। তবে সাহাবাদের সময়ের মতো 'আল-জামায়াত' (যে সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্যই পালনীয় কর্তব্য) যেহেতু বর্তমানে নেই, তাই প্রত্যেক মুসলিম তাঁর বিবেচনায় যে ইসলামী সংগঠনটি উৎকৃষ্ট, তাতে যোগদান করবেন। কেউ যদি মনে করেন যে, তাঁর যোগদান উপযোগী ত্রুটিহীন কোনো ইসলামী সংগঠন নেই, তাহলে তাঁকেই একটি ত্রুটিহীন সংগঠন গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে।[২৫৬] তবে কোন সংগঠনটি সাহাবাদের সংগঠনের বেশি অনুসারী– তা নির্ধারণের যেহেতু অকাট্য কোনো পথ নেই, তাই একাধিক ইসলামী দল বা সংগঠন একই সমাজে বা দেশে কাজ করতে পারে।

সংগঠন : জামায়াতের ধারণা

মাওলানা মওদূদীর মতে, সত্যিকার ইসলামী জীবনকে অবশ্যই জামায়াতের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে হবে।[২৫৭] কুরআনে মুসলমানদের সম্পর্কে 'হিযব' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'হিযব' শব্দের অর্থ পার্টি বা দল। দল গঠিত হয় আদর্শ,

---

২৫৪. Nu'man Ahmad Al-Khatib, '*Islamic Thought and Political parties*' in *Islam Today*, April, 1986. p. 12

২৫৫. C. A. Leeds, *op. cit.*, p. 128

২৫৬. মোহাম্মদ ওমর ফারুক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০১-১০২

২৫৭. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *রাসায়েল ও মাসায়েল*, ১ম খণ্ড (ঢাকা, মওদূদী রিসার্চ একাডেমি, ১৯৮১), পৃ. ২৫৮-৫৯

নীতি ও মতবাদের ওপর ভিত্তি করে। এজন্য মুসলমানগণ মূলত একটি জাতি শুধু নয়; একটি দলও।[২৫৮] যে সংস্থা আন্দোলন বা বিপ্লব পরিচালনার জন্য জনশক্তি সংগ্রহ করে, সংগৃহীত জনশক্তিকে কাজে লাগায়, উদ্যোগ গ্রহণ এবং ঝুঁকি মোকাবিলা করে, সে সংস্থাকে সংগঠন নামে অভিহিত করা হয়।[২৫৯] আর ইকামতে দ্বীনের জন্য যে সংগঠন কাজ করে, সে সংগঠন হচ্ছে ইসলামী সংগঠন।[২৬০] ইসলামী সংগঠনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে– রাসূল সা.-এর অনুসৃত পন্থায় আল্লাহ্প্রদত্ত জীবনবিধান ইসলাম বাস্তবায়ন করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।[২৬১]

বলা হয়, ইসলাম পৃথিবীতে এসেছে আন্দোলনের আকারে– সংগঠনের মাধ্যমে। হযরত মুহাম্মাদ সা. আল্লাহর নির্দেশে ইসলামী সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। হযরতের জীবনকালে ওহির মাধ্যমে আল্লাহ্ এ সংগঠন পরিচালনা করেছেন। ইসলামী সংগঠনকে 'হিযবুল্লাহ' বা আল্লাহর দল বলেও সম্বোধন করা হয়েছে। হযরত মুহাম্মাদ সা. ও চার খলিফার নেতৃত্বাধীন ইসলামী সংগঠন কর্তৃক তৎকালীন মুসলিম বিশ্বে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ সময় ইসলামী সংগঠন ও রাষ্ট্রীয় শক্তি একসঙ্গে চলে। ইয়াজিদের শাসনামল থেকে ইসলামী সংগঠনের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়।[২৬২] হযরত মুহাম্মাদ সা. প্রতিষ্ঠিত ইসলামী জামায়াতই ইসলামী সংগঠনের প্রকৃত মডেল। ইসলামী সংগঠনের পরবর্তী মডেল হচ্ছে খুলাফায়ে রাশিদিন পরিচালিত ইসলামী জামায়াত। উপরিউক্ত মডেল দুটি ব্যতীত ইসলামী সংগঠনের আর কোনো মডেল নেই।[২৬৩]

মাওলানা মওদূদীর মতে, ঈমানদার ও দক্ষ ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত কোনো সংগঠনের যদি বিশ্ব পরিচালনার যোগ্যতা থাকে, তবে আল্লাহ্ নিশ্চয় ঈমানহীনদের হাতে বিশ্ব নেতৃত্ব সমর্পিত রাখবেন না। তাই ঈমানদার, সালেহ

---

২৫৮. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ* (ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮৬), পৃ. ১০২

২৫৯. অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী, *ইসলামী বিপ্লব*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫

২৬০. এ. কে. এম. নাজির আহমদ, *ইসলামী সংগঠন* (ঢাকা, লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৮৮), পৃ. ৫

২৬১. ঐ, পৃ. ১০

২৬২. অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০-২৫

২৬৩. মতিউর রহমান নিজামী, *ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৪-৫৫।

ও রাষ্ট্র পরিচালনায় দক্ষ লোকদের সমন্বয়ে একটি দল বা সংগঠন গড়ে তুলতে হবে।[২৬৪] উপরিউক্ত লক্ষ্যেই মাওলানা মওদূদী জামায়াতকে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন বলে দাবি করা হয়। জামায়াতকে শিক্ষিত ও যোগ্য মুসলমানদের সংগঠনে পরিণত করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য।

ইসলামী সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত হওয়া মুসলমানদের অবশ্য পালনীয় ধর্মীয় কর্তব্য বলে জামায়াত মনে করে। গোলাম আযমের মতে–

> আল্লাহর দ্বীন কবুল করলে রাসূলের জামায়াতে শামিল হওয়া ফরজ। রাসূল সা. নিজে যদ্দিন... এ জামায়াতের নেতৃত্ব দিয়েছেন, তদ্দিন তাঁর জামায়াতে শামিল না হলে কেউ মুসলিম হিসেবেই গণ্য হতো না। অর্থাৎ, নবির জামায়াতের বাইরে ইসলাম নেই।[২৬৫]

এ সম্পর্কে মাওলানা নিজামীর অভিমত–

> জাহেলিয়াতের মৃত্যু থেকে বাঁচার জন্য, ঈমানের দাবি পূরণের জন্য এটাই (ইসলামী সংগঠন) অবলম্বন। এটাই ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার বিকল্প এবং রাসূল সা. প্রতিষ্ঠিত ও খুলাফায়ে রাশেদা পরিচালিত জামায়াতের উত্তরসূরি হিসেবে তাঁর প্রতিনিধিত্বের মর্যাদার অধিকারী।[২৬৬]

উপরিউক্ত উদ্ধৃতি দুটি দ্বারা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, জামায়াতে ইসলামীর নেতাদের মতে, ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলমানদের অবশ্যই ইসলামী সংগঠনভুক্ত হতে হবে।

ইসলামী সংগঠন ত্যাগকে জামায়াত অপরাধ বিবেচনা করে। অধ্যাপক গোলাম আযমের ভাষায়–

> ইসলামী জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ব্যাপারটা অত্যন্ত জটিল ও কঠিন।... ইমাম যদি ফাসেকও হয়, তবুও তার পেছনে নামাজ আদায় করতে হয়। জামায়াত ত্যাগ করে একা নামাজ আদায় করার অনুমতি শরিয়ত দেয়নি। ফাসেক ইমামকে বদলানোর নিয়মতান্ত্রিক চেষ্টার অনুমতি অবশ্যই আছে, কিন্তু জামায়াত ত্যাগের অনুমতি নেই। সুতরাং সংগঠনের সিদ্ধান্তের সাথে একমত না হওয়ার অজুহাতে বা কোনো ইস্যুতে নিজের

---

২৬৪. আবুল আ'লা মওদূদী, *ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪-১৫

২৬৫. গোলাম আযম, *ইসলামী আন্দোলন : সাফল্য ও বিভ্রান্তি*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩-১৪

২৬৬. মতিউর রহমান নিজামী, *ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৬

> মতামত সংগঠনকে গ্রহণ করাতে অক্ষম হয়ে বা অন্য কোনো প্রকার অসন্তোষের কারণে সংগঠন ত্যাগ করা শরিয়তের দৃষ্টিতে একেবারেই অন্যায়। সংগঠনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টির চেষ্টা করা রীতিমতো বাগাওয়াত বা বিদ্রোহ এবং 'ফাসাদ ফিল আরদ' বা শৃঙ্খলা বিনষ্ট করার অপরাধ।[২৬৭]

গোলাম আযমের মতে, ইকামতে দ্বীনের উদ্দেশ্যে ইসলামী সংগঠনে যোগ দেওয়ার পর এ কাজে আরো অগ্রণী ও উন্নত কোনো সংগঠন পাওয়া গেলেই কেবল পূর্বোক্ত সংগঠন ত্যাগ করা জায়েজ। বাংলাদেশে ইকামতে দ্বীনের কাজে নিয়োজিত সংগঠনগুলোর মধ্যে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ সবচেয়ে উন্নত ও সুসংগঠিত। আজ পর্যন্ত এ সংগঠনে বিভক্তি আসেনি। দুয়েকজন লোক ব্যতীত কেউ এ সংগঠন ত্যাগ করেনি।[২৬৮] মাওলানা আব্দুল আউয়ালের মতে, জামায়াত ধর্মীয় অনুভূতি ব্যবহার করে মুসলমানদেরকে তার সংগঠনের দিকে আকৃষ্ট করে। কোনো ব্যক্তিকে একবার জামায়াতের সদস্য করা সম্ভব হলে সে ব্যক্তির পক্ষে আর এ সংগঠন ত্যাগ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।[২৬৯] গোলাম আযম তাঁর 'ইকামতে দ্বীনের সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পরিণাম' শীর্ষক পুস্তিকায় জামায়াতে ইসলামীকে বাংলাদেশের একমাত্র ইসলামী আন্দোলন, তাই জামায়াতে যোগদান করা ফরজ এবং জামায়াতে ইসলামী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া মানে ইকামতে দ্বীন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া প্রমাণ করার চেষ্টা করেছন বলে অভিযোগ করা হয়।[২৭০]

জামায়াত নিজেকে একটি গণতান্ত্রিক সংগঠন বলে দাবি করে। এ সংগঠনের নেতা ও কর্মীগণ সাংগঠনিক পরিমণ্ডলে জামায়াতের কর্মসূচি, কর্মপদ্ধতি, নেতা ও কর্মীদের আচার-আচরণ ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা-সমালোচনা করতে পারেন। জামায়াতের কোনো নেতাকেই সমালোচনার ঊর্ধ্বে মনে করা হয় না বলে দাবি করা হয়। জামায়াতের সকল কর্মসূচি ও কর্মপদ্ধতি আলাপ-

---

২৬৭. গোলাম আযম, *ইসলামী আন্দোলন : সাফল্য ও বিভ্রান্তি*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১

২৬৮. ঐ, পৃ. ১৯-২০

২৬৯. মাওলানা আবদুল আউয়াল, *জামায়াতের আসল*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৪

২৭০. দেখুন, *কেন্দ্রীয় নন কো-অপারেশন সমন্বয় কমিটি*, ইসলামী ছাত্রশিবির কর্তৃক রচিত ও প্রকাশিত, *সংকটের ঘূর্ণাবর্তে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির* (প্রকাশের স্থান ও তারিখ নেই), পৃ. ৫২-৫৩। আরও দেখুন, গোলাম আযম, *ইকামতে দ্বীনের*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩-১৫

আলোচনার মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। কোনো সিদ্ধান্তই চাপিয়ে দেওয়া হয় না।[২৭১] এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, জামায়াতের কর্মসূচি ও কর্মপদ্ধতি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে গ্রহণ করা হলেও সকল নীতিমালা ও সিদ্ধান্ত কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনার আলোকে গ্রহণ করা হয়।[২৭২]

সাংগঠনিক শৃঙ্খলার ওপর জামায়াত অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। মওদূদীর মতে, কোনো গঠনমূলক কাজই সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ছাড়া সম্পাদিত হতে পারে না। সমগ্র দল কর্তৃক একযোগে সংগঠনের গৃহীত নীতি বাস্তবায়নে সচেষ্ট হতে হবে। দলের প্রত্যেক সদস্যকে কর্তব্যনিষ্ঠ এবং যাকে যে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তা সময়মতো সম্পন্ন করার চেষ্টা করতে হবে। কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া থাকাও অত্যন্ত প্রয়োজন।[২৭৩] চার্লস জে. অ্যাডামসের ধারণায়, মওদূদী বিশ্বাস করতেন যে, সমাজ পরিবর্তনের জন্য শিক্ষিত ও ত্যাগী লোকদের সমন্বয়ে একটি সুশৃঙ্খল সংগঠন সৃষ্টি করা প্রয়োজন। ছোটো হলেও এ দলটির সদস্যদেরকে এমন হতে হবে, যাতে তাঁরা দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের অধিকারী হতে পারেন।[২৭৪] জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র হাজার হাজার সুশৃঙ্খল কর্মী রয়েছে বলে ধারণা করা হয়। জামায়াতের কর্মসূচি বাস্তবায়নে দেশব্যাপী এসব কর্মীদের তৎপরতা রয়েছে। জামায়াতের অনেক সার্বক্ষণিক নেতা-কর্মী রয়েছেন। গোলাম আযমের মতে, জামায়াতের কাজের জন্য নিজস্ব আয়ের উৎস বা কাজ পরিত্যাগ করতে হয়–এমন কর্মীগণ ও তাঁদের পরিবার পরিচালনার ব্যয়ভার জামায়াত বহন করে থাকে।[২৭৫] ঢাকা শহরে জামায়াতের সার্বক্ষণিক কর্মীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি।

বলা হয় যে, সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত দপ্তরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মীদের নিয়োজিত করে এসব প্রতিষ্ঠানকে জামায়াতের প্রভাবাধীন করার চেষ্টা করা হয়।[২৭৬] বিশেষ করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, প্রচার মাধ্যম ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের জন্য জামায়াতে ইসলামী বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়। চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসেবে

---

২৭১. Ghulam Azam, A Guide to, *op. cit.*, pp. 43-44

২৭২. *সংগঠন পদ্ধতি : জামায়াত*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬-১৭

২৭৩. আবুল আ'লা মওদূদী, *ইসলামী আন্দোলন : সাফল্যের শর্তাবলি*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪

২৭৪. Charles J. Adams, *op. cit.*, p. 375

২৭৫. সাক্ষাৎকার : অধ্যাপক গোলাম আযম।

২৭৬. মাওলানা আবদুল আউয়াল, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৪-৮৬

জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান পাকিস্তানে সফল হয়েছে বলে হামযা আলভি মত প্রকাশ করেছেন।[২৭৭] বাংলাদেশেও উপরিউক্ত লক্ষ্যার্জনের জন্য জামায়াত ব্যাপক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে বলে ধারণা করা হয়।

জামায়াতের মতে, ইসলামী সংগঠনের মূল উপাদানসমূহ হচ্ছে–

১. কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক আদর্শ, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, কর্মসূচি ও কর্মপদ্ধতি।

২. কুরআন-সুন্নাহ অনুসারী নেতৃত্ব।

৩. কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশানুসারী আনুগত্য।[২৭৮]

জামায়াত একটি রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় সংগঠন। ইসলাম যতটা রাজনৈতিক, জামায়াতও ততটা রাজনৈতিক সংগঠন।[২৭৯] জামায়াত নিজেকে ভারসাম্যপূর্ণ, বিজ্ঞানভিত্তিক, মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, গতিশীল এবং বাস্তবধর্মী সংগঠন বলে দাবি করে।[২৮০]

জামায়াতের নেতা-কর্মীদেরকে প্রশিক্ষণদানের জন্য কেন্দ্র, জেলা, থানা ইত্যাদি স্তরে বিভিন্ন সময়ে প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। দারসে কুরআন, দারসে হাদিস, আধুনিক যুগে কুরআন-হাদিসের শিক্ষার প্রয়োগ, ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন, জাতীয়-আন্তর্জাতিক রাজনীতি, দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ, ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা শিবিরসমূহে আলোচনা ও প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা করা হয়। নেতা-কর্মীদের নৈতিকমান উন্নয়নও শিক্ষা শিবির আয়োজনের অন্যতম লক্ষ্য হয়ে থাকে।[২৮১]

জামায়াত কেবল একটি রাজনৈতিক দল, ধর্মীয় সংগঠন বা সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান নয়; ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলাম যেমনি ব্যাপ্ত, জামায়াতে ইসলামীও নিজেকে তেমনি এক ব্যাপক সংগঠন বলে দাবি করে।

---

২৭৭. হামযা আলাভী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৬-৩৭

২৭৮. মতিউর রহমান নিজামী, *ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৩-৫৪

২৭৯. Ghulam Azam, A Guide to, *op. cit.*, pp. 63-64

২৮০. *সংগঠন পদ্ধতি : জামায়াত*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬

২৮১. Ghulam Azam, A Guide to, *op. cit.*, pp. 44-45

উপরিউক্ত লক্ষ্যকে সামনে রেখে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র চার দফা কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। এগুলো হচ্ছে–

১. দাওয়াত (আহ্বান) ও তাবলিগ (প্রচার),

২. তানযিম (সংগঠন) ও তারবিয়াত (প্রশিক্ষণ),

৩. ইসলাহে মুয়াশারা (সমাজ সংস্কার) ও

৪. ইসলাহে হুকুমাত (সরকার সংশোধন)।[২৮২]

সকল মানুষকে ইসলামের নানা বিষয়ে সঠিক ধারণা দান, সমাজ থেকে ইসলামবিরোধী ধ্যানধারণা দূরীকরণ এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পর্যায়ে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলার জন্য উৎসাহ প্রদান হচ্ছে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র দাওয়াত ও তাবলিগ বিষয়ক কার্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্যার্জনের জন্য জামায়াত ব্যক্তিগত ও গ্রুপভিত্তিক যোগাযোগ, ইসলামী বইপত্র বিতরণ, জনসভা, মিছিল, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, প্রদর্শনী, ধর্মীয় মাহফিল, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালিত করে থাকে।[২৮৩] দাওয়াত ও তাবলিগের কাজে সহায়তা লাভের জন্য জামায়াত সারা দেশে বিভিন্ন নামে অনেকগুলো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পাঠাগার, এতিমখানা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, চিকিৎসা কেন্দ্র ইত্যাদি গড়ে তুলেছে।

লেখালিখির ক্ষেত্রে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশের অন্য যেকোনো সংগঠনের নেতাদের তুলনায় এগিয়ে আছেন বলা যায়। মাওলানা মওদূদী, মাওলানা আবদুর রহীম ছাড়াও অধ্যাপক গোলাম আযম, আব্বাস আলী খান, মাওলানা এ. কে. এম. ইউসুফ. মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, অধ্যাপক ইউসুফ আলী, মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী, অধ্যাপক নাজির আহমদ, অধ্যক্ষ আবদুর রব, মাওলানা দেলোওয়ার হোসাইন সাঈদী, অধ্যাপক শরীফ হোসাইন, মুহাম্মাদ কামারুজ্জামান, আবুল আসাদ, আবদুস শহীদ নাসিম, শামসুন্নাহার নিজামীসহ বিভিন্ন স্তরের জামায়াত নেতৃবৃন্দ ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনের বিভিন্ন দিক নিয়ে অনেক বইপত্র লিখেছেন। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ নেতাদের রচনাবলিতে মাওলানা মওদূদীর

---

২৮২. *সংগঠন পদ্ধতি : জামাত*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫

২৮৩. ঐ, পৃ. ৬-১৪

চিন্তাধারার ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রকাশনার ক্ষেত্রেও জামায়াতের সাফল্য বাংলাদেশের অন্য যেকোনো রাজনৈতিক সংগঠনের তুলনায় বেশি বলা যায়। জামায়াত নিয়ন্ত্রিত অনেকগুলো গবেষণা ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান বই-পুস্তক এবং দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করছে। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনসমূহেরও প্রচুর প্রকাশনা রয়েছে। সারা দেশে জামায়াত নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত অনেকগুলো বই ও পত্র-পত্রিকা বিক্রয়কেন্দ্র রয়েছে।

জামায়াতে ইসলামী এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগহঠনসমূহের প্রায় প্রতিটি শাখার নিজস্ব পাঠাগার আছে। এসব পাঠাগারে বই বিক্রয়েরও ব্যবস্থা থাকে। বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা ও অন্যান্য প্রচারপত্র মুদ্রণের জন্য জামায়াত প্রভাবিত সংগঠনসমূহের নিজস্ব মুদ্রণালয়ও রয়েছে। ইসলামী ধ্যানধারণার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা এবং জনগণের মধ্যে তা প্রচারের জন্য বিভিন্ন নামে জামায়াত অনেকগুলো সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। জামায়াত তার দাওয়াত ও তাবলিগের কাজ মসজিদসহ অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে ব্যবহার করার চেষ্টা করে। বিভিন্ন ইসলামী দিবস পালনোপলক্ষ্যে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দারসে কুরআন, দারসে হাদিস, সিরাতুন্নবি সা., তাফসির মাহফিল ইত্যাদির মাধ্যমে জামায়াত তার বক্তব্য জনগণের নিকট উপস্থাপনের চেষ্টা করে।[২৮৪]

জামায়াতের মতে– মসজিদ হচ্ছে একটি জনপ্রিয় সামাজিক প্রতিষ্ঠান। ধর্মপরায়ণ লোকেরা এতে নিয়মিত হাজির হন। তাই জুমার খুতবা, খুতবা-পূর্ব বক্তৃতা, মসজিদে ফোরকানিয়া মাদরাসা, বয়স্কদের জন্য মক্তব, ইসলামী পাঠাগার ইত্যাদি স্থাপনের মাধ্যমে দাওয়াত ও তাবলিগের কাজ বিশেষভাবে সফল হতে পারে। এ কাজে সহায়তা লাভের জন্য মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন, মুতাওয়াল্লি প্রমুখকে প্রভাবিত করতেও জামায়াত সচেষ্ট হয়।[২৮৫]

---

২৮৪. উপরিউক্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কে ধারণার জন্য দেখুন, মেনিফেস্টো : জামায়াত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১-২১। *পাঠ্যপুস্তক তালিকা : জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ* (ঢাকা, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৯৯০। *সিলেবাস : বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির* (ঢাকা, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, ১৯৮৫)

২৮৫. দেখুন, সংগঠন পদ্ধতি : জামায়াত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬-১৭

জামায়াতের দ্বিতীয় দফা কর্মসূচি হচ্ছে সংগঠন ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক। জামায়াত তার সংগঠনকে ক্যাডারভিত্তিক সংগঠন বলে দাবি করে।[২৮৬] আমীরে জামায়াত, কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ ও সদস্য সম্মেলন ও চারটি পদ ও সংস্থা নিয়ে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র কেন্দ্রীয় সংগঠন গঠিত।[২৮৭]

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র সাংগঠনিক স্তর

(১৯৯১)

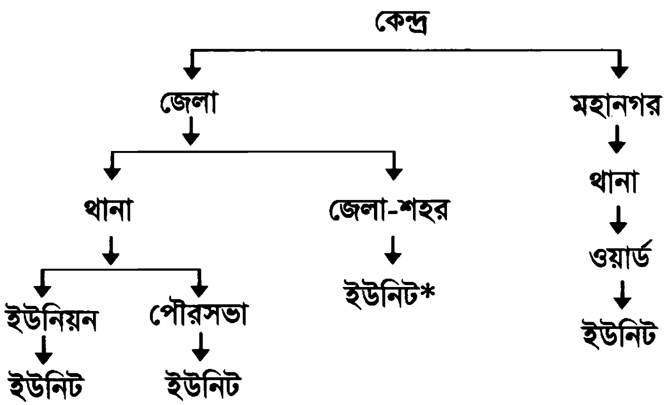

* সাংগঠনিক কাজের সুবিধার্তে বড়ো বড়ো জেলা শহরের কয়েকটি ইউনিট নিয়ে একটি 'জোন' গঠন করা হয়।

আমীরে জামায়াত : এ গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমীরে জামায়াতের ক্ষমতা, দায়িত্ব, মর্যাদা প্রভৃতি সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে বলে এখানে আর আলোচনা করা হলো না।

---

২৮৬. ঐ, পৃ. ১৬

২৮৭. গঠনতন্ত্র : জামায়াত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০-২১

কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা : আমীরে জামায়াতকে সহযোগিতা দানের জন্য কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা গঠিত হয়। আমীরে জামায়াত পদাধিকারবলে কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা তিন বছর মেয়াদের জন্য গঠিত হয়। সাধারণত নিম্নোক্তভাবে কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার আসন সংখ্যা বন্টন করা হয়।

ক. বিদায়ী কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা কর্তৃক জামায়াতে ইসলামীর রুকনদের প্রতিনিধিত্বের যে আনুপাতিক হার নির্ধারিত হয়, সে অনুযায়ী রুকনগণ কর্তৃক কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা সদস্যগণ নির্বাচিত হন। এখানে উল্লেখ্য যে, সকল সাংগঠনিক জেলার প্রতিনিধিত্ব যাতে কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরাতে থাকে সেটিও নিশ্চিত করা হয়।

খ. কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরাতে বিদায়ি কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা কর্তৃক নির্ধারিত হারে কেন্দ্রীয় ইউনিটের প্রতিনিধিত্ব থাকে।

গ. নির্বাচিত কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা সদস্যগণ সারা দেশের সদস্যদের মধ্য থেকে ১১ জনকে কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা সদস্য পদে নির্বাচিত করেন।

ঘ. কেন্দ্রীয় শূরার সদস্য নন, এমন কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্যগণ পদাধিকারবলে কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা সদস্য বিবেচত হন।

ঙ. আমীরে জামায়াত কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার সঙ্গে পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক (কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার মোট সদস্য সংখ্যার ১৫%-এর অধিক নহে) রুকনকে কেন্দ্রীয় শূরার সদস্য হিসেবে মনোনয়ন দিতে পারেন। বর্তমানে ৮০ জন সদস্যের পক্ষ থেকে একজন কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা সদস্য নির্বাচিত হন। যে সাংগঠনিক জেলার সদস্য সংখ্যা ৮০ জনের চেয়ে কম, কিন্তু ৪১ জনের বেশি সে জেলার সদস্যদের ভোটে ১ জন কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার সদস্য নির্বাচিত হয়ে থাকেন। কোনো সাংগঠনিক জেলার সদস্য সংখ্যা ৪১ জনের চেয়ে কম হলে সেক্ষেত্রে জেলা আমীরকে কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা সদস্য হিসেবে কোঅপ্ট করা হয়। কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৪০ জন।

প্রতি বছর অনন্তত দু'বার কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যাদান, গঠনতন্ত্র সংশোধন,

কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ও বাজেট অনুমোদন, সংসদীয় বোর্ড গঠন, দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনের ভিত্তিতে আমীরে জামায়াতকে অপসারণ ইত্যাদি কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার প্রধান কার্যাবলি বলে বিবেচিত হয়।

কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ : পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আমীরে জামায়াতকে সহযোগিতা দান কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের প্রধান দায়িত্ব বলে বিবেচনা করা হয়। কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা সদস্যদের কয়েকজনকে (বর্তমানে ২৭ জন) আমীরে জামায়াত কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য হিসেবে মনোনয়ন দেন। প্রতি মাসের শুরুতে আমীরে জামায়াতের সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার অনুপস্থিতিতে পরবর্তীকালে গঠিত কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার অনুমোদন সাপেক্ষে কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে। কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের সঙ্গে পরামর্শ করে আমীরে জামায়াত প্রয়োজনীয় সংখ্যক সাংগঠনিক সেক্রেটারি নিয়োগ করেন। কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্যগণ মন্ত্রী পরিষদের সদস্যদের মতো জামায়াতে ইসলামীর বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন। কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদকে এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয়, যাতে সরকার গঠনে জামায়াত কখনও সক্ষম হলে তা পরিচালনায় অসমর্থ না হয়। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ প্রায় ষাটটি বিভাগ সৃষ্টি করেছে। একজন কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য এক বা একাধিক বিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। সংগঠন, পরিকল্পনা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, প্রকাশনা, অর্থ, শিল্প, ব্যাবসা-বাণিজ্য, কৃষি, শ্রম, আইন, ফতোয়া, প্রচার, গবেষণা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, মুসলিম বিশ্ব, সমাজকল্যাণ, ছাত্র-ছাত্রী, অমুসলিম সম্প্রদায় ইত্যাদি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র কেন্দ্রীয় সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে।[২৮৮]

সদস্য সম্মেলন : জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র বিভিন্ন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সদস্য সম্মেলনের হাতে কেন্দ্রীভূত। সাধারণত তিন বছরে একবার সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আমীরে জামায়াত বা কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা প্রয়োজনবোধ করলে তখনও সদস্য সম্মেলন আহ্বান করা যেতে পারে।[২৮৯]

---

২৮৮. জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ পরিচিতি, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪

২৮৯. গঠনতন্ত্র : জামায়াত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪

জেলা সংগঠন : আমীরে জামায়াত কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার সঙ্গে পরামর্শ করে সাংগঠনিক জেলার সীমা নির্ধারণ করেন। বর্তমানে (১৯৯১) ৭২টি সাংগঠনিক জেলায় জামায়াতের কাজ চলছে। জেলা জামায়াত কেন্দ্রীয় জামায়াতের অধীনে কাজ করে। দেশের চারটি মহানগরী সংগঠনকেও জেলা সংগঠনের সমান মর্যাদা দেওয়া হয়। মহানগর সাংগঠনিক স্তরের অধীনে থানা, ওয়ার্ড ও ইউনিট সংগঠন কাজ করে। যে সাংগঠনিক জেলায় ২০ জন বা ততোধিক সদস্য রয়েছেন, সে জেলায় আমীরকে সহযোগিতাদানের জন্য জেলা সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে জেলা মজলিশে শূরা গঠিত হয়। জেলা শূরার সদস্য সংখ্যা জেলার সদস্য বৈঠক নির্ধারণ করে। যে জেলায় সদস্য সংখ্যা বিশ জনের কম, সেখানে জেলা সদস্য বৈঠক জেলা শূরার দায়িত্ব পালন করে। জেলা শূরা বা জেলা সদস্য বৈঠকের পরামর্শের ভিত্তিতে জেলা কর্মপরিষদ গঠিত হয়। কেন্দ্রীয় সংগঠনের অনুসরণে জেলা জামায়াতের কাজকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয। জেলা কর্মপরিষদের সদস্যগণ উক্ত বিভাগসমূহের দায়িত্ব পালন করেন। জেলা কর্মপরিষদ সদস্যগণ তাঁদের কাজের জন্য জেলা আমীর ও জেলা শূরার নিকট দায়ী থাকেন।

জেলা সংগঠনের উদ্যোগে জেলা সদস্যদের মাসিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে রুকনদের ব্যক্তিগত রিপোর্ট, সাংগঠনিক কাজকর্ম ইত্যাদি বিষয় পর্যালোচনা করা হয়। প্রতি তিন মাসে একবার জেলা রুকনদের এক দিনের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সাংগঠনিক বিষয় ছাড়াও প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত থাকে। এ ছাড়া জেলা আমীরের সভাপতিত্বে প্রতি মাসে থানা আমীর বা নাযেমদের 'জেলা বৈঠক' অনুষ্ঠিত হয়। থানার সাংগঠনিক কাজের রিপোর্ট পর্যালোচনাসহ বিভিন্ন বিষয় এ বৈঠকে আলোচনা করা হয়।

থানা সংগঠন : যে থানায় তিনজন সদস্য রয়েছেন, সে থানার সদস্যদের গোপন ভোটের ফলাফল এবং জেলা আমীরের সুপারিশের ভিত্তিতে আমীরে জামায়াত ওই থানার জন্য কাউকে আমীর নিয়োগ করেন। তিনজন সদস্য নেই, এমন থানায় জেলা শূরার পরামর্শানুসারে জেলা আমীর থানা নাযেম নিয়োগ করেন। কোনো থানায় ১৫ জন বা ততোধিক সদস্য থাকলে সে থানায় মজলিশে শূরা গঠিত হয়। থানা সংগঠনের বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য থাকলে থানা কর্মপরিষদও গঠন করা হয়। কর্মপরিষদ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য না থাকলে থানা নেতৃত্বকে সহযোগিতা করার জন্য একটি থানা টিম গঠিত হয়। প্রতি মাসে থানা সদস্যদের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। থানার অধীন ইউনিয়নসমূহের নাযেম

এবং যে ইউনিয়নের নাযেম নেই, সে ইউনিয়নের ইউনিট নাযেমদের নিয়ে প্রতি মাসে থানা সদস্যদের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে পূর্ব মাসের কাজের পর্যালোচনা এবং আগামী মাসের কাজের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[২৯০]

থানা সংগঠন জেলা সংগঠনর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে। মহানগরীর বিভিন্ন থানা সংগঠন জেলাসমূহের অন্তর্ভুক্ত থানা সংগঠনের সমান মর্যাদাসম্পন্ন সাংগঠনিক স্তররূপে বিবেচিত হয়। তবে মহানগরীর অধীনস্থ থানা সংগঠনের প্রধানকে আমীর না বলে নাযেম বলা হয়।

পৌরসভা সংগঠন : জেলা শহরের পৌরসভা সংগঠনকে থানা সংগঠনের মর্যাদা দেওয়া হয়। অন্যান্য পৌরসভা সংগঠন ইউনিয়ন সংগঠনের মর্যাদা পায়। জেলা শহর পৌরসভা সংগঠনের অধীনে ইউনিট সংগঠন কাজ করে। সাংগঠনিক কাজকর্ম পরিচালনার সুবিধার্থে বড়ো বড়ো জেলা শহরের কয়েকটি ইউনিট নিয়ে একটি 'জোন' সাংগঠনিক স্তর গঠিত হয়।

ইউনিয়ন সংগঠন : যে ইউনিয়নে তিন বা ততোধিক সদস্য আছে, সেখানে ইউনিয়ন সদস্যদের গোপন ভোটের ফলাফল, থানা ও জেলা আমীরের সুপারিশক্রমে আমীরে জামায়াত ইউনিয়ন নাযেম নিয়োগ করেন। কোনো ইউনিয়নে তিনজনের কম সদস্য বা আদৌ কোনো সদস্য না থাকলে থানা আমরি বা নাযেম জেলা আমীরের সঙ্গে পরামর্শ করে ইউনিয়ন নাযেম নিয়োগ করেন। ১৫ বা তদূর্ধ্ব সদস্য বিশিষ্ট ইউনিয়ন বা পৌরসভার আমীর প্রয়োজনবোধে ইউনিয়ন-পৌরসভা শূরা গঠন করতে পারেন।

ওয়ার্ড সংগঠন : দেশের ইউনিয়নসমূহ তিনটি ওয়ার্ডে বিভক্ত বলে কোথাও কোথাও ওয়ার্ড পর্যায়েও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ সংগঠন গড়ে তুলেছে।

ইউনিট সংগঠন : স্থানীয় জামায়াতের অধীনে ছোটো ছোটো এলাকাকে কেন্দ্র করে তিন বা ততোধিক কর্মী নিয়ে একেকটি ইউনিট গঠিত হয়। প্রত্যেক ইউনিটের পরিচালকরূপে একজন নাযেম দায়িত্ব পালন করেন। জামায়াতের প্রত্যেক সদস্যকে যেকোনো একটি ইউনিটের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে হয়।

---

২৯০. গঠনতন্ত্র : জামায়াত, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৩৫-৩৮। আরও দেখুন, অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী, *ইসলামী আন্দোলনে উপজিলা ও ইউনিট দায়িত্বশীলদের ভূমিকা* (ঢাকা, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৯৮৯), পৃ. ৭-৯

মুসলিম মহিলাদের মধ্যে ইসলামী আন্দোলনের কাজ পরিচালনার সুবিধার্তে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র মহিলা বিভাগ রয়েছে। জামায়াতের মহিলা বিভাগ জামায়াতের কর্মধারাই অনুসরণ করে।[২৯১] জামায়াতের মহিলা বিভাগ আমীরে জামায়াতের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। আমীরে জামায়াতের পক্ষে একজন মহিলা সেক্রেটারি এ বিভাগের কাজকর্ম পরিচালনা করেন। জেলা, থানা ইত্যাদি স্তরের জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ আমীর/নায়েমগণ স্ব স্ব স্তরের মহিলা বিভাগের কার্যক্রমের তত্ত্বাবধানে থাকেন। বিভিন্ন সাংগঠনিক স্তরের আমীর/নায়েম কর্তৃক প্রদত্ত রিপোর্টে মহিলা বিভাগের কর্মকাণ্ডের বিবরণ বর্ণিত থাকে। মহিলা ইউনিটকেও সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করতে হয়।[২৯২]

মহিলা বিভাগকে অমুসলিম মহিলাদের মধ্যেও কাজ করতে হয়। জামায়াতের মহিলা বিভাগে বর্তমানে (১৯৯১) তিনশ'র অধিক সদস্য (তন্মধ্যে ঢাকা মহানগরীতে ৭৭ জন) ও প্রায় ২৯,০০০ সহযোগী সদস্য আছেন।[২৯৩] এ গ্রন্থের লেখক ব্যক্তিগতভাবে জামায়াতের কেন্দ্র, কয়েকটি জেলা, থানা, ইউনিয়ন ও ইউনিট পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে মহিলাদের মধ্যে জামায়াতের কাজ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে লেখকের ধারণা হয়েছে যে, শহরের শিক্ষিত মহিলাদের মধ্যে জামায়াতের সাংগঠনিক কাজ মোটামুটি চললেও গ্রামাঞ্চলে মহিলা বিভাগের সাংগঠনিক কাজ সীমিত বলা যায়। তবে এ কথা সত্য যে, বাংলাদেশের ইসলামী আদর্শানুসারী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে জামায়াতই মহিলাদের মধ্যে সাংগঠনিক কাজ পরিচালনা করছে।

জামায়াতের বিভিন্ন স্তরের সংগঠনের আমীর, নায়েম, নায়েমাকে মাসিক-ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে দাওয়াত ও তাবলিগ, তানযিম ও তারবিয়াত, মহিলা বিভাগ, শ্রম বিভাগ, অমুসলিম সহযোগী, ইসলাহে মুয়াশারা, ইসলাহে হুকুমাত

---

২৯১. দেখুন, বেগম রোকেয়া আনসার, *ইসলামী আন্দোলন মহিলা কর্মীর দায়িত্ব ও কর্তব্য* (ঢাকা, রায়হান প্রকাশনী, ১৯৮৮), পৃ. ৭৭-৮০। শামসুন্নাহার নিজামী, *দ্বীন প্রতিষ্ঠার মহিলাদের দায়িত্ব* (ঢাকা, প্রত্যয় প্রকাশনী লি., ১৯৮৫), পৃ. ৫৩-৬৩

২৯২. দেখুন, জামায়াতে ইসলামী ফরম নম্বর ৫ (মুদ্রণ, ডিসেম্বর, ১৯৮৯)

২৯৩. সাক্ষাৎকার : রাশেদা খাতুন এমপি, সেক্রেটারি, মহিলা বিভাগ, ঢাকা মহানগরী জামায়াত।

ইত্যাদিসহ বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের স্ব-স্ব সাংগঠনিক স্তরের কার্যক্রমের রিপোর্ট পেশ করতে হয়। এসব রিপোর্টের সারসংক্ষেপ ক্রমান্বয়ে ওপরের স্তরের সংগঠন এবং সবশেষে কেন্দ্রে পৌঁছে।[২৯৪]

সংগঠন বিষয়ক উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ সংগঠন পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আমীরে জামায়াতের ব্যাপক ক্ষমতা রয়েছে। আমীরে জামায়াতের এ ব্যাপক ক্ষমতা লাভ নেতৃত্ব ও সংগঠন সম্পর্কিত ইসলামী ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলা যায়। এ প্রসঙ্গে ডি. ই. স্মিথের মন্তব্য হচ্ছে, মুসলিম বিশ্বে দৃঢ় নেতৃত্বসম্পন্ন রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব পরিলক্ষিত হয়। ইসলামী রাজনৈতিক দলের অবস্থান সুস্পষ্টভাবে ইসলামের ঐতিহাসিক আঙ্গিক বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কিত। ইসলামে একটি কর্তৃত্ববাদী সম্পর্ক রয়েছে এবং এটি মানুষের সর্বাত্মক সমাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।[২৯৫]

সংগঠন ও প্রশিক্ষণ পর্যায়ে কর্মী বৈঠক, মাসিক ইউনিট নাযেম বৈঠক, দায়িত্বশীলদের বৈঠক, সদস্য বৈঠক, শূরা বৈঠক, কর্মপরিষদ বৈঠক, কর্মী যোগাযোগ, সাংগঠনিক সাক্ষাৎ, সাংগঠনিক সফর, বায়তুলমাল সংগ্রহ ইত্যাদি কার্যাবলি সম্পাদন করতে জামায়াতে ইসলামী চেষ্টা করে।[২৯৬] এ ছাড়া জামায়াতের বিশেষ বিশেষ কর্মসূচি পালন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন সাংগঠনিক স্তর বিশেষ বিশেষ বৈঠকে মিলিত হয়। জামায়াতের বৈঠকসমূহে দারসে কুরআন ও দারসে হাদিস, ব্যক্তিগত রিপোর্ট পর্যালোচনা, ব্যক্তিগত টার্গেট পর্যালোচনা, পূর্বতন কাজের পর্যালোচনা, চলতি কাজের পরিকল্পনা, উর্ধ্বতন সাংগঠনিক স্তরের নির্দেশাবলি বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ, বায়তুলমাল সম্পর্কিত রিপোর্ট ইত্যাদি বিষয়ে সাধারণত আলোচনা-পর্যালোচনা করা হয়।[২৯৭] জামায়াতে ইসলামীর কর্মপরিকল্পনায় সাংগঠনিক পক্ষ বা সপ্তাহ পালনের টার্গেট থাকে।

---

২৯৪. দেখুন, জামায়াতে ইসলামী ফরম নম্বর ৪ (মুদ্রণ, ডিসেম্বর, ১৯৮৯), ওয়ার্ড ফরম (নম্বর নেই, মুদ্রণ, ডিসেম্বর, ১৯৮৯), ফরম নম্বর ৬ (মুদ্রণ, ডিসেম্বর, ১৯৮৯), ফরম নম্বর ৮ (মুদ্রণ, ডিসেম্বর, ১৯৮৯), ফরম নম্বর ৭ (মুদ্রণ, এপ্রিল, ১৯৯১), ফরম নম্বর ৯ (মুদ্রণ, ডিসেম্বর, ১৯৮৯)

২৯৫. D. E. Smith, *Religion and Political Development* (Boston, Little Brown and Co., 1970). pp. 268-69

২৯৬. সংগঠন পদ্ধতি : জামায়াত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২-৩৪

২৯৭. ঐ, পৃ. ৬৫-৭০

সমগ্র দেশব্যাপী কিংবা বিশেষ বিশেষ জেলায় সাংগঠনিক পক্ষ বা সপ্তাহ পালিত হয়। সাংগঠনিক সপ্তাহ বা পক্ষ চলাকালে জামায়াতের বক্তব্য জনগণের নিকট পৌঁছে দেওয়ার জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।[২৯৮]

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র সকল স্তরের সাংগঠনিক কাজকর্ম পরিকল্পনার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের বৈঠকে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে পরিকল্পনা প্রণীত হয়। উর্ধ্বতন সাংগঠনিক স্তরের পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অধস্তন সংগঠনের পরিকল্পনা প্রণীত হয়। অধস্তন স্তরের পরিকল্পনা উর্ধ্বতন স্তর কর্তৃক অনুমোদিতও হতে হয়। সংগঠনের জনশক্তি, নেতৃত্বের মান, কাজের পরিধি, সাংগঠনিক এলাকা সম্পর্কিত পরিসংখ্যান, কর্মীদের মান, অর্থনৈতিক অবস্থা, জামায়াতবিরোধী মহলের শক্তি ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে সাংগঠনিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।[২৯৯]

জামায়াতে ইসলামীর সংগঠনে বায়তুলমাল সংগ্রহের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। কেন্দ্র, জেলা ও স্থানীয় জামায়াতে বায়তুলমাল বিভাগ কাজ করে। জেলা ও স্থানীয় জামায়াতের অধীনস্থ সংগঠনগুলো জেলা বা স্থানীয় বায়তুলমাল থেকে তাদের ব্যয় নির্বাহ করে। জামায়াতের বায়তুলমালের আয়ের উৎসমূহ হচ্ছে নিম্নরূপ–

১. জামায়াতের প্রত্যেক সদস্য নিম্নোক্ত তিনটি পদ্ধতির মধ্য থেকে যেকোনো একটিকে নিজের জন্য বেছে নিয়ে সে অনুসারে বায়তুলমালে এয়ানত জমা দেবেন। ক. মাসিক মোট আয়োর পাঁচ ভাগের এক অংশ বায়তুলমালে জমা দান। খ. একজন রুকনের পরিবারের সদস্য সংখ্যা যতজন, তার সঙ্গে জামায়াতে ইসলামীকে আরেকজন সদস্য হিসেবে বিবেচনা করে (পরিবারের সদস্য সংখ্যা + জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ) পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা দ্বারা ঐ রুকনের মাসিক আয়কে ভাগ করে জামায়াতে ইসলামীর অংশ বায়তুলমালে জমা দান। গ. একজন সদস্যের মোট বার্ষিক আয়ের বারো ভাগের এক ভাগ বায়তুলমালে জমা দান।

---

২৯৮. দেখুন, 'দাওয়াতী পক্ষ' (লিফলেট) প্রকাশনায় : জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ঢাকা মহানগরী, ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৭। 'দাওয়াতী সপ্তাহের ডাক' (লিফলেট), জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ (তারিখ নেই)।

২৯৯. সংগঠন পদ্ধতি : জামায়াত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮

২. রুকন ব্যতীত অন্যান্য স্তরের জামায়াত কর্মীগণকে তাঁদের আয়ের একটি অংশ (স্ব-নির্ধারিত) বায়তুলমালে জমা দিতে হয়।

৩. শুভাকাঙ্ক্ষীদের চাঁদা।

৪. ইসলামী আন্দোলনের জন্য যাকাতের ব্যয় করাকে জামায়াত উত্তম কাজ মনে করে। সদস্য ও কর্মীগণকে তাঁদের পুরো যাকাতের টাকা বায়তুলমালে জমা দিতে উৎসাহিত করা হয়। সহযোগী সদস্য, সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ীগণও তাঁদের যাকাতের একটা অংশ বায়তুলমালে জমা দেন।

৫. উশর ও সদাকা।

৬. নিজস্ব প্রকাশনা ও বই বিক্রয় কেন্দ্রের লভ্যাংশ।

৭. এককালীন দান।

৮. জামায়াতের মালিকানাধীন সম্পত্তির আয় ইত্যাদি।[৩০০] সমাজকল্যাণ কার্যাবলি পরিচালনার জন্য জামায়াত কুরবানির চামড়া অথবা এর বিক্রয়লব্ধ অর্থও সংগ্রহ করে থাকে।

যথাসম্ভব বেশি স্থানে জামায়াত তার নিজস্ব দপ্তর স্থাপন করতে চায়। সহযোগী সদস্য-কর্মী-সদস্যদের ঠিকানাসহ নামের তালিকা এবং ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক রিপোর্ট সংরক্ষণ, পাঠাগার পরিচালনা, বিভিন্ন ফরম সংরক্ষণ, সংগঠনের হিসাব-নিকাশ রক্ষা, অধস্তন সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ, সাংগঠনিক বৈঠকের কার্যবিবরণী সংরক্ষণ ইত্যাদি দাপ্তরিক কাজকর্ম জামায়াতে ইসলামীর দপ্তরসমূহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সম্পাদন করতে হয়।[৩০১]

ঢাকা শহরের একটি সুসজ্জিত ও সুরক্ষিত বহুতল ভবন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র কেন্দ্রীয় দপ্তর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ দপ্তরের ফ্যাক্স ও পিএবিএক্স টেলিফোনসহ অন্যান্য আধুনিক যোগাযোগব্যবস্থার সুবিধা রয়েছে।

---

৩০০. ঐ. পৃ. ৩২। জামায়াত সংগঠনের প্রতিটি স্তরকে বায়তুল মালের হিসাব রাখতে হয়। এ কাজে ব্যবহারের জন্য প্রত্যেক ইউনিটকে কেন্দ্র থেকে মুদ্রিত ফরম সরবরাহ করা হয়। নমুনা হিসেবে জামায়াতে ইসলামী ফরম নম্বর ১০ (মুদ্রণ, ডিসেম্বর, ১৯৮৯) দেখা যেতে পারে।

৩০১. সংগঠন পদ্ধতি : জামায়াত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩২-৩৪

কেন্দ্রীয় দপ্তরে একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরিও আছে। দেশের প্রায় সকল সংবাদপত্র এই লাইব্রেরি সংরক্ষণ করে। জামায়াতের অধিকাংশ অঙ্গ এবং সহযোগী সংগঠনেরও আলাদা আলাদা দপ্তর আছে। একদল সার্বক্ষণিক কর্মী জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ দপ্তরসমূহের কাজকর্ম দেখাশোনা করেন। এ গবেষকের ব্যক্তিগত ধারণানুসারে বাংলাদেশের অন্য কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের দাপ্তরিক কাজকর্ম জামায়াতের মতো এত সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হয় না।

জামায়াত সংগঠনের দ্বিতীয় দফা কর্মসূচির অপর গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে প্রশিক্ষণ বা তারবিয়াত। প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই বর্তমান সমাজের একজন ব্যক্তির পক্ষে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করা সম্ভব বলে জামায়াত বিশ্বাস করে। ইকামতে দ্বীনের কাজের জন্য ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকাকে জামায়াতে ইসলামী অপরিহার্য বিবেচনা করে। এ কাজের জন্য জামায়াত একটি পাঠ্যতালিকা তৈরি করেছে। জামায়াতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে পাঠ্য তালিকাভুক্ত বইগুলো পড়তে হয়।[৩০২] প্রত্যেক কর্মী প্রতিদিন অন্তত দশ পৃষ্ঠা করে এসব বই পড়বেন এবং অন্যকেও পড়তে উৎসাহিত করবেন। ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভে কর্মী-সমর্থকদের সাহায্য করার জন্য জামায়াতের প্রত্যেক ইউনিটকে সামষ্টিক পাঠ, পাঠচক্র, ওয়ার্কশপ, শিক্ষা বৈঠক, শিক্ষা শিবির, শববেদারি ইত্যাদি অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হয়।[৩০৩]

তৃতীয় দফা কর্মসূচি সমাজ সংশোধন ও সংস্কারের লক্ষ্যে জামায়াতে ইসলামী প্রচলিত কুসংস্কার বর্জন, ইসলামী আচার-অনুষ্ঠান চালু, গণশিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, মসজিদ সংস্কার, পাঠাগার-ক্লাব-সমিতি-শরীরচর্চা কেন্দ্র ইত্যাদি স্থাপন, বিভিন্ন ইসলামী দিবস উদ্‌যাপন, সমাজবিরোধী কার্যকলাপ প্রতিরোধ, সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশ, অপসংস্কৃতি রোধ ইত্যাদি বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করে। কর্জে হাসানা প্রদান, রোগীর পরিচর্যা, ছিন্নমূলের পুনর্বাসন, গরিব ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি সমাজসেবামূলক কাজে জামায়াত তার কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করতে চায়।[৩০৪] দুঃস্থ লোকজনের সেবাকে জামায়াত অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত বলে মনে করে।

---

৩০২. ঐ, পৃ. ৩৪-৪২। আরও দেখুন, পাঠ্যপুস্তক তালিকা : জামায়াত, *পূর্বোক্ত*

৩০৩. সংগঠন পদ্ধতি : জামায়াত, *পূর্বোক্ত*, পরিশিষ্ট ২ দ্রষ্টব্য

৩০৪. ঐ, পৃ. ৪৩-৪৮

তাই জামায়াত তার কর্মীদের সমাজসেবার কাজে প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ সেবকরূপে গড়ে তুলতে চায়। রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করে জনগণকে সর্বোত্তম সেবা দান করা যায় বলে জামায়াত বিশ্বাস করে। ক্ষমতার বাইরে থাকাবস্থায়ও জামায়াত জনগণের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতে চায়।[৩০৫] বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে জামায়াতের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণে অনেকগুলো সেবা প্রতিষ্ঠান কাজ করছে।

জামায়াতের চতুর্থ দফা কর্মসূচি হচ্ছে ইসলাহে হুকুমাত বা সরকার সংশোধন। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়ন করতে চায়। ইসলামী আদর্শের অনুকূলে জনমত গঠন, সৎ লোকের নেতৃত্বাধীন সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ, ইসলামী অর্থব্যবস্থা প্রবর্তন ইত্যাদির মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ সরকারব্যবস্থা সংশোধন করতে চায়।[৩০৬]

আদর্শ ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ অনেকগুলো অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন সৃষ্টি করেছে। জামায়াতের অঙ্গ সংগঠনসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন, বাংলাদেশ চাষি কল্যাণ সমিতি, বাংলাদেশ তাঁতি কল্যাণ সমিতি, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রী সংস্থা, মওদূদী রিসার্চ একাডেমি প্রভৃতি অন্যতম। উপরিউক্ত অঙ্গ সংগঠনসমূহ জামায়াত কর্তৃক সরাসরি নিয়ন্ত্রিত হয়।

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, ইত্তেহাদুল উম্মাহ বাংলাদেশ, আদর্শ শিক্ষক পরিষদ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ইসলামিক ইকোনমিক রিসার্চ ব্যুরো, বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট, ফালাহে আম ট্রাস্ট, বাংলাদেশ মসজিদ মিশন, ইসলামী সমাজ কল্যাণ সমিতি, ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি, ফুলকুঁড়ি ইত্যাদি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র প্রধান সহযোগী সংগঠন হিসেবে পরিচিত।

সারা বাংলাদেশে জামায়াতের এ জাতীয় আরও অনেকগুলো সহযোগী প্রতিষ্ঠান রয়েছে। জামায়াত কর্তৃক সরাসরি নিয়ন্ত্রিত না হলেও এসব সংগঠনের

---

৩০৫. Ghulam Azam, A Guide to, *op. cit.*, p. 47

৩০৬. সংগঠন পদ্ধতি : জামায়াত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫০-৫২

পরিচালকদের প্রায় সবাই জামায়াতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। উদাহরণস্বরূপ ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এ সোসাইটির সাতজন সদস্যের সবাই জামায়াতের বিশিষ্ট নেতা হিসেবে পরিচিত। *দৈনিক সংগ্রাম*-এর চেয়ারম্যান, সম্পাদক ও নির্বাহী সম্পাদক জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য। *সাপ্তাহিক সোনার বাংলা*'র সম্পাদকও জামায়াতের একজন কেন্দ্রীয় নেতা। এ ছাড়া উপরোল্লিখিত প্রায় সকল সহযোগী সংগঠনের নিয়ন্ত্রণ জামায়াতে ইসলামীর নেতাদের হাতে কেন্দ্রীভূত।[৩০৭]

বিভিন্ন পেশা ও ধ্যানধারণার লোকজনকে এসব সহযোগী সংগঠনের মাধ্যমে প্রথমে জামায়াত আদর্শের সমর্থক ও পরবর্তীকালে সংগঠনের সদস্য করতে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ সচেষ্ট হয় বলে ধারণা করা হয়। এ প্রসঙ্গে ইত্তেহাদুল উম্মাহ, মসজিদ মিশন, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন প্রভৃতি সংগঠনের কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করা যায়। দেশের আলেম সমাজের এক উল্লেখযোগ্য অংশের জামায়াতবিরোধী মনোভাব দূর করার লক্ষ্যে ইত্তেহাদুল উম্মাহ কাজ করছে। এ সংগঠনের প্রচেষ্টায় পীর-আলেমদের জামায়াতবিরোধী মনোভাব পূর্বের তুলনায় বর্তমান হ্রাস পেয়েছে বলে ধারণা করা যায়। দেশের মসজিদ, মাদরাসা, খানকা, তাবলিগ ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্যও জামায়াত বর্তমানে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।[৩০৮]

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কের কথা জামায়াত স্বীকার করে না। শিবির একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সংগঠন বলে দাবি করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন কার্যক্রম ও ঘটনা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, শিবির-জামায়াত সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ছাত্রশিবিরের সঙ্গে জামায়াতের যোগাযোগ রক্ষা করেন।

৩০৭. সর্বজনাব এ. কে. এম. ইউসুফ, শামসুর রহমান, সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী, আবুল আসাদ, আলী আহসান মুজাহিদ, মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, অধ্যক্ষ আবদুর রব, নাজির আহমদ, আবদুল গাফ্ফার, আবু নাসের প্রমুখ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় নেতার সঙ্গে আলাপ করে এসব তথ্য জানা গেছে।

৩০৮. দেখুন, পরিচিতি : জামায়াত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯

প্রাক্তন সংঘ ও শিবির নেতৃবৃন্দদের মধ্যে যাঁরা বর্তমানে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত আছেন, তারা শিবিরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বিশেষভাবে জড়িত থাকেন। প্রাক্তন সভাপতিদের মধ্য থেকে এমন একজনকে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবে শিবির সভাপতি মনোনয়ন দেন, যিনি শিবিরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জামায়াতের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন।

নিম্নোক্ত ঘটনা থেকেও জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্রশিবিরের সম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইরান বিপ্লব সফল (১৯৭৯) হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ বিপ্লবের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করলেও ইরাক-ইরান যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ইরান প্রশ্নে জামায়াতের নেতৃত্ব তাঁদের পূর্বতন অবস্থান পরিবর্তন করেন। তৎকালীন (১৯৮২) শিবির সভাপতি আহমদ আবদুল কাদের বাচ্চু ও তাঁর অনুগামীরা ইরানের প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখা এবং বাংলাদেশে ইসলামী বিপ্লব অনুষ্ঠানের পক্ষে মত প্রকাশ করলে জামায়াত ও শিবির নেতৃত্বের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। জামায়াতের প্রধান নেতা অধ্যাপক গোলাম আযমসহ জামায়াত নেতৃত্বের প্রধান অংশ শিবির সভাপতির মতের বিরোধিতা করেন।[৩০৯] জামায়াত নেতৃত্বের সরাসরি হস্তক্ষেপের ফলে জনাব বাচ্চু শিবির সভাপতির পদ থেকে অপসারিত হন। জামায়াত সমর্থক শিবির নেতাদের বক্তব্য থেকেও এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।[৩১০] জামায়াতে ইসলামীর তৎকালীন কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য মাওলানা আবদুল জাব্বারও ছাত্রশিবিরের কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করার জন্য জামায়াত নেতাদের দায়ী করেছেন।[৩১১]

নিম্নোক্ত দুটি সারণীও জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্রশিবির কিংবা জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্র সংঘের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তুলে ধরে।

---

৩০৯. দেখুন, সংকটের ঘূর্ণাবর্তে, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১-১৪

৩১০. দেখুন, *কর্মী ভাইদের উদ্দেশ্যে সংগঠনের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে কার্যকরী পরিষদের বক্তব্য*, পুস্তিকা (ইসলামী ছাত্রশিবির কর্তৃক প্রকাশিত, প্রকাশের স্থান ও তারিখ উল্লেখ নেই), পৃ. ৪

৩১১. আবদুল জব্বার, *জামায়াত নেতৃবৃন্দের প্রতি চ্যালেঞ্জ* (ঢাকা, প্রকাশকের নাম নেই, ১৯৮৩), পৃ. ১১-১২

সারণী ৩ : ১

সংঘ/ শিবির থেকে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ নেতৃত্ব (১৯৯১)

শতকরা হারে

স্তর	ছাত্রজীবনে শিবির/সংঘ করতেন	করতেন না	উত্তর নেই	পাওয়া যায়নি
কে ক প	৫৫.৫৬	৩৭.০৩		৭.৪১
সাংগঠনিক সেক্রেটারি	৪৫.৪৬	২৭.২৭		২৭.২৭
সংসদ সদস্য	৭০.০০	২০.০০	৫.০০	৫.০০
জেলা আমীর	৭৫.০০	২৫.০০		
চট্টগ্রাম উত্তর জেলা	৫৮.৬৩	৮.৩৩		৩৩.৩৪
লক্ষ্মীপুর জেলা	৬৬.৬৭	১৬.৬৬		১৬.৬৭
হাটহাজারী থানা (শহর)	৫৮.৩৩	৪১.৬৭		
রায়পুর থানা	২৫.০০	৫০.০০		২৫.০০
দক্ষিণ পাহাড়তলী ইউনিয়ন	৩০.০০	৪০.০০		৩০.০০
চরপাতা ইউনিয়ন	৫৮.৩৩	৪১.৬৭		
মোট	৫৬.২৫	৩০.৫৬	০.৬৯	১২.৫০

উৎস : পূর্বোক্ত

সারণী ৩ : ২

জা ই বা/শিবির নেতাদের ভাই-বোন, ছেলেমেয়েরা এবং শিবির/সংস্থা (১৯৯১)

শতকরা হারে

স্তর	শিবির/ সংঘ করছে	শিবির/ সংঘ করছে না	অপ্রযোজ্য	উত্তর নেই	পাওয়া যায়নি
কে ক প	৯২.৫৯				৭.৪১
সাংগঠনিক সেক্রেটারি	৬৩.৬৪	৯.০৯			২৭.২৭
সংসদ সদস্য	৯৫.০০				৫.০০
জেলা আমীর	৯৩.৭৫	৬.২৫			
চট্টগ্রাম উত্তর জেলা	৫৮.৩৩		৮.৩৩		৩৩.৩৪
লক্ষ্মীপুর জেলা	৫৮.৩৩	৮.৩৩	৮৩৩	৮.৩৩	১৬.৬৮
হাটহাজারী থানা (শহর)	৯১.৬৭	৮.৩৩			
রায়পুর থানা	৪১.৬৭	৩৩.৩৩			২৫.০০
দক্ষিণ পাহাড়তলী ইউনিয়ন	৫০.০০	২০.০০			৩০.০০
চরপাতা ইউনিয়ন	৬৬.৬৭	২৫.০০		৮.৩৩	
মোট	৭৫.৬৯	৯.০৩	১.৩৯	১.৩৯	১২.৫০

উৎস : পূর্বোক্ত

সারণী ৩ : ১

সারণী ৩ : ১-এ দেখা যায় যে, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্যদের ৫৫.৫৬% ছাত্রজীবনে ইসলামী ছাত্র সংঘ বা ইসলামী ছাত্রশিবিরের সদস্য ছিলেন। যে বয়োজ্যেষ্ঠ জামায়াত নেতারা সংঘ বা শিবির করেননি, তাঁদের অধিকাংশের ছাত্রজীবনে ছাত্র সংঘ গঠিত হয়নি কিংবা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র সংঘের কার্যক্রম প্রসারিত হয়নি। উক্ত সারণী অনুসারে বিভিন্ন স্তরের জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ নেতৃত্বের ৫৬.২৫% তাঁদের ছাত্রজীবনে সংঘ বা শিবিরের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।[৩১২]

সারণী ৩ : ২

উপরিউক্ত সারণীতে উপস্থাপিত তথ্যানুসারে স্পষ্ট হয় যে, বিভিন্ন স্তরের জামায়াতের নেতাদের ভাই-বোন ও ছেলেমেয়ের অধিকাংশ (৭৫.৬৯%) ইসলামী ছাত্রশিবির অথবা ইসলামী ছাত্র সংঘের সঙ্গে জড়িত।

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের একটি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ১৮ জন নেতার ওপর পরিচালিত জরিপে দেখা যায় যে, উপরিউক্ত নেতৃবৃন্দের ৯ জনের পিতা কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত নন বা ছিলেন না। ৫ জনের পিতা জামায়াতের সঙ্গে যুক্ত আছেন বা ছিলেন। বাকি ৪ জনের পিতা মুসলিম লীগ, অন্য ইসলামী দল, বিএনপি ও আওয়ামী লীগের সঙ্গে যুক্ত আছেন বা ছিলেন। উপরিউক্ত জরিপ থেকে আহরিত তথ্যানুসারে জামায়াত নেতাদের ৮৮.৮৯% এর ভাই-বোন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির বা ছাত্র সংঘের সঙ্গে জড়িত। উপরোল্লিখিত উপাত্তসমূহ থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, ইসলামী ছাত্রশিবির জামায়াতে ইসলামীর নেতা-কর্মী-সমর্থক সরবরাহের অন্যতম উর্বর ক্ষেত্র বলে বিবেচিত হতে পারে এবং উভয় সংগঠনের মধ্যকার সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ।[৩১৩]

এ গ্রন্থের উপক্রমণিকায় উন্নয়ন সম্পর্কিত পাশ্চাত্য, ইসলামী ও জামায়াত ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নে বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ সংগঠনের ভূমিকা সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

---

৩১২. নিজস্ব জরিপ

৩১৩. ঐ

সংগঠন হিসেবে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ প্রধানত মুসলমানদের মধ্যে কাজ করলেও বাংলাদেশের অমুসলিম অধিবাসীদেরকেও জামায়াত তার সংগঠনের সঙ্গে সংযুক্ত করতে চায়। আদর্শগত কারণে ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী নয়– এমন কাউকে পূর্ণাঙ্গ সদস্যপদ দান জামায়াতে ইসলামীর সংগঠনের পক্ষে সম্ভব নয়। কোনো আদর্শবাদী সংগঠন তার আদর্শে অবিশ্বাসীদের সদস্যপদ ও নেতৃত্ব দিতে পারে না। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ নেতারা এ প্রসঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টিতে অকমিউনিস্টদের সদস্যপদ ও নেতৃত্ব না দেওয়ার উদাহরণ দিয়ে থাকেন। বাংলাদেশের অমুসলিমদের সহযোগী সদস্য হিসেবে পাওয়ার জন্য জামায়াতে ইসলামী প্রচেষ্টা চালালেও এক্ষেত্রে খুব একটা সাফল্য আসেনি বলা যায়। তবে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যে একাত্মতা ও সংহতি বর্ধনে জামায়াতে ইসলামী চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সদস্যপদ দানের ক্ষেত্রে মুসলমানদের মধ্যকার বিভিন্ন ফিরকাকে (কেয়ামি-বেকেয়ামি, মাযহাবে বিশ্বাসী বা আহলে হাদিস ইত্যাদি) জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ বিবেচনায় আনে না। দুই ভিন্নমুখী শিক্ষা (আধুনিক ও ধর্মীয়) গ্রহণের ফলে বাংলাদেশের শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে দীর্ঘদিন থেকে যে মানসিক বিভাজন বিদ্যমান আছে, তা দূরীকরণেও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ সংগঠন সচেষ্ট। বর্তমানে এ সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ে উভয় শিক্ষাধারী মুসলমানরা একসঙ্গে কাজ করছেন।

সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ সংগঠনের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব আমীরে জামায়াত ও কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার অধিকাংশ সদস্য নির্বাচিত হন। জামায়াতে ইসলামীর সংগঠনের সকল স্তরে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়িত করে। সদস্য সম্মেলন জামায়াতে ইসলামীর সংগঠনের মৌলিক নীতিমালা প্রণয়ন করে। এ সম্মেলনে যেকোনো সদস্য যেকোনো বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন ও আলোচনা করতে পারেন। এভাবে সংগঠনের নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন কার্যক্রমে জামায়াতের সকল সদস্য অংশগ্রহণ করতে পারেন। দেশের মানুষকে রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার জন্য আগ্রহী করে তুলতে জামায়াতে ইসলামী এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনসমূহ নানাভাবে চেষ্টা চালাচ্ছে। বাংলাদেশের জনগণের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্যও জামায়াতে ইসলামী বিভিন্নভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ একটি সুশৃঙ্খল সংগঠন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জামায়াতে ইসলামীর ক্যাডারগণ সংগঠনের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে মোটামুটি নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেন বলা যায়। বাংলাদেশের প্রায় সকল বড়ো বড়ো রাজনৈতিক সংগঠনে বিভক্তি এলেও জামায়াতে ইসলামীতে এখন পর্যন্ত কোনো বিশেষ বিভক্তি আসেনি। এ সংগঠনে আভ্যন্তরীণ কোন্দলও তুলনামূলকভাবে অনেক কম বলে মনে করা হয়। ঐক্য ও সংহতি রক্ষা, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীবাহিনী সৃষ্টি এবং এ কর্মীবাহিনীকে সংগঠনের আদর্শ-উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন কাজে ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্যান্য সংগঠনের তুলনায় জামায়াতে ইসলামীর সাফল্য বেশি বলে ধারণা করা যায়। রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। শক্তিশালী ও সুশৃঙ্খল সংগঠন হিসেবে জামায়াতে ইসলামী ইতোমধ্যেই পরিচিতি লাভ করেছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নে এ সুশৃঙ্খল সংগঠনটি ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।

এ অধ্যায়ের পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, ব্যক্তিক সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রমণের জন্য প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ সংগঠিত হওয়ার জন্য চেষ্টা করেছে। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের সংগঠন গড়ে তুলেছে। আধুনিক যুগের প্রায় সকল মানবিক কর্মকাণ্ডই সংগঠনকেন্দ্রিক বলা যায়। বর্তমান যুগের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রধানত রাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমেই পরিচালিত হয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলই সরকার গঠন করে। সরকারের গৃহীত নীতির বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করে বিরোধী রাজনৈতিক দল সরকারকে সঠিক পথে পরিচালিত হতে চাপ দেয়। রাজনৈতিক দল জনগণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক দলের কর্মপ্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। সদস্যপদ প্রাপ্তি, সদস্যদের যোগ্যতা, নেতার ক্ষমতা, সংগঠনের আদর্শ, সমর্থন ভিত্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে পার্থক্যের ভিত্তিতে রাজনৈতিক সংগঠনকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। রাজনৈতিক দল সম্পর্কিত তত্ত্বগত ধারণার সঙ্গে প্রয়োগের পার্থক্য দেখা যায়। তত্ত্বগত ধারণা যা-ই হোক না কেন, প্রায় সকল রাজনৈতিক সংগঠন মূলত মুষ্টিমেয় লোকের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়তে বাধ্য হয়। সকল আধুনিক রাজনৈতিক সংগঠন সামাজিক পরিবর্তন ও রাজনৈতিক উন্নয়নে নানাভাবে ভূমিকা পালন করে। শক্তিশালী ও সুসংগঠিত রাজনৈতিক সংগঠন রাজনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখতে পারে।

কুরআন, হাদিস ও বিভিন্ন ইসলামী চিন্তাবিদের রচনায় নানাভাবে সংগঠনের কথা বলা হয়েছে। ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য হযরত মুহাম্মাদ সা. ইসলামী সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পর ইসলামী সংগঠন রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। রাজতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তন পর্যন্ত এ ব্যবস্থা অব্যাহত ছিল। ইসলামী রাষ্ট্রে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার প্রশ্নে মুসলিম পণ্ডিতগণ একমত হতে পারেননি। প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক দলব্যবস্থা ইসলামসম্মত কিনা– এ প্রশ্নেও মুসলিম পণ্ডিতরা মতৈক্য পোষণ করেন না। দলব্যবস্থার সমর্থকদের বক্তব্য হচ্ছে– ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলমানদের অবশ্যই দল বা সংগঠনভুক্ত হতে হবে। তবে সাহাবাদের সময়ের 'আল-জামায়াত' ব্যবস্থা যেহেতু বর্তমানে নেই, সে কারণে বর্তমান যুগের মুসলমানদের এমন সংগঠন বেছে নিতে হবে, যে সংগঠন তুলনামূলকভাবে সাহাবাদের আদর্শের বেশি অনুসারী। তবে সাহাবাদের সংগঠনের বেশি অনুসারী সংগঠন নির্ধারণের অকাট্য কোনো ব্যবস্থা নেই বলে একই সমাজ বা দেশে একাধিক ইসলামী দল বা সংগঠন কাজ করতে পারে। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ইসলাম সংগঠনের ওপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। সংগঠন গড়ার উদ্দেশ্য, কার্যক্রম, প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক দলব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কিত আধুনিক পাশ্চাত্য ধারণার সঙ্গে ইসলামী ধারণার পার্থক্য রয়েছে। এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে, প্রায় চৌদ্দশত বছর পূর্বে বর্তমান মধ্যপ্রাচ্যে ইসলামের আবির্ভাব ও বিকাশ ঘটে। তাই সংগঠন বিশেষত রাজনৈতিক দলের সংগঠন সম্পর্কিত আধুনিক ধারণার সঙ্গে এ সম্পর্কিত ইসলামী ধারণার পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র মতে ইসলাম মূলত একটি আন্দোলন। এ আন্দোলনকে সফল করার জন্য আল্লাহর নির্দেশে হযরত মুহাম্মাদ সা. ইসলামী সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। এ সংগঠনের প্রচেষ্টার ফলেই মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তৎকালীন ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে ইসলামী সংগঠন একীভূত হয়ে যায়। রাষ্ট্রই তখন ইসলামী সংগঠনের কার্যাবলি সম্পন্ন করত বিধায় স্বতন্ত্র ইসলামী সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়নি। ইসলামী আদর্শানুসারী রাষ্ট্রব্যবস্থা অবলুপ্তির পর সেটি পুনরায় প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী সংগঠন গড়ে তোলা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র মতে, ইসলামী সংগঠনের প্রকৃত মডেল হচ্ছে হযরত মুহাম্মাদ সা. প্রতিষ্ঠিত

ইসলামী জামায়াত। এ মডেলকে সামনে রেখে পরবর্তীকালের ইসলামী সংগঠন পরিচালনা করতে হবে। 'আল-জামায়াত' ও একটি মুসলিম দেশে একাধিক ইসলামী সংগঠনের অবস্থান সম্পর্কিত পূর্বোক্ত ইসলামী ধারণা জামায়াত অনুমোদন করে।

জামায়াতের মতে, ইকামতে দ্বীনের আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য মুসলমানদের অবশ্যই ইসলামী সংগঠনভুক্ত হতে হবে। ইসলামী সংগঠনভুক্ত কোনো মুসলমান কেবল উৎকৃষ্টতর ইসলামী সংগঠনে যোগদানের উদ্দেশ্যেই প্রথমোক্ত সংগঠন ত্যাগ করতে পারেন। বাংলাদেশে ইকামতে দ্বীনের কাজে নিয়োজিত সংগঠনসমূহের মধ্যে জামায়াতে ইসলামী নিজেকে শ্রেষ্ঠতম বলে দাবি করে। সমালোচকদের মতে, ইকামতে দ্বীনের ধারণা ব্যবহার করে জামায়াতে ইসলামী মুসলমানদেরকে তার সংগঠনের দিকে আকৃষ্ট করতে চায়। অন্যদিকে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠতম ইকামতে দ্বীনের সংগঠন বলে নিজেকে দাবি করে জামায়াতে ইসলামী তার সদস্যদের সংগঠন ত্যাগ (অনৈসলামিক কাজ বলে প্রতীয়মান করে) ঠেকাতে চায়।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র সকল সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। কোনো নেতাকেই সমালোচনার উর্ধ্বে মনে করা হয় না। সাংগঠনিক শৃঙ্খলা রক্ষার ওপর জামায়াতে ইসলামী বিশেষভাবে জোর দেয়। কেবল সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি নয়; সদস্যদের গুনগত মান বৃদ্ধির জন্যও জামায়াতে ইসলামীর তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। সার্বক্ষণিক নেতা-কর্মীদের ব্যয়ভার জামায়াত বহন করে। জামায়াত তার কর্মীদের সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানসমূহের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত করে চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসেবেও কাজ করতে চায় বলে ধারণা করা হয়।

জামায়াতে ইসলামীর মতে– ইসলাম কেবল একটি ধর্ম নয়; ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। জীবনব্যবস্থা হিসেবেই জামায়াতে ইসলামী ইসলাম বাস্তবায়ন করতে চায়। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ঘোষিত চার দফা কর্মসূচি উপরিউক্ত লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রণীত হয়েছে বলে দাবি করা হয়।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ঘোষিত চার দফার প্রথমটি হচ্ছে আহ্বান ও প্রচার। জনগণের নিকট সংগঠনের বক্তব্য পৌঁছানোর জন্য জামায়াত বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পাঠাগার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা ও

পরিচালনার মাধ্যমে জামায়াত জনগণের নিকট তার সংগঠনের বক্তব্য পৌঁছাতে চায়। ইসলামী আদর্শানুসারী একটি লেখকগোষ্ঠী তৈরিতে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ সফল হয়েছে বলা যায়। এ সংগঠনের অনেক নেতা-কর্মী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার পাশাপাশি লেখালিখির দায়িত্বও পালন করছেন। বাংলাদেশের অন্য যেকোনো রাজনৈতিক সংগঠনের তুলনায় জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনসমূহের বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকাসহ বিভিন্ন ধরনের প্রকাশনা অনেক বেশি। জামায়াতের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনসমূহের প্রত্যেকটি দপ্তর পাঠাগার ও বই বিক্রয় কেন্দ্ররূপেও কাজ করে। ইসলামী আদর্শানুসারী সংস্কৃতি চর্চার জন্য জামায়াত সারাদেশে বিভিন্ন নামে অনেকগুলো সংগঠন গড়ে তুলেছে। মসজিদসহ অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে জামায়াতে ইসলামী তার দাওয়াত ও তাবলিগের কাজে ব্যবহার করতে চেষ্টা করে।

সংগঠন ও প্রশিক্ষণ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র দ্বিতীয় দফা কর্মসূচির মূল বিষয়। ক্যাডারভিত্তিক সংগঠন জামায়াতে ইসলামীর সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আমীরে জামায়াতের হাতে কেন্দ্রীভূত। জামায়াতের নীতি নির্ধারণী সংস্থা কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা নির্বাচিত ও মনোনীত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হয়। আমীরে জামায়াত কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের সাহায্যে কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার গৃহীত নীতিমালা বাস্তবায়ন করে। দেশের মন্ত্রিসভার আদলে কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ গঠিত হয়। অধস্তন সংগঠনের আমীর-নায়েমগণ আমীরে জামায়াতের প্রতিনিধি হসেবে কাজ করেন। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র মহিলা বিভাগ আমীরে জামায়াত এবং তাঁর প্রতিনিধিরা পরিচালনা করেন।

প্রধানত কেন্দ্রীয় জামায়াতের পরিকল্পনা অনুসরণে অধস্তন জামায়াতের পরিকল্পনা প্রণীত ও বাস্তবায়িত হয়। উর্ধ্বতন সাংগঠনিক স্তরের পরামর্শ অনুসারে অধস্তন সাংঠনিক স্তরের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। অধস্তন সংগঠনের কর্মকাণ্ডের রিপোর্ট উর্ধ্বতন সংগঠনের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে কেন্দ্রে প্রেরিত হয়। এভাবে সমগ্র সাংগঠনিক পক্রিয়ার ওপর কেন্দ্র তথা আমীরে জামায়াতের নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে। সংগঠন ও প্রশিক্ষণ পর্যায়ে জামায়াত নিয়মিত বিভিন্ন ধরনের বৈঠক, প্রশিক্ষণ শিবির, সাংগঠনিক সপ্তাহ বা পক্ষ ইত্যাদি আয়োজন করে। জামায়াতে ইসলামীর নেতা-কর্মীদের ধর্মীয়, নৈতিক ও রাজনৈতিক মান বর্ধন ও সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে এসব কর্মসূচি পালিত হয়।

সাংগঠনিক এবং সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য জামায়াতে ইসলামী বায়তুলমাল সংগ্রহের ওপর বিশেষভাবে জোর দেয়। জামায়াতের প্রত্যেক সদস্যকে নির্ধারিত হারে নিয়মিতভাবে বায়তুলমালে চাঁদা জমা দিতে হয়। সদস্য নন, এমন কর্মীদেরও তাঁদের আয়ের একটি অংশ সংগঠনকে প্রদান করতে হয়। এ ছাড়া সমাজসেবামূলক কার্যক্রমের ব্যয়ভার বহনের জন্য জামায়াতের বায়তুলমাল বিভাগ যাকাত, সদাকা ইত্যাদি গ্রহণ করে থাকে। জামায়াতের সকল সম্পত্তির আয়ও এ বিভাগ কর্তৃক রক্ষিত হয়।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র তৃতীয় দফা কর্মসূচির মূল বিষয় হচ্ছে সমাজ সংশোধন ও সংস্কার। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পাঠাগার, চিত্তবিনোদন, শরীর চর্চা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান গড়া ও পরিচালনার মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামী তার সমাজ সংশোধন ও সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার দূর করা এবং অনৈসলামিক সংস্কৃতি রোধে জামায়াতের বিভিন্ন কর্মসূচি রয়েছে। দুঃস্থজনের সেবাকে জামায়াত ইবাদত বলে বিবেচনা করে। সমাজসেবার লক্ষ্যে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ অনেকগুলো প্রকল্প পরিচালনা করছে।

সরকার সংশোধন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র চতুর্থ দফা কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করে সরকারব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে চায় জামায়াত। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য জনমত গঠন ও নির্বাচনে অংশগ্রহণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে জামায়াতে ইসলামী।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নে জামায়াতে ইসলামী সংগঠনের ভূমিকা রয়েছে। এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যকার নানা মতভেদ ও ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে এঁদের মধ্যে একাত্মতা ও সংহতি বর্ধনে জামায়াত প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। অমুসলিম সংখ্যালঘুদেরকে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ সহযোগী সদস্যপদ দিয়ে থাকে। তবে এক্ষেত্রে জামায়াতের সাফল্য যথেষ্ট নয় বলা যায়।

আমীরে জামায়াত এবং নীতি-নির্ধারণী সংস্থা কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার অধিকাংশ সদস্য জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। জামায়াতের সাংগঠনিক সিদ্ধান্তসমূহ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই প্রধানত গৃহীত হয়। বাংলাদেশের মানুষ বিশেষত সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মীয়

সম্প্রদায়ের মানুষকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করতে জামায়াতের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনসমূহ চেষ্টা চালাচ্ছে।

বাংলাদেশের প্রায় সকল বড়ো বড়ো রাজনৈতিক সংগঠনে নানাভাবে বিভাজন এলেও জামায়াতে ইসলামীতে এখনও পর্যন্ত বড়ো ধরনের কোনো বিভক্তি আসেনি। জামায়াতে ইসলামী তার সুশৃঙ্খল কর্মীবাহিনী ও সুদৃঢ় সাংগঠনিক শক্তিকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে ভালোভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হলে এক্ষেত্রে ইতিবাচক ফল পাওয়া যেতে পারে।

ইসলাম সংগঠনের ওপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করলেও এর সূচনা ও বিকাশকালীন মধ্যযুগে বর্তমান যুগের সমরূপ রাজনৈতিক দল বা সংগঠন গড়ে ওঠেনি। মাওলানা মওদূদী ও অন্যান্য জামায়াতনেতা আধুনিক যুগের উপযোগী একটি ইসলামী সংগঠন গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছে। রাজনৈতিক দল বা সংগঠন সম্পর্কিত আধুনিক পাশ্চাত্য ধারণার সঙ্গে এ সম্পর্কিত জামায়াত ধারণা অনেক ক্ষেত্রেই তাই সাদৃশ্যপূর্ণ মনে হবে না। পাশ্চাত্য সমাজবিজ্ঞানীগণ রাজনৈতিক দলের যেসব শ্রেণিবিভাগ করেছেন, সেগুলোর কোনো একটিতেও জামায়াতে ইসলামীকে সরাসরি অন্তর্ভুক্ত করা সংগত হবে না বলা যায়। জামায়াতকে সাধারণত ক্যাডার পার্টি বলে ধারণা করা হয়। কিন্তু ক্যাডারের যোগ্যতা, কার্যাবলি ইত্যাদি সম্পর্কিত পাশ্চাত্য ধারণার সঙ্গে এ সম্পর্কিত জামায়াত ধারণায় পার্থক্য রয়েছে।

ইসলামী আদর্শানুসারী সংগঠন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ সাংগঠনিক ঐক্য ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বিশেষভাবে চেষ্টা করে। অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনসমূহের ওপরও জামায়াতে ইসলামী সুদৃঢ় নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে চায়। এ কারণে জামায়াতের নেতাগণই সাধারণত এসব অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনসমূহের মূল নেতৃত্বে আসীন থাকেন।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ তার সংগঠনকে ধর্মীয় মর্যাদার অধিকারী বিবেচনা করে বলে এ সংগঠনের প্রতি নেতা-কর্মী-অনুসারীদের আনুগত্য বেশি হয়ে থাকে। এ জাতীয় আদর্শবাদী সংগঠন স্বাধীন চিন্তার বিকাশে সাধারণত খুব বেশি সহায়ক হয় না। বলা হয়, ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাই ইসলামী সংগঠনের লক্ষ্য। ইসলামী আদর্শানুসারী সংগঠনসমূহ কর্তৃক তার সদস্যদের সমগ্র জীবনকে নানাভাবে

প্রভাবিত করতে চাওয়া তাই অস্বাভাবিক নয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশসহ সকল ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকামী সংগঠনকে সর্বাত্মকবাদ প্রভাবিত সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

*****

চতুর্থ অধ্যায়

জামায়াত আদর্শ

ইউরোপীয় রেনেসাঁ বিশেষত ফরাসি বিপ্লবের সময় থেকে 'আদর্শ' পদবাচ্যটি আলোচনায় আসতে শুরু করে। এ সময় বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞানকে আদর্শ বলে মনে করা হতো। ১৭৯৬ খ্রিষ্টাব্দে ফরাসি দার্শনিক অ্যান্টনি ডেস্টাট দি ট্রাসি (১৭৫৪-১৮৩৬) আদর্শ পদবাচ্যটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন বলে ধারণা করা হয়। দি ট্রাসি মানুষের চিন্তা-ভাবনার মহৎ বিজ্ঞানরূপে আদর্শকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। উৎকৃষ্ট সামাজিক নীতিমালা প্রণয়ন, মানুষের নাগরিক গুণাবলির উৎকর্ষ বর্ধন প্রভৃতির উৎস হিসেবে তিনি আদর্শকে দেখতে চেয়েছিলেন।[৩১৪] কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আদর্শ পদবাচ্যটি অচিরেই সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা শুরু হয়। কল্পনা, অবাস্তবতা, মতান্ধতা, অনিরপেক্ষতা ইত্যাদির সঙ্গে আদর্শ পদবাচ্য ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে।[৩১৫]

আদর্শ : পাশ্চাত্য ধারণা

ডেভিড ইস্টনের মতে, আদর্শ হচ্ছে ধারণা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কিত নীতিমালার গ্রন্থণা– যা অতীতকে পর্যালোচনা এবং বর্তমানকে ব্যাখ্যার মাধ্যমে ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা পেতে সংগঠনের সদস্যদের সহায়তা করে।[৩১৬] টাওয়ার লেম্যানের ধারণায় আদর্শ হচ্ছে এমন এক মূল্যবোধ অথবা

---

৩১৪. দেখুন, Robert Eccleshall *et. al., Political Ideologies* (London, Hutchinson), pp. 24-25

৩১৫. *Ibid*

৩১৬. David Easton, *A System Analysis of Politecal Life* (New York, John Wiley and Sons, 1965), p. 290

বিশ্বাসব্যবস্থা– যা কিছুসংখ্যক মানুষ বা কোনো গোষ্ঠী সত্য বলে গ্রহণ করে নেয়। পৃথিবীটা বর্তমানে কীরূপ এবং এটি কীরূপ হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে আদর্শ এক ধরনের চিত্র তুলে ধরে। আদর্শ জটিল বিশ্বকে সহজ এবং বোধগম্য করে বিশ্বাসীদের নিকট উপস্থাপন করে।[৩১৭] মানুষের মূল্যবোধ সাধারণত আদর্শ প্রভাবিত হয়ে থাকে। সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতেও আদর্শ সহায়ক হয়।[৩১৮]

মূল্যবোধ, বিশ্বাস ইত্যাদি বিষয়ে কাছাকাছি দৃষ্টিভঙ্গি পোষণে সহায়তা করে আদর্শ সমাজকে সুস্থিত ও সুসংহত হতে সাহায্য করে। আবার পরস্পরবিরোধী আদর্শ সমাজে দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টিতে সহায়ক হয়। একটি বিশেষ আদর্শের অন্ধ অনুসারীরা নতুন আদর্শ বা ধারণার উৎপত্তি ও বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে।[৩১৯] সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ সাধারণত আদর্শকে সত্য জ্ঞান করে গ্রহণ করে নেয়।[৩২০] এ কারণে শাসকশ্রেণি তাঁদের শাসনের যথার্থতা প্রমাণার্থে নীতি, ধর্ম, দর্শন, আইন তথা আদর্শের সাহায্য গ্রহণ করে।[৩২১] ধর্মীয় আদর্শ সমাজের সদস্যদের নানাভাবে শক্তি ও সাহস জোগায় এবং জীবনের অর্থ খুঁজে পেতে সহায়তা করে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রেও ধর্মীয় আদর্শ সহায়ক হয়।[৩২২]

---

৩১৭. Sargent Tower Layman, *Contemporary Political Ideologies* (Illinois, The Dorsey Press, 1981), p. 3. আদর্শের আরও সংজ্ঞা রয়েছে, Rotert E. Lane, *Political Ideology: Why the Amaerican Common Man Believe what he does* (New Yourk, The Free Press, 1968), pp. 13-14. Leon P. Baradat, *Political Ideologies: Their Origins and Impact* (New Jersey, Prentice Hall Inc., (1979), pp. 46-47

৩১৮. Maurice Duverger, *The Idea of Politics* (New York, The Bobbes Merill co. Inc., 1866), p. 78

৩১৯. দেখুন, Reo M. Christenson, *et. al., Ideologies and Modern Politics* (Nairobi, Keneya, Nelson, 1972), pp. 17. 29-30

৩২০. A. V. Decey, *Law and Public Opinion* (New York, The Macinllan, 1926), p. 20

৩২১. G. Mosca, *The Ruling Class, op. cit.*, p 71

৩২২. Richard T. Lapiere, *Social Change* (New York, McGraw Hill Book Co., 1965), p. 302

স্থিতিশীলতা ও বৈধতা আনয়নের ক্ষেত্রেও ধর্মীয় আদর্শের ভূমিকা রয়েছে।[৩২৩] তবে ধর্মবিশ্বাসের পার্থক্য যে সমাজে বেশি, সে সমাজে ধর্ম ও রাজনীতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নানা জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। যে সমাজে ধর্মবিশ্বাসের সামঞ্জস্য রয়েছে, সে সমাজ সাধারণত স্থিতিশীল হয়।[৩২৪]

রাজনৈতিক আদর্শ হচ্ছে রাজনৈতিক লক্ষ্য অথবা সরকারি কর্মকাণ্ড এবং কখনও কখনও সঠিক সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পর্কিত মৌলিক বিশ্বাস ও নীতিমালার সমষ্টি।[৩২৫] রবার্ট ই লেন নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যাবলির আলোকে রাজনৈতিক আদর্শকে দেখতে চেয়েছেন। ১. কে বা কারা শাসক হবেন, কীভাবে শাসক বাছাই করা হবে এবং শাসক কী নীতিমালার ভিত্তিতে শাসন করবেন। ২. একটি বিশেষ আদর্শ অনুসরণ এবং ঐ আদর্শের বিরুদ্ধমতের বিরোধিতা। ৩. অনুসারীদের মূল্যবোধকে প্রভাবিত করা। ৪. গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ রক্ষা, সংস্কার অথবা বিলোপের জন্য রাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ। ৫. গোষ্ঠী বিশেষের স্বার্থরক্ষার যৌক্তিকতা প্রমাণে সহায়তা করা। ৬. রাজনৈতিক আদর্শ আদর্শবাদ, নৈতিকতা ইত্যাদির প্রভাবেও প্রভাবিত হয়ে থাকে।[৩২৬] আদর্শের সঙ্গে অনুসারীর একটি আবেগতাড়িত সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক আদর্শের অনুসারীরা তাঁদের রাজনৈতিক মতাদর্শে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য সাধারণত নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে। রাজনৈতিক আদর্শ বিশ্বাসীর আচরণ তার বিশ্বাস দ্বারা সরাসরি প্রভাবিত হতে পারে।[৩২৭]

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রবক্তাদের মতে– আদর্শ সামাজিক শ্রেণির সৃষ্টি। বুর্জোয়া সামাজিক সম্পর্ক রক্ষার সুবিধার্থে বুর্জোয়া চিন্তাবিদরা বুর্জোয়া নীতি,

---

৩২৩. Seymour Martin Lipset, 'Value Patterns, Class and Demoeratic Polity: The United States and Great Britain' in R. Bendix and S. M. Lipset eds., *Class, Status, op. cit.,* pp. 170-71

৩২৪. R. R. Alford, 'Religion and Politics' in Roland Robertson ed., *Sociology of Religion* (Middlesex, England, Penguin Books, 1971), p. 321

৩২৫. William H. Flanigan and Nancy H. Zingale, *Political Behavior of the American Electorate* (Boston, Allyn and Bacon, Inc., 1979), p. 117

৩২৬. Roert E. Lane, *op. cit.*, pp. 14-15

৩২৭. Reo M. Christenson *et. al., o. cit.*, p. 6

আদর্শ, ধারণা ইত্যাদি সৃষ্টি করে থাকেন।[৩২৮] মার্কসের সামাজিক শ্রেণি নির্ভর আদর্শ সম্পর্কিত চিন্তাকে অনেকে অতিরঞ্জন বলে মনে করেন। তাঁদের মতে- শ্রেণি স্বার্থ ছাড়াও অন্যান্য উপাদান মানুষকে আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারে। উপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে একটি দেশের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ ঐক্যবদ্ধ হতে পারে।[৩২৯]

আমেরিকানরা তাঁদের ধ্যানধারণা, নীতি ইত্যাদি বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে সাধারণত আদর্শ পদবাচ্যটি ব্যবহার করেন না। যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল তাদের কর্মসূচিকে কখনও আদর্শ হিসেবে দেখাতে চায় না। কিন্তু রাশিয়ানদের ধ্যানধারণা, নীতি ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনাকালে আদর্শ পদবাচ্যটি ব্যবহার করতে আমেরিকানদের আগ্রহ দেখা যায়।[৩৩০] কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, আমেরিকাসহ পশ্চিমা পুঁজিবাদী দুনিয়া আদর্শে বিশ্বাস করে না। শাসকশ্রেণির বিভিন্ন কার্যাবলির বৈধতা দানের উপায় হিসেবে তাঁরা আদর্শকে বিবেচনা করে থাকে।[৩৩১]

এ গ্রন্থের উপক্রমণিকায় বলা হয়েছে যে, বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পশ্চিমা দেশসমূহের রাজনীতিতে আদর্শ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়রূপে বিবেচিত হলেও পঞ্চাশের দশক থেকে নানা কারণে এটির গুরুত্ব ক্রমশ হ্রাস পেতে শুরু করে। ডেভিড অ্যাপ্টারের মতে, পশ্চিমা জগৎ থেকে আদর্শ ও মতান্ধতা অদৃশ্য হচ্ছে। আদর্শের ভাষা পরিবর্তিত হয়েছে।[৩৩২] পশ্চিমা জগতে আদর্শের গুরুত্ব হ্রাস পাওয়ার প্রধান কারণসমূহ হচ্ছে- পরস্পরবিরোধী দাবির মধ্যে সমন্বয় সাধন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও প্রাচুর্য, পরস্পরবিরোধী আদর্শের মধ্যকার দূরত্ব হ্রাস, কল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভব, রাজনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, মিশ্র অর্থনীতি অনুসরণ, রাজনৈতিক বহুত্ববাদের স্বীকৃতি ইত্যাদি।[৩৩৩] পশ্চিমা উন্নত দেশসমূহের রাজনীতিতে আদর্শের ভূমিকা কমে গেলেও উন্নয়নশীল দেশসমূহের

---

৩২৮. দেখুন, কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার', *রচনা সংকলন*, প্রথম অংশ (মস্কো, প্রগতি প্রকাশন, ১৯৭২), পৃ. ৪৪

৩২৯. Maurlce Duverger, *The Idea, op. cit.*, pp. 74-75

৩৩০. Zbignle Brzezinski and Samuel P. Huntington, *Political Power: U.S.A/U.S.S.R.* (New York, The viking Press, 1968), pp. 17-18

৩৩১. দেখুন, Daniel Bell, *op. cit*

৩৩২. David E. Apter, *Ideology and op. cit.*, p. 17

৩৩৩. Reo M. Christenson *et. al., op. cit.*, pp. 297-98

রাজনীতিতে এটি এখনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত হয়। পশ্চিমা প্রভাব বলয় থেকে মুক্তিলাভের জন্য তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহ পশ্চিমে উদ্ভূত বিভিন্ন আদর্শ থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করে এবং স্বদেশীয় বাস্তবতার নিরিখে এগুলোকে ব্যবহার করার প্রয়াস পায়।[৩৩৪] জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা, অগ্রগতি অর্জন, পশ্চাদপদ চিন্তা-ভাবনা ও ব্যবস্থা অপসারণ, আধুনিকায়ন, শাসনক্ষমতার বৈধতা ইত্যাদির জন্য উন্নয়নশীল দেশের রাজনৈতিক নেতাদের বিভিন্ন আদর্শ ব্যবহারে উৎসাহী হতে দেখা যায়।[৩৩৫]

আদর্শ : ইসলামী ধারণা

ইসলাম একটি ধর্ম এবং একটি জীবনব্যবস্থা বলে মুসলমানরা দাবি করে থাকে। আদর্শ বিশেষত রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে ইসলামকে চিহ্নিত করা সংগত হবে কিনা তা নিয়ে মুসলিম পণ্ডিতদের মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে। সৈয়দ হুসাইন নসরের মতে, আদর্শ ধর্ম, দর্শন কিংবা বিজ্ঞান হতে পারে না। ইসলাম ধর্মকে আদর্শ হিসেবে বিবেচনা করা হলে তাতে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে উৎসারিত আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য, বুদ্ধিবৃত্তির গভীরতা, সনাতন ইসলামী গুণাবলি ইত্যাদির অভাব দেখা দিতে পারে। যে গোষ্ঠী ইসলাম ধর্মকে আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করে, সে গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষা এবং তাঁদের লক্ষ্য হাসিলের জন্য ইসলামকে ব্যবহার করার চেষ্টা হয়। পশ্চিমা সভ্যতার ধারায় ইসলামকে আধুনিক করার প্রয়াসও এক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হতে পারে।[৩৩৬]

ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার সমর্থক মুসলমানদের বক্তব্য হচ্ছে– কুরআনে মুসলমানদের ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক তথা গোটা সমাজজীবনে অনুসরণীয় আদর্শ বিধৃত রয়েছে। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ। এ প্রসঙ্গে কুরআনের নিম্নোক্ত বাণীসমূহ তাঁরা প্রধানত উদ্ধৃত করে থাকেন–

...مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ... ﴿٣٨﴾

"আমি কোনো কিছুই আল কুরআনে অবর্ণিত রাখিনি।"[৩৩৭]

---

৩৩৪. Karl Dietrich Bracher, *The age, op. cit.*, p. 260

৩৩৫. C. E. Welch Jr., *Political Modernization, op. cit.*, pp. 319-32

৩৩৬. Seyyed Hossein Nasr, 'Present Tendencies: Future Trends' in Marjorie Kelly, ed., *Islam: The Riligion, op. cit.*, p. 283

৩৩৭. আল কুরআন, সূরা আনআম : ৩৮

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً ...﴿٢٠٨﴾

"হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা ইসলামে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করো।"[৩৩৮]

...اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْاَمْرُ ...﴿٥٤﴾

"সাবধান! সৃষ্টি তাঁরই (আল্লাহরই) এবং বিধান দেওয়ার অধিকারও একমাত্র তাঁরই।[৩৩৯]

...اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ...﴿٥٧﴾

"আল্লাহই একমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।"[৩৪০]

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوْنِ ﴿١٣﴾

"আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার (আদর্শের) আনুগত্য করো।"[৩৪১]

কানযুল উম্মাল কিতাবের মতে–

الإسلام والسلطان أخوان توأمان لا يصلح واحد منهما إلا بصاحبه فالإسلام أس والسلطان حارث. وما لا أس له يهدم وما لا حارث له ضائع.

"ইসলাম ও রাষ্ট্রক্ষমতা যমজ ভ্রাতাস্বরূপ। এর একটি ছাড়া অন্যটি চলতে পারে না। ইসলাম মূলভিত্তি এবং রাষ্ট্র ও সরকার এর প্রহরী। ভিত্তি না থাকলে ইমারত ধসে পড়ে এবং রক্ষক না থাকলে (সম্পদ) লুণ্ঠিত হয়।[৩৪২]

ফিলিপ কে. হিট্টির মতে– ইসলামে ধর্ম, রাজনীতি ও সংস্কৃতি এ তিনটি প্রধান দিক রয়েছে। ইসলামের এ প্রধান দিকগুলো পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।[৩৪৩]

---

৩৩৮. আল কুরআন, সূরা বাকারা : ২০৮

৩৩৯. আল কুরআন, সূরা আরাফ : ৫৪

৩৪০. আল কুরআন, সূরা ইউসুফ : ৪ ও সূরা আনআম : ৫৭

৩৪১. আল কুরআন, সূরা শুআরা : ১৬৩

৩৪২. *কানযুল উম্মাল* থেকে উদ্ধৃত, অধ্যক্ষ আবদুর রাজ্জাক, *ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য ও আদর্শ* (ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৯৮৭), পৃ. ৬

৩৪৩. P. K. Hitti, *Islam: A Way of Life* (minneapolis, University of Minnesota Press, 1970), pp. 2-3

ইবনে তাইমিয়ার মতে, রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা ইসলামের সর্বপ্রধান দায়িত্ব। রাষ্ট্র ছাড়া ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। জিহাদ, ইনসাফ, আইন, শাসন প্রভৃতি যেসব কাজ ইসলামে ওয়াজিব বিবেচনা করা হয়, তা রাষ্ট্রশক্তি ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ব্যতীত কিছুতেই সম্পন্ন হতে পারে না।[৩৪৪] ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যার প্রশ্নে বিতর্ক থাকলেও আহলে সুন্নাত আল-জামায়াতের সকল গোষ্ঠী, শিয়া, খারেজিসহ সকলে এ বিষয়ে একমত যে, খলিফা নিয়োগ করা ওয়াজিব এবং যে খলিফা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদর্শ অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন, তাঁর অনুসরণ করাও ওয়াজিব।[৩৪৫] মহান আল্লাহ মানবজীবনের বিভিন্ন সমস্যার আদর্শ সমাধান কুরআনে নির্দেশ করেছেন। হযরত মুহাম্মাদ সা. আল্লাহ-নির্দেশিত আদর্শাবলি বাস্তবে রূপায়িত করেছেন। মদিনায় হিজরতের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে হযরত মুহাম্মাদ সা.-এর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। পরবর্তীকালে 'মদিনাচুক্তি' দ্বারা তিনি একটি নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[৩৪৬] পৃথিবীর ইতিহাসে এটিই প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র। ইসলামের সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত আদর্শসমূহ কোনো জাতির জীবনে সক্রিয়ভাবে প্রয়োগ এবং রাষ্ট্রীয় সংবিধানে সেগুলো অন্তর্ভুক্ত হলে ঐ রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্র বলা যায়।[৩৪৭] ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালিত হয়।

ইসলামের রাজনৈতিক আদর্শের নানা দিক নিয়েও মুসলিম পণ্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। সময় ও দেশ ভেদে মতানৈক্যের ধরন ও মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু ইসলাম ও রাজনীতির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের প্রশ্নে মুসলিম পণ্ডিতদের প্রায় সবাই ঐকমত্য পোষণ করেছেন। বিন্নাজ টোপারকের মতে– শুরু থেকেই ইসলাম একটি সামাজিক ধর্ম, যার রয়েছে সামাজিক আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য নৈতিক বিধিমালা। ইসলাম একটি রাজনৈতিক ধর্ম, যা একই সঙ্গে বিশ্বাসী সম্প্রদায়কে একত্রিত ও পরিচালনা করেছে। ইসলাম একটি আইন-বিষয়ক ধর্ম, যেটি একাধিক বৈধ নিয়মকানুন প্রদান করেছে– যা পরবর্তীকালে ইসলামী আইন হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।[৩৪৮]

---

৩৪৪. উদ্ধৃত, ড. আবদুল করিম জায়দান, *ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা* (ঢাকা), আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৭৯), পৃ. ৩-৪

৩৪৫. অধ্যক্ষ আবদুর রাজ্জাক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০

৩৪৬. W. Montogommery Watt, *Islamic Political Thought*, *op. cit.*, p. 4

৩৪৭. মুহাম্মাদ আসাদ, ইসলামে রাষ্ট্র, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২

৩৪৮. Binnaz Topark, *op. cit.*, p. 22

ইসলামকে পশ্চিমা অর্থে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হোক বা না হোক, বিভিন্ন মুসলিম প্রধান দেশের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের আন্দোলন রয়েছে। মুসলিম পণ্ডিতদের কারও কারও আপত্তি সত্ত্বেও ইসলাম কার্যত রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। মিশরের ইখওয়ানুল মুসলিমিন, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের জামায়াতে ইসলামী, তুরস্কের মিল্লি সালামত পার্টি, মালয়েশিয়ার ইসলামিক পার্টি, আলজেরিয়ার ইসলামিক সলভেশন ফ্রন্ট ইত্যাদি স্ব-স্ব দেশে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন পরিচালনা করছে। মুসলিমপ্রধান দেশসমূহে পাশ্চাত্য গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি আদর্শ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনও দেখা যায়। এসব পাশ্চাত্য আদর্শের মোকাবিলা করে ইসলামকে আদর্শ হিসেবে টিকে থাকতে হচ্ছে।

আদর্শ : জামায়াত ধারণা

জামায়াত ইসলামকে একটি বিপ্লবী আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছে।[৩৪৯] অধ্যাপক গোলাম আযমের মতে, ইসলাম কেবল কতগুলো উপাসনা ও আচার-অনুষ্ঠানের ধর্ম নয়। জীবনের বিভিন্ন কাজ কীভাবে সম্পাদন করলে মানুষ এ দুনিয়া ও পরকালে শান্তি এবং মুক্তি পাবে, সে বিষয়ে মহান আল্লাহ্ তাঁর রাসূল মারফত যে নিয়মকানুন প্রদান করেছেন, তারই নাম ইসলাম। ইসলামে ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতিসহ জীবনসংশ্লিষ্ট সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।[৩৫০] মাওলানা মওদূদীর মতে, ইসলাম কোনো অসংলগ্ন চিন্তাধারা ও আচরণবিধি নয়; বরং এটি সুস্পষ্ট নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা একটি সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা এবং একটি সংগতিপূর্ণ সমগ্র (whole)।[৩৫১]

---

৩৪৯. দেখুন, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *ইসলামী বিপ্লবের পথ*, *পূর্বোক্ত*। আরও দেখুন, *তাফহীমুল কুরআন*, ২য় খণ্ড (ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৭৮), পৃ. ১৫-১৬। কলিম বাহাদুরের মতে– 'Mawdudi's Policical Thought is derived from his attempt to construct an Islamic system from the idea of early Islam. This system has been given the form of an ideology'. *The Jamaat-e-Islami of Pakistan, op. cit.*, p. 173

৩৫০. গোলাম আযম, *বাংলাদেশে আদর্শের লড়াই* (ঢাকা, আবদুল্লাহিল মামুন আল-আযামী কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৮৮), পৃ. ১৫

৩৫১. Sayyid Abul Ala Maududi, *The Islamic Law, op. cit.*, p. 125

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র গঠনতন্ত্রে বলা হয়েছে–

> বাংলাদেশ তথা সারা বিশ্বে সার্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠা ও মানবজাতির কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল সা. প্রদর্শিত দ্বীন (ইসলামী জীবনবিধান) কায়েমের সর্বাত্মক প্রচেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালীন সাফল্য অর্জন করাই জামায়াতে ইসলামী বাংলদেশ-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।[৩৫২]

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ঘোষিত 'ইসলামী বিপ্লবের ৭ দফা গণদাবি'তে বাংলাদেশে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে।[৩৫৩] এ গ্রন্থের পূর্ববর্তী অধ্যয়সমূহে নেতৃত্ব ও সংগঠন বিষয়ক আলোচনায় জামায়াত আদর্শের নানা দিকও আলোচনায় এসেছে। পুনরাবৃত্তি পরিহারের স্বার্থে পূর্বালোচিত বিষয়গুলো সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হলো না। রাজনীতিসংশ্লিষ্ট জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র আদর্শের প্রধান দিকগুলো এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

মাওলানা মওদূদী প্রদত্ত ইসলামের ব্যাখ্যাকেই জামায়াত প্রধানত অনুসরণ করে থাকে। মওদূদী রচনাবলিই জামায়াতের আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কিত ধারণার মৌলিক উৎস বলে বিবেচিত হয়।[৩৫৪] গোলাম আযমের মতে– নিম্নোক্ত অবদানসমূহের জন্য জামায়াত মাওলানা মওদূদীকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে থাকে। একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলামকে উপস্থাপন করে একে সঠিক মর্যাদায় তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মুসলমানদের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে বাস্তব জীবনে ইসলাম কায়েম করা– জোরালো যুক্তি প্রদর্শন করে তিনি তা প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। ইকামতে দ্বীনের ডাক দিয়ে উপমহাদেশের মুসলমানদেরকে মাওলানা মওদূদীই প্রথম জামায়াতবদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। আধুনিক পদ্ধতিতে ইসলামী সংগঠন গড়ে তোলার জন্য উপমহাদেশে তিনিই প্রথম সচেষ্ট হন। মওদূদী রচনাবলি এ যুগের ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের প্রেরণাদানে বিশেষ সহায়ক হয়।[৩৫৫]

---

৩৫২. *গঠনতন্ত্র : জামায়াত*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১

৩৫৩. দেখুন, *ইসলামী বিপ্লবের ৭ দফা*, *পূর্বোক্ত*

৩৫৪. John L. Esposito, *Islam and Politics, op. cit.*, p. 144

৩৫৫. গোলাম আযম, *ইকামতে দ্বীন*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৮-৮০

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র মতে–

> আল্লাহর দ্বীনকে কায়েম করার চেষ্টা করা যে ফরয– সে কথা এ উপমহাদেশের মুসলমানদের নিকট মাওলানা মওদূদী বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরেছেন। তাতে যারা সাড়া দিয়েছে, তারাই জামায়াতে ইসলামীর নামে কাজ করছে। উপমহাদেশের বিখ্যাত ও শ্রদ্ধেয় অনেক দ্বীনি ব্যক্তিত্ব ইসলামের অনেক বড়ো বড়ো খেদমত করে গেছেন এবং করছেন। কিন্তু আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার দায়িত্ব ও কর্তব্য (ফরিযায়ে ইকামতে দ্বীন) পালনের জন্য বাস্তব কর্মসূচি নিয়ে মাওলানা মওদূদীই ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। এরই ফলে জামায়াতে ইসলামীর মতো একটি ইসলামী আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছে।[৩৫৬]

গোলাম আযমের মতে, জামায়াত মাওলানা মওদূদীর সকল বক্তব্য অন্ধভাবে অনুসরণ করে না। মওদূদীর যে সকল মতামত কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে গ্রহণযোগ্য, জামায়াত সেগুলোকেই গ্রহণ করেছে। জামায়াতের প্রত্যেক সদস্য ইসলামের মৌলিক গ্রন্থসমূহ থেকে জ্ঞানার্জন করে বিভিন্ন প্রশ্নে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ মতামত নির্ধারণ করতে পারেন। মাওলানা মওদূদীকে জামায়াত ফিকহ বা আকায়িদের ইমাম মনে করে না। তাঁর সকল ইজতিহাদি মতকে মেনে নেওয়াও জামায়াতের নীতি নয়।[৩৫৭]

মাওলানা মওদূদীর মতে– ইসলামী রাজনীতি তাওহিদ (আল্লাহর একত্ব), রিসালাত (নবিত্ব) ও খিলাফত, এ তিনটি মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। আল্লাহই একমাত্র স্রষ্টা, প্রতিপালক এবং প্রভু। তিনি একমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। আল্লাহ তাঁর সৃষ্ট মানুষের জন্য ধর্মগ্রন্থ 'কুরআন' প্রেরণ করেছেন। হযরত মুহাম্মাদ সা. আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে কুরআনের

Charles J. Adams এর মতে– 'Mawdudi, I would argue, is a product of recent muslim history, and his presentation of Islam is not a photographic duplication of the faith of the prophet, but like modernism, a reaction to questions posed by the unique situation of muslim in the modern world. ... Mawdudi bears the modernist in spirit, method and content of thought.' দেখুন, 'The Ideology of Mawlana Mawdudi' in D. E. Smith, ed., *op. cit.*, pp. 394-95

৩৫৬. দেখুন, পরিচিতি : জামায়াত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০

৩৫৭. গোলাম আযম, *ইকামতে দ্বীন*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৬-৭৮

নির্দেশাবলিকে কথা ও কাজের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন এবং বাস্তবায়িত করেছেন। ইসলামী বিধানানুসারে মানুষ আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি। প্রতিনিধি হিসেবে মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত কর্তৃত্ব (আল্লাহ নির্ধারিত) সীমারেখার মধ্যে) প্রয়োগ করে।[৩৫৮] গোলাম আযমের মতে– ইসলাম মানে আনুগত্য, আল্লাহর নিকট পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ। স্রষ্টার নিকট আত্মসমর্পণ করতে বলা হলেও ইসলাম মানুষকে তার ইচ্ছা ও চেষ্টার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা প্রদান করেছে। মানুষ কোন পথে তার ইচ্ছাশক্তি ও প্রচেষ্টাকে নিয়োজিত করবে, তা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে সে স্বাধীন। মানুষ চাইলে তার পূর্বোক্ত স্বাধীনতা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে আল্লাহ যে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন তা অনুসরণ করতে পারে। ইসলাম এক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগের বিরোধী। ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের জন্য মানুষকে আল্লাহর নির্দেশসমূহ বাস্তবায়িত করতে বলা হয়েছে। ইসলামের মতে, সুখ-শান্তি ও উন্নতির জন্য যে সঠিক জ্ঞানের প্রয়োজন তার জন্য মানুষ আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল। আল্লাহ ওহির মাধ্যমে মানুষের জন্য নির্ভুল জ্ঞান প্রেরণ করেন। আল্লাহর প্রত্যাদেশের বাহক হচ্ছেন নবি বা রাসূল। আল্লাহ প্রেরিত নবি বা রাসূল কেবল প্রত্যাদেশের বাহকই নন; তিনি হচ্ছেন মানুষের অনুসরণযোগ্য আদর্শ। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে ধর্মগ্রন্থেরও ব্যাখ্যাদাতা।[৩৫৯]

পরিপূর্ণ জীবনবিধান ইসলাম মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ইসলামে ধর্ম ও রাজনীতি পৃথক বিষয় বলে বিবেচিত হয় না। ইসলামী রাজনীতি ও ইসলামী রাষ্ট্রের লক্ষ্য হচ্ছে– আল্লাহ প্রদত্ত বিধানসমূহের বাস্তবায়ন। কুরআন ও সুন্নাহতে ইসলামের মৌল বিধানসমূহ পাওয়া যায়। ইসলামী রাষ্ট্রের সকল আইন-কানুন কুরআন ও সুন্নাহর মৌলিক বিধানসমূহের অনুসারী হতে হবে। ইসলামী রাষ্ট্রের আইনসভার দায়িত্ব হবে কুরআন ও সুন্নাহর সিদ্ধান্তের আলোকে নাগরিকদের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন।[৩৬০] শরিয়ার কোনো বিষয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মতভেদ দেখা দিলে ইসলামী আইন বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যিক্তিদের সমম্বয়ে গঠিত উপ-কমিটি সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করবে।[৩৬১] ইসলামে আল্লাহর সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করে

---

৩৫৮. Syed Abul Ala Maudoodi, *Islamic Way of Life* (Dhaka, Adhunik Prakashani, 1978), pp. 40-43

৩৫৯. Ghulam Azam, *A Guide to, op, cit.*, pp. 1-3

৩৬০. *Ibid.*, p. 7

৩৬১. Syed Abul Ala Mawdudi, *Islamic Way., op. cti.*, p. 52

বলে পশ্চিমা গণতন্ত্রের সঙ্গে ইসলামী গণতন্ত্রের পার্থক্য রয়েছে।[৩৬২] মানবাধিকার প্রশ্নেও ইসলামের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। ইসলাম মানুষের জীবন রক্ষা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের স্বাধীনতা, ধর্ম পালনের স্বাধীনতা, ব্যক্তি মালিকানা সংরক্ষণের স্বাধীনতাসহ বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের স্বীকৃতি দেয়।[৩৬৩]

ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার ও প্রশাসন পরচালনার ভার একজন নির্বাচিত আমীরের ওপর ন্যস্ত করা হয়। একটি নির্বাচিত শূরা বা উপদেষ্টা পর্ষদ সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে আমীরকে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করেন। জনগণের আস্থার ওপর আমীরের কার্যকাল স্থায়িত্ব নির্ভর করে। মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য ইসলাম স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এ কারণে ইসলাম বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক রাখার পক্ষে মত দিয়েছে। বিচার বিভাগ শরিয়া থেকে কর্তৃত্ব লাভ করে এবং এর সদস্যগণ তাঁদের কাজের জন্য আল্লাহর নিকট দায়ী থাকেন। ইসলামী আদালতের বিচারকগণকে শরিয়ার নির্দেশাবলির আলোকে নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য সম্পাদন করতে হয়। শাসক-শাসিত, মর্যাদাবান-মর্যাদাহীন নির্বিশেষে সবাই ইসলামী আইন এবং ইসলামী আদালতের দৃষ্টিতে সমান বলে বিবেচিত হন।[৩৬৪]

মাওলানা মওদূদী ইসলামী রাষ্ট্রকে আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র বলে অভিহিত করেছেন। কুরআন ও সুন্নাহ অনুসারী ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নই হবে ইসলামী রাষ্ট্রের লক্ষ্য। ইসলামী আদর্শ বিশ্বাসীরাই কেবল এ জাতীয় আদর্শবাদী রাষ্ট্রের শাসক ও পরিচালক পদে আসীন হতে পারেন।[৩৬৫] মাওলানা মওদূদীর মতে, সমাজ গঠন, সমাজ কাঠামো বিনির্মাণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্ষমতা প্রয়োজন। কেবল প্রচারণা দ্বারা ইসলাম প্রবর্তিত সংস্কার ও আদর্শ বাস্তবায়িত হতে পারে না। এ কাজে রাজনৈতিক ক্ষমতার ব্যবহারও প্রয়োজন। এ কারণেই হযরত মুহাম্মাদ সা. মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাতে ক্ষমতাসীন হন।[৩৬৬]

---

৩৬২. *Ibid.*, pp. 43-45

৩৬৩. *Ibid.*, pp. 47-50

৩৬৪. *Ibid.*, pp. 50-52

৩৬৫. Syed Abul Ala Maududi, *Political Theory, op. cit.*, p. 27

৩৬৬. Syed Abul Ala Maududi, *The Islamic Law, op. cit.*, p. 165

ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা অত্যাবশ্যক বলে মনে করা হয়।[৩৬৭] রাষ্ট্র তাই লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নয়; বরং এটি ইসলামী জীবনবিধান বাস্তবায়নে উপায় মাত্র।[৩৬৮] মওদূদীর মতে ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার তথা ইসলামী রাজনীতির মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ হচ্ছে–

১. কোনো ব্যক্তি বংশ, শ্রেণি, দল এমনকি রাষ্ট্রও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নয়; বরং সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর।

২. আল্লাহ্ ব্যতীত কারও আইন প্রণয়নের অধিকার নেই।

৩. কুরআন ও সুন্নাহ অনুসারী আইন বাস্তবায়নই হবে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব।

৪. শাসক ততক্ষণই ক্ষমতায় আসীন থাকার অধিকারী, যতক্ষণ তিনি আল্লাহ্ ও তাঁর নবির অনুগত থাকবেন।

৫. কোনো শাসকই আইন ও সমালোচনার উর্ধ্বে নয়।

৬. মজলিশে শূরার সঙ্গে পরামর্শ করে শাসক রাষ্ট্র পরিচালন করবেন।

৭. শূরার সিদ্ধান্ত সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে গৃহীত হবে।

৮. কোনো দায়িত্বপূর্ণ পদের জন্য কেউ প্রার্থী হতে পারবে না।

৯. মজলিশে শূরায় দলীয় ব্যবস্থা থাকবে না।

১০. বিচার বিভাগ শাসন বিভাগের প্রভাবমুক্ত থাকবে।[৩৬৯]

গোলাম আযমও ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকারের বৈশিষ্ট্যাবলির প্রশ্নে মাওলানা মওদূদীর উপরিউক্ত মতের সমরূপ মত প্রকাশ করেছেন।[৩৭০]

---

৩৬৭. Abdulrahman Abdul Kadir Kurdi, *The Islamic State, op. cit.*, p. 65

৩৬৮. মুহাম্মাদ আসাদ, *ইসলামে রাষ্ট্র*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৭-৩৮

৩৬৯. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮. ৫২, ৫৬। আরও দেখুন, *তাফহীমুল কুরআন*, প্রথম পারা (ঢাকা, মাহবুব প্রকাশনী, ১৯৭৬), পৃ. ১১. *তাফহীমুল কুরআন*, ৩য় খণ্ড (ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮৯), পৃ. ১০৩। *তাফহীমুল কুরআন*, ষষ্ঠাদশ খণ্ড (ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮৯), পৃ. ১৩৫। *তাফহীমুল কুরআন*, উনত্রিশ পারা (ঢাকা, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৮৭), পৃ. ৪-৫

রাষ্ট্র সম্পর্কিত যেকোনো আলোচনায় সার্বভৌমত্ব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত হয়। ইসলামী রাষ্ট্র সম্পর্কিত আলোচনাও এর ব্যতিক্রম নয়। সার্বভৌমত্ব সম্পর্কিত ইসলামী ধারণা আলোচনাকালে কুরআনের নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিসমূহ ব্যবহার করা হয়–

...مَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا يُشْرِكُ فِيْ حُكْمِهٖٓ اَحَدًا ﴿٢٦﴾

"সৃষ্ট মানুষের জন্য তিনি (স্রষ্টা) ছাড়া আর কোনো অভিভাবক নেই। আর তিনি বিধান প্রদানের ক্ষেত্রে কাউকে শরিক করেন না।"[৩৭১]

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ﴿١٨﴾

"তিনি তাঁর বান্দাদের ওপর একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী আর তিনি কৌশলী এবং সকল বিষয়ে অবহিত।"[৩৭২]

تَبٰرَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ﴿١﴾

"তিনি মহান বরকতময়, যাঁর হাতে রয়েছে সকল শাসনক্ষমতা। আর প্রতিটি জিনিসের ওপর তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত।"[৩৭৩]

...وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهٖ... ﴿٤١﴾

"আল্লাহই চূড়ান্ত নির্দেশ দান করেন, তাঁর সে নির্দেশ বাতিল করার ক্ষমতা কারও নেই।"[৩৭৪]

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ ﴿٢٣﴾

"তিনি নিজের কাজের জন্য কারও কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নন; অথচ অন্য সবাইকে জবাবদিহি করতে হবে।"[৩৭৫]

---

৩৭০. গোলাম আযম, *বাংলাদেশে আদর্শের লড়াই*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩২-৩৪

৩৭১. আল কুরআন, সূরা কাহাফ : ২৬

৩৭২. আল কুরআন, সূরা আনআম : ১৮

৩৭৩. আল কুরআন, সূরা মূলক : ১

৩৭৪. আল কুরআন, সূরা রাদ : ৪১

কুরআনের উপরিউক্ত বাণীসমূহ দ্বারা সার্বভৌমত্ব বিষয়ক ইসলামী ধারণা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইসলামের মতে, আল্লাহই একমাত্র আইনপ্রণেতা ও ক্ষমতার উৎস। তিনিই একমাত্র শাসক। তাঁকে কারও নিকট জবাবদিহি করতে হয় না। বিশ্ব মানুষ আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি। মানুষ আল্লাহর আইন পরিবর্তন করতে পারে না। ইসলামী রাষ্ট্রের লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশাবলির ভিত্তিতে শাসনব্যবস্থা কায়েম করা।[৩৭৬] মুসলমান যে ক্ষমতা ভোগ করেন, তা হচ্ছে পরোক্ষ ক্ষমতা। আল্লাহর আমানত হিসেবেই মুসলিম জনগণ সে ক্ষমতা ভোগ করেন। ইসলামী রাষ্ট্র মুসলিম জনগণের ক্ষমতাকে ব্যবহার করে মাত্র।[৩৭৭]

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র মৌলিক আকিদা বিষয়ক ঘোষণা (গঠনতন্ত্রের ধারা ২-এ বর্ণিত) সার্বভৌমত্ব সম্পর্কিত উপরিউক্ত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। জামায়াতে ইসলামীর মতে– আল্লাহই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক এবং সার্বভৌমত্বের অধিকারী। সর্বশেষ নবি হযরত মুহাম্মাদ সা. মারফত মহান আল্লাহ বিশ্বের সকল মানুষের জন্য একমাত্র নির্ভুল হিদায়াত ও জীবনবিধান প্রেরণ করেছেন। এ জীবনবিধান বাস্তবায়নই ছিল নবি মুহাম্মাদ সা.-এর প্রধান সাধনা।[৩৭৮]

মাওলানা মওদূদীর মতে, ইসলাম মানুষকে প্রভুত্বের পরিবর্তে খিলাফতের অধিকার দান করেছে। প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তি মূলত আল্লাহ তায়ালার খলিফা। এটিকে সার্বজনীন খিলাফত বলা যায়। জনগণের মনোনীত শাসকগণ জীবন ও রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে আল্লাহ-প্রদত্ত এখতিয়ার (Delegated powers) প্রয়োগ করতে পারেন।[৩৭৯] তাই রাষ্ট্রশক্তি কখনও সার্বভৌম হতে পারে না। রাষ্ট্র আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতাকে মানবসমাজে প্রতিষ্ঠিত করে।[৩৮০]

---

৩৭৫. আল কুরআন, সূরা আম্বিয়া : ২৩

৩৭৬. Ilyas Ahmad, *Sovereignty: Islamic and Modern* (Karachi, The Allies Book Corporation, 1965), pp. 486-87

৩৭৭. মুহাম্মাদ আসাদ, *ইসলামে রাষ্ট্র*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৭-৪৮

৩৭৮. গঠনতন্ত্র : জামায়াত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮-১০

৩৭৯. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ*, *পূর্বোক্ত*, পৃষ্ঠা ৪৩-৫০

৩৮০. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২-২৩

নবি-রাসূলগণ দুনিয়াতে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের প্রতিনিধিরূপে কাজ করেন। জনগণের নির্বাচিত শাসক নবির প্রতিনিধি হিসেবে আল্লাহর বিধানানুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করলে তিনি মুসলিম জনগণের আনুগত্য দাবি করতে পারেন।[৩৮১] যে রাষ্ট্র ইসলামী শরিয়তের বিধানসমূহ কার্যকর করে, সে রাষ্ট্রই কেবল ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ এবং এ ধরনের বৈধ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে মুসলমানরা বাধ্য থাকবে।[৩৮২] মওদূদীর মতে– ইসলামের সার্বভৌমত্ব নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মুসলমানরা মহান আল্লাহ, তাঁর নবি ও 'উলিল আমর'-এর প্রতি অনুগত হতে বাধ্য। ইসলামী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, বিচারব্যবস্থাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের পরিচালকমণ্ডলী 'উলিল আমর'-এর অন্তর্ভুক্ত। 'উলিল আমর'গণ ইসলামী বিধান অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করলে মুসলিম জনগণ তাঁদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে বাধ্য থাকবেন।[৩৮৩]

সার্বভৌমত্ব সম্পর্কিত মওদূদী ধারণা নানাভাবে সমালোচিত হয়েছে। চার্লস জে অ্যাডামসের মতে– আবুল আ'লা মওদূদী দাবি করেন যে, স্রষ্টার ইচ্ছা ও জনগণের ইচ্ছা উভয়ই সার্বভৌমত্ব সম্পর্কিত ধারণার সঠিক কেন্দ্র হলেও দ্বিতীয়টিকে অবশ্যই প্রথমোক্তটির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হতে হবে। এ বক্তব্য দ্বারা উভয়বিধ উদ্দেশ্য পূরণের ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়েছে– গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণা প্রত্যাখ্যান এবং একই সঙ্গে এর আবেদন ও সুবিধাসমূহ ব্যবহার করা।[৩৮৪]

ফজলুর রহমানের মতে, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব তত্ত্ব উত্থাপন করে মওদূদী নীতিগতভাবে গণতন্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁর মতে, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব একটি আধুনিক ধারণা। এটি শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে আনুগত্য লাভের জন্য ব্যবহৃত হয়। তাই আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ধারণা সঠিক নয়। কারণ, মানুষই আনুগত্য লাভের জন্য এ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে।[৩৮৫]

---

৩৮১. ঐ, পৃ. ২৫-২৬

৩৮২. মুহাম্মাদ আসাদ, *ইসলামে রাষ্ট্র*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৪-৪৫

৩৮৩. Syed Abul Ala Maududi, *The Islamic Law, op. cit.*, pp. 179-80

৩৮৪. Charles J. Adams, 'Maududi and the Islamic State', *op. cit.*, pp. 118-19

৩৮৫. Fazlur Rahman, 'The Islamic Concept of State' in John J. Donohue and John L. Esposito, eds., *Islam in Transition: Muslim Perspective* (New York, Oxford University Press, 1982), pp. 263-64

মদিনার ঘোষণা দ্বারা যেমনি পৃথিবীর প্রথম মুসলিম রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে, তেমনি এ কথাও স্পষ্ট হয় যে, ইসলামী রাষ্ট্রকে আইন ও সংবিধান অনুযায়ী পরিচালিত হতে হবে।[৩৮৬] মাওলানা মওদূদীর মতে– ইসলামী আইন ও সংবিধানের মূল উৎসসমূহ হচ্ছে কুরআন, হাদিস (সুন্নাহ), খুলাফায়ে রাশিদিনের আদর্শ, ইজতিহাদ ও ইজমা।[৩৮৭] আলিমদের একটি অংশের মতে, দশম শতাব্দীর মধ্যে ইসলামী আইন চূড়ান্ত ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছে বলে এরপর আর ইজতিহাদের প্রয়োজন নেই। ইবনে তাইমিয়া, ইবনে হাশেম, আবদুল ওয়াহাবসহ অন্যদের অনুসরণে মুহাম্মাদ ইকবাল, ফজলুর রহমান, মুহাম্মাদ আসাদ প্রমুখ ইসলামী চিন্তাবিদগণ ইজতিহাদ বন্ধকরণ সম্পর্কিত উপরিউক্ত মতামত প্রত্যাখ্যান করেন।[৩৮৮] ইজতিহাদের দ্বার বন্ধ হওয়া সংক্রান্ত আলিমদের মতামতের সঙ্গে মাওলানা মওদূদীও একমত নন। মওদূদীর মতে– কুরআন ও হাদিসে যেসব নির্দেশ স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোকে অপরিবর্তনীয় বিধান বলে মনে করতে হবে। ইসলামী আইনের অন্যান্য দিকগুলোকে যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়। 'তাওয়িল' (ব্যাখ্যা), 'কিয়াস; (সাদৃশ্যতা), 'ইজতিহাদ' (আইনশাস্ত্রবিদদের সুচিন্তিত বিচার) ও 'ইসতিহসান' (ন্যায়বিচার বা জনগণের কল্যাণে সর্বোত্তম শুভচিন্তা)

---

৩৮৬. Abdulrahman Abdul Kadir Kurdi, *The Islamic State, op. cit.*, p. 15

৩৮৭. দেখুন, Syed Abul Ala Mawdudi, *The Islamic Law, op. cit.*, pp. 203-4

৩৮৮. 'According to the general orthodox muslim view, everyhone is now and has been for centuries bound to what has been authoritatively laid down by his predecessor, no one may anylonger consider himself qualified to give a verdict of his own in the field of fikh, in dependent of that of the earlier mudjtahid. ...the fakhis only in the early centuries of Islam has possessed the real perspicuity and sufficient learning to deduce fikh from sources and to form an opinion of their own about it, while this was quite beyond the powers of later generations a view which is only a part of certain aspects of the history of the philosophy in orthodox Islam'. *First Encyclopaedia of Islam 1913-1936,* vol. VIII (Leiden, E. J. Brill, 1987), p. 630. আরও দেখুন, John L. Esposito, 'Muhammad Iqbal and The Islamic State' in his ed., *Voices of Resurgent Islam* (New York, Oxford University Press, 1983), pp. 186-87. Fazlur Rahman, '*The Islamic*', *op. cit.*, p. 262. মুহাম্মাদ আসাদ, ইসলামের রাষ্ট্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮

অনুযায়ী এসব দিক নির্ধারিত হতে পারে।[৩৮৯] মুসলিম জনগণের জ্ঞানী অংশের মধ্যে ঐকমত্য অথবা ব্যাপক মুসলিম জনগণের সমর্থন লাভ অথবা ইসলামী সরকার কোনো বিষয়ের ইজতিহাদলব্ধ সিদ্ধান্তকে আইনরূপে গ্রহণ করে নিলে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ইজতিহাদ আইনে পরিণত হতে পারে।[৩৯০]

মাওলানা মওদূদীর মতে, ইসলামী রাষ্ট্রের আইনসভা নিম্নোক্তভাবে আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করতে পারে–

১. কুরআন ও হাদিসে যে সকল আইন বর্ণিত রয়েছে, তাকে আরও স্পষ্ট করার জন্য ব্যাখ্যা প্রদান।

২. যে বিষয়ে শরিয়তের স্পষ্ট বিধান নেই, কিন্তু সমজাতীয় বা সাদৃশ্যমূলক আইন রয়েছে, সে বিষয়ে শরিয়তের সাদৃশ্যতা অনুসরণ করে আইন প্রণয়ন।

৩. যেসব বিষয়ে শরিয়তের কোনো বক্তব্য নেই, সেসব ক্ষেত্রে শরিয়তের অন্যান্য বিধানের আলোকে আইন প্রণয়ন এবং

৪. যেসব ক্ষেত্রে শরিয়তের কোনো বিধান বা সামঞ্জস্যমূলক বিধান নেই, সেসব ক্ষেত্রে ইসলামের ভাবধারা অনুসরণ করে স্বাধীনভাবে আইন প্রণয়ন।

মওদূদীর মতে, আইন প্রণয়ন-সংক্রান্ত উপরিউক্ত কার্যাবলি সম্পন্ন করতে হলে ইসলামী রাষ্ট্রের আইনসভার সদস্যদের ইসলামী আইন এবং সামগ্রিকভাবে ইসলাম সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হতে হবে।[৩৯১]

মাওলানা মওদূদীর উপরিউক্ত মতামতসমূহ থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, আলিমদের তাকলিদ বা ইজতিহাদ বন্ধ হয়ে যাওয়া সম্পর্কিত ধারণা যেমন তাঁর নিকট পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য হয়নি, তেমনি ইসলামী আধুনিকতাবাদীদের ইজমা ও সম্প্রদায়ের ঐকমত্যের ধারণাও তিনি হুবহু গ্রহণ করেননি।[৩৯২]

---

৩৮৯. Syed Abul Ala Maududi, *The Islamic Law, op. cit.*, pp. 58-62

৩৯০. *Ibid.*, pp. 79-80

৩৯১. *Ibid.*, pp. 221-23

৩৯২. Leonard Binder, *Religion and Politics, op. cit.*, p. 75

মাওলানা মওদূদী শরিয়া ও ইজতিহাদের ওপর বেশি গুরুত্বারোপ করেছেন। তাঁর মতে, ইসলামের নীতি অনুসারে একজন ব্যক্তির মতামত অনেক মানুষ বা একটি পরিষদের মতামতের চেয়ে পরিপক্ব হতে পারে। এ কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন লাভের কারণে যেমন কোনো ভ্রান্ত মতামত গ্রহণীয় হতে পারে না, তেমনি সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনের অভাবে কোনো সঠিক মতামত পরিত্যাজ্য হওয়া উচিত নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন না থাকলেও ইসলামের নেতা সঠিক মতটি গ্রহণ করার ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকেন। নেতা নিজের বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে এককভাবেও সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।[৩৯৩]

মওদূদীর উপরিউক্ত মতামতের সঙ্গে মুহাম্মাদ ইকবাল, মুহাম্মাদ আসাদ, ফজলুর রহমান প্রমুখ ইসলামী চিন্তাবিদের এ সম্পর্কিত ধারণা পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ইকবাল মুসলমানদের বৃহত্তর স্বার্থে ইজতিহাদ ও ইজমার দায়িত্ব আইনসভার নিকট অর্পণ করার পক্ষে মতে প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে আইনসভাকৃত ইজতিহাদ গোটা সম্প্রদায়ের ইজমাতে (ঐকমত্য) পরিণত হয়।[৩৯৪] ইসলামী রাষ্ট্রের মজলিশে শূরা ও আইনসভার সিদ্ধান্তসমূহ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে গৃহীত হতে পারে বলে মুহাম্মাদ আসাদ মত প্রকাশ করেছেন।[৩৯৫] ফজলুর রহমানের মতে– ইসলামী রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা মুসলিম জনগণের ওপর অর্পিত হয়েছে। জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে আইনসভার সদস্যগণ এ ক্ষমতা পরিচালনার অধিকারী। তবে বিশেষ বিশেষ আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞদের মতামত নেওয়া প্রয়োজনীয় হতে, পারে।[৩৯৬] ইজতিহাদ ও ইজমা সম্পর্কিত মওদূদীর পূর্বোক্ত মতামত সংখ্যারিষ্ঠের সমর্থনের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের যে নীতি আধুনিক পশ্চিমা গণতন্ত্র অনুসরণ করে থাকে, তার সঙ্গেও সংগতিপূর্ণ নয়। চার্লস জে অ্যাডামস ও জন এল এসপোজিটো প্রমুখ লেখক মওদূদীর উপরিউক্ত চিন্তাধার সর্বাত্মকবাদের সহায়ক বলে অভিহিত করেছেন।[৩৯৭]

---

৩৯৩. Syed Abul Ala Maududi, *Political Theory, op. cit.*, p. 35

৩৯৪. John L. Exposito, 'Muhammad Iqbal', *op. cit.*, pp. 186-87

৩৯৫. মুহাম্মাদ আসাদ, ইসলামে রাষ্ট্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০

৩৯৬. Fazlur Rahman, 'The Islamic', *op. cit.*, p. 262

৩৯৭. Charles J. Adams, 'Mawdudi, and the Islamic', *op. cit.*, p. 121

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র মতে, ইসলামী আইন বাস্তবায়নের জন্য আল্লাহর সার্বভৌমত্ব তত্ত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশকে ইসলামী রাষ্ট্র ঘোষণা করতে হবে। এ দেশের সকল আইনের উৎস হবে কুরআন ও সুন্নাহ। বাংলাদেশ শাসনতন্ত্রের সকল অনৈসলামী ধারা পরিবর্তন করে সেস্থলে ইসলামী ধারা সংযুক্ত করতে হবে।[৩৯৮]

জামায়াতের মতে, জনগণকে সংশোধিত ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী হওয়ার সুযোগ না দিয়ে অর্থাৎ, যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টি না করে ইসলামী আইন চাপিয়ে দেওয়া সংগত হবে না। বাংলাদেশে ইসলামী আইন চালু করার জন্য জামায়াত নিম্নোক্ত কর্মনীতি গ্রহণ করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন–

ক. শিক্ষাব্যবস্থাকে ইসলামী ধারায় সংশোধন করে জনগণকে মানসিকভাবে ইসলাম অনুসারীকরণ;

খ. প্রচারমাধ্যমসমূহ ব্যবহার করে ইসলামী জীবনধারা অনুসরণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা;

গ. অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা, বাসস্থানসহ জনগণের মৌলিক প্রয়োজনসমূহ পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঘ. নারী-পুরুষের শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্র পৃথককরণ ইত্যাদি।[৩৯৯]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে ধারণা করা যায় যে, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করতে জামায়াতে ইসলামী আগ্রহী নয়। ইসলামী আইন বাস্তবায়নের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করার ওপর জামায়াতে ইসলামী সবিশেষ গুরুত্ব দেয়।

গণতন্ত্র সম্পর্কিত ইসলামের ধারণা ইসলামী খিলাফত তত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসলাম জনগণের সার্বভৌমত্ব নয়; বরং খিলাফতে বিশ্বাস করে। মুসলমানগণ যে ব্যক্তির নিকট রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেন, তিনি কেবল তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। অর্পিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত শাসক তাঁর কাজের জন্য আল্লাহ ও মুসলিম জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকেন।[৪০০]

---

৩৯৮. *মেনিফেস্টো : জামায়াত*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩

৩৯৯. ঐ, পৃ. ১১-১২

৪০০. Syed Abul Ala Maududi, *Political Theory, op. cit.*, pp. 258-60

মাওলানা মওদূদীর মতে– পশ্চিমা গণতন্ত্র জনগণের সার্বভৌমত্ব বিষয়ক যে তত্ত্ব প্রচার করে, সেটি সম্পূর্ণভাবে ইসলামবিরোধী। কারণ, এতে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা জনগণের তথা আইন পরিষদের হাতে অর্পণ করা হয়। পক্ষান্তরে, ইসলামী শাসনব্যবস্থায় জনগণের প্রতিনিধিরা আল্লাহর নির্দেশানুসারে দেশ পরিচালনা করেন।[৪০১]

সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্র সম্পর্কিত মওদূদীর ওপরে বর্ণিত ধারণা এ সম্পর্কিত জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র ধারণার সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।[৪০২] গোলাম আযমের মতে, নিরপেক্ষ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের ভিত্তিতে সরকার গঠন, সরকারের গঠনমূলক বিরোধিতার স্বীকৃতি, ক্ষমতালাভের ভিত্তি হিসেবে জনসমর্থন ও শাসনতান্ত্রিক সরকার প্রভৃতি প্রশ্নে আধুনিক গণতন্ত্রের সঙ্গে ইসলামের তেমন কোনো বিরোধ নেই। কিন্তু জনগণের সার্বভৌমত্ব ও আইন প্রণয়ন প্রশ্নে আধুনিক গণতন্ত্রের সঙ্গে ইসলামের মতভিন্নতা রয়েছে। আল্লাহর প্রদত্ত আইনের পরিপন্থি কোনো আইন প্রণয়েনর ক্ষমতা ইসলাম কোনো ব্যক্তি বা সংস্থাকে প্রদান করে না।[৪০৩] পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের ধর্মনিরপেক্ষ রূপও জামায়াত অনুমোদন করে না।[৪০৪]

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত হয়। মাওলানা মওদূদীসহ জামায়াত নেতারা নির্বাচন প্রশ্নে বিভিন্ন ধরনের মত প্রকাশ করেছেন। মওদূদীর মতে, ইসলামী নেতৃত্বকে জনসমর্থনের ওপর নির্ভরশীল হতে হবে। নেতৃত্ব বাছাইয়ের ক্ষেত্রে মুসলমানদের মতামত প্রকাশের সুযোগ থাকতে হবে। তবে ইসলাম মতামত প্রকাশের কোনো সুনির্দিষ্ট পন্থা নির্ধারণ করেনি বলে সার্বিক অবস্থা ও প্রয়োজন ভেদে বিভিন্ন ধরনের নির্বাচনব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে।[৪০৫] মওদূদীর মতে, নির্বাচনব্যবস্থা এমন হতে হবে– যাতে বিশ্বাসী, ধর্মভীরু, জনপ্রিয় এবং জনকল্যাণকামী লোকজন নির্বাচিত হতে পারেন।[৪০৬]

---

৪০১. Syed Abul Ala Maududi, *The Islamic Law, op. cit.*, pp. 138-40

৪০২. আব্বাস আলী খান, *জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭১-৭২

৪০৩. গোলাম আযম, 'গণতন্ত্র ও ইসলাম', *বাংলাদেশের রাজনীতি*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪০-৪২

৪০৪. দেখুন, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *মুসলমানদের অতীত*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪২-৪৩

৪০৫. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭-৪৮

৪০৬. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, ইসলামী শাসনতন্ত্রের মূলনীতি (ঢাকা, ইসলামিক পাবলিকেশন্স লি., ১৯৬৩), ১৯

মাওলানা মওদূদী ১৯৪৫ সালে মত প্রকাশ করেন যে, যেসব আইনসভা আইন প্রণয়ন ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী, সেসব আইনসভার সদস্যপদ গ্রহণ এবং সেসব আইনসভার সদস্য নির্বাচনে ভোটদান হারাম।[৪০৭] কিন্তু জনমত যদি এরূপ হয় যে, নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও জয়লাভের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সংবিধানকে ইসলামী নীতির অনুকূলে পরিবর্তন করা যাবে, তখন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা যেতে পারে।[৪০৮] এ কারণে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান ও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ যথাক্রমে পাকিস্তান ও বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলেও জামায়াতে ইসলামী হিন্দ ভারতের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে না।[৪০৯]

পাকিস্তানের মতো গণতান্ত্রিক দেশে নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বসবাস করে নেতৃত্ব পরিবর্তনের জন্য অনিয়মতান্ত্রিক পন্থাবলম্বনকে মওদূদী সঠিক নয় বলে ঘোষণা করেছেন।[৪১০] মওদূদীর মতে, ইসলামী আন্দোলন গোপন আন্দোলন হতে পারে না।[৪১১] জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র গঠনতন্ত্রের ধারা ৪(৩) ও ধারা ৬(৪)-এ (স্থায়ী কর্মনীতি ও স্থায়ী কর্মসূচি বিষয়ক ধারায়) নিয়মতান্ত্রিক পথে আন্দোলন পরিচালনা ও সরকার পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে।[৪১২] গোলাম আযমের মতে, নির্বাচনব্যবস্থা বাংলাদেশে ইসলামী বিপ্লবের জন্য সহায়ক।[৪১৩] জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র মেনিফেস্টোতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা সরকার গঠন ও পরিচালনার ওপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে।[৪১৪]

---

৪০৭. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *তরজুমানুল কুরআন*, ডিসেম্বর, ১৯৪৫। উদ্ধৃত, *লেখকের রাসায়েল*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩২৬

৪০৮. ঐ, পৃ. ৩৩০

৪০৯. সাক্ষাৎকার : আব্বাস আলী খান।

৪১০. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচি*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১-১২

৪১১. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *মুসলিম বিশ্বে ইসলামী আন্দোলনের কর্মধারা*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯

৪১২. *গঠনতন্ত্র : জামায়াত*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২-১৩

৪১৩. *জামায়াতে ইসলামীর কর্মনীতি* (ঢাকা, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৯৯০), পৃ. ৩২-৩৩

৪১৪. *মেনিফেস্টো : জামায়াত*, পৃ. ৮-৯

বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসীদের জন্য পৃথক নির্বাচন দেশের জন্য কল্যাণকর হবে বলে গোলাম আযম মত প্রকাশ করেছেন। এ ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধর্মের লোকজন জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব পাবেন।[৪১৫] অমুসলিম সংখ্যালঘুরাও বাস করেন– এমন রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করা গণতন্ত্রসম্মত হবে কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র বক্তব্য হচ্ছে, ইসলাম মুসলিম-অমুসলিম এবং সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু নির্বিশেষে সকলের জন্য কল্যাণকর জীবনব্যবস্থা। এ ছাড়া কোনো দেশের সংখ্যাগুরু অধিবাসী কোনো বিশেষ জীবনাদর্শ বাস্তবায়িত করতে চাইলে সেটাকে মেনে নেওয়াই হবে সংখ্যালঘুদের গণতন্ত্রসম্মত কাজ।[৪১৬] এ কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সমর্থনের ভিত্তিতে বাংলাদেশে ইসলামী শাসনব্যবস্থা কায়েম করা অগণতান্ত্রিক কাজ হবে না। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, গণতন্ত্র ও নির্বাচন সম্পর্কে মওদূদী ও জামায়াতের বক্তব্যে পারস্পরিক বিরোধিতা রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, উপরিউক্ত বিষয়াবলি সম্পর্কে মাওলানা মওদূদী ও জামায়াতের মতামত যা-ই হোক না কেন পাকিস্তান ও বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত অধিকাংশ নির্বাচনে জামায়াত অংশগ্রহণ করেছে। যদিও পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। উভয় দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অনুকূলে ভোট দেওয়ার সম্ভাবনাও এ পর্যন্ত দেখা যায়নি।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র প্রধান নেতা গোলাম আযমের মতে, নৈতিক উন্নয়ন, পরকালের মুক্তি ও মানবতার কল্যাণের জন্য যাঁরা ধর্ম পালন করেন, তাঁরা কখনও ধর্মান্ধ হন না। যারা ধর্মের মূল উদ্দেশ্য বোঝেন না এবং যারা পার্থিব স্বার্থে ধর্মকে ব্যবহার করতে চান, তারাই ধর্মান্ধ হয়ে থাকেন। সত্যিকার ধার্মিকতা মানুষকে উদার করে এবং সকল মানুষকে ভালোবাসতে শেখায়।[৪১৭] ধর্ম মানুষকে নৈতিকতার বন্ধনে আবদ্ধ করে। পক্ষান্তরে, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মকে সীমাবদ্ধ রাখার নামে মানুষকে আল্লাহর নির্দেশিত আদর্শ ও নীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়।[৪১৮] গোলাম আযমের মতে,

৪১৫. গোলাম আযম, *অমুসলিম নাগরিক*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫-১৬

৪১৬. ঐ, পৃ. ৮

৪১৭. গোলাম আযম, ঐ, পৃ. ২১

৪১৮. গোলাম আযম, *ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ* (ঢাকা, আল-আযামী পাবলিকেশন্স, ১৯৮৭), পৃ. ১৭

ইসলাম-বিশ্বাসী কোনো মানুষের পক্ষে ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব নয়। খাঁটি মুসলমান মাত্রই ইসলামকে পরিপূর্ণ জীবনবিধান হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য।[৪১৯]

মুনাফা অর্জনই পুঁজিবাদের প্রধান লক্ষ্য হয়ে থাকে। পুঁজিবাদে ধর্ম, নৈতিকতা ইত্যাদিকে গুরুত্ব প্রদান করা হয় না বলে এটি ইসলামবিরোধী। পুঁজিবাদী সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠা দুরূহ কাজ হয়ে থাকে। যারা ইসলামী আদর্শে বিশ্বাস করেন, তাদের পক্ষে পুঁজিবাদের ন্যায় সমাজতন্ত্রকেও গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। কারণ, সমাজতন্ত্রের প্রতিটি বিষয় ইসলামী আদর্শের পরিপন্থি।[৪২০] গোলাম আযমের মতে– বাংলাদেশে ইসলামের সঙ্গে পুঁজিবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্রের লড়াই চলছে। তাঁর মতে–

> যেখানে গণতন্ত্র আছে, সেখানে ইসলামকে কায়েম করার চেষ্টা জারি রাখা যায়। পুঁজিবাদী গণতন্ত্রেও কোনো রকমে ইসলামী আন্দোলন হয়তো-বা চালানো যেতে পারে। কিন্তু যেখানে সমাজতন্ত্র কায়েম হয়, সেখানে ইসলামের সামান্য প্রচারও অসম্ভব। এ দুটো ইসলামবিরোধী মতবাদের মধ্যে প্রথমটি ইসলামকে শুধু ধর্ম হিসেবে বরদাস্ত করে এবং ইসলামকে শুধু ধর্মীয় বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য করতে চায়। আর সমাজতন্ত্র এমন দুশমন যে, ইসলামকে ধর্ম হিসেবেও বরদাস্ত করতে রাজি নয়। প্রথমটি ধর্মহীন, দ্বিতীয়টি ধর্মবিরোধী।[৪২১]

সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করলে ইসলামের প্রতি ঈমান রাখা সম্ভব হয় না বলেও গোলাম আযম মত প্রকাশ করেছেন।[৪২২]

ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ অর্থব্যবস্থার পক্ষে মত প্রকাশ করেছে। এতে ব্যক্তির অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও ধন বন্টনের ভারসাম্যকে যথাযথভাবে রক্ষা করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ইসলামের মতে, প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সমস্ত মানুষের সামগ্রিক স্বার্থ পরস্পর সম্পর্কিত। এজন্য ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক স্বার্থের মধ্যে প্রতিযোগিতর পরিবর্তে সহযোগিতার

---

৪১৯. গোলাম আযম, *ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ* (ঢাকা, আল-আযামী পাবলিকেশন্স, ১৯৮৭), পৃ. ২৪-২৫

৪২০. গোলাম আযম, *বাংলাদেশে আদর্শের লড়াই*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২-২৭

৪২১. ঐ, পৃ. ১৫

৪২২. ঐ, পৃ. ২৯

পরিবেশ বজায় থাকা বাঞ্ছনীয়। মাওলানা মওদূদীর মতে, ভারসাম্যপূর্ণ ইসলামী অর্থব্যবস্থার চারটি মূল দিক রয়েছে। এগুলো হচ্ছে– ১. স্বাধীন ও অবাধ অর্থব্যবস্থা ২. যাকাত ফরজ হওয়া ৩. সুদ হারাম করা ও ৪. মিরাসি আইন প্রবর্তন।[৪২৩] অবৈধ পন্থায় ধনার্জন ও ব্যয় ইসলামে নিষিদ্ধ। ইসলামে যাকাত প্রদান ফরয। সুদ ও জুয়া নিষিদ্ধ। মওদূদীর মতে, ইসলামী অর্থব্যবস্থাই পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের অভিশাপ থেকে মানুষকে মুক্ত রাখতে পারে।[৪২৪] অর্থব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ সাধারণভাবে অনুমোদিত না হলেও জনগণের কল্যাণ এবং রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে ইসলামী সরকার ব্যাবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানাসহ অর্থব্যবস্থার সকল ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে পারে। রাষ্ট্রীয় স্বার্থে ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে জাতীয়করণ করা যেতে পারে।[৪২৫] গোলাম আযম ইসলামী অর্থব্যবস্থাকে পুঁজিবাদ ও সমাজবাদের দোষ-ক্রটিমুক্ত একটি ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলে দাবি করেছেন।[৪২৬]

আব্বাস আলী খানের মতে– আল্লাহর কিতাব, রাসূলের আদর্শ ও খুলাফায়ে রাশিদিনের পথ অনুসরণ করে বাংলাদেশকে একটি আধুনিক কল্যাণরাষ্ট্রে পরিণত করাই জামায়াতের লক্ষ্য।[৪২৭] গোলাম আযমের মতে– কুরআন ও হাদিসে কল্যাণরাষ্ট্রের যে সকল উপাদান রয়েছে, সেগুলোর ভিত্তিতে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ঢেলে সাজানো গেলে এ দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমাধান সম্ভব হবে।[৪২৮]

---

৪২৩. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ* (ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৭৯), পৃ. ৬, ৯৬

৪২৪. Syed Abul Ala Maududi, *The Islamic Law, op. cit.*, p. 143

৪২৫. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *ইসলাম ও সামাজিক সুবিচার* (ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮৭), পৃ. ২২-২৩

৪২৬. Ghulam Azam, *A Guide to, op.cit.*, pp. 9- 11

৪২৭. জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র ত্রিবার্ষিক রুকন সম্মেলনে (২৬-২৮ ডিসেম্বর, ১৯৮৯) প্রদত্ত আব্বাস আলী খানের ভাষণ। পুস্তিকা। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত। ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ১০। আরও দেখুন, ১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে আব্বাস আলী খানের রেডিও-টেলিভিশনে প্রদত্ত ভাষণ। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত। ঢাকা, ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১, পৃ. ৪

৪২৮. গোলাম আযম, *বাংলাদেশ ও জামায়াতে ইসলামী*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬

ইসলাম একটি আন্তর্জাতিক ধর্ম বলে জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা ইসলামী আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় রাষ্ট্রভিত্তিক চিন্তা-ভাবনা সাধারণত ভৌগোলিক এলাকাকেন্দ্রিক হয়ে থাকে। কিন্তু ইসলামী আদর্শ ও মুসলিম উম্মাহর পরিধি বিশ্বব্যাপী হতে পারে। ইসলাম আন্তর্জাতিক ধর্ম হলেও নানা বাস্তব অসুবিধার কারণে আল-মাওয়ারদি, ইবনে খালদুনসহ অনেক মুসলিম পণ্ডিত জাতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা মেনে নিয়েছিলেন।[৪২৯] বিশ্বের মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহের মধ্যে ভৌগোলিক অবস্থান, ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতিসহ নানা বিষয়ে ব্যাপক পার্থক্যের কারণে সকল মুসলমানের জন্য একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় বলা যায়। এ কারণে বর্তমান পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলিমপ্রধান দেশ জাতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থাকে গ্রহণ করেছে। জাতীয়তাবাদী চিন্তা-ভাবনা এসব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ভিত্তিমূলে কাজ করেছে। তবে এ কথা সত্য যে, জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা বাস্তব কারণে যতই প্রাসঙ্গিক হোক না কেন, মুসলমানদের একটি অংশ এখনও ইসলামী আন্তর্জাতিকতা তথা ইসলামের খিলাফত তত্ত্বে বিশ্বাস করে।[৪৩০]

মাওলানা মওদূদী জাতীয়তাবাদের তীব্র বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে– মুসলমানের হৃদয় ও মনের একপ্রান্ত দিয়ে যখন জাতীয়তাবাদের চেতনা অনুপ্রবেশ করে, তখন অন্যপ্রান্ত দিয়ে ইসলাম নিষ্ক্রান্ত হয়। যে মুসলিম নিজেকে জাতীয়তাবাদের ধারক বলে জাহির করেন, তিনি ইসলামের আলোকবর্তিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন।[৪৩১] মওদূদীর মতে, ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ পরস্পরবিরোধী মতাদর্শ। ইসলামের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে, দেশ জাতি ও বর্ণভিত্তিক পার্থক্য দূরীভূত করে একটি আদর্শভিত্তিক বিশ্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। ইসলামের এ বিশ্বজনীন আদর্শের বিপরীতে জাতীয়তাবাদ মানুষে মানুষে বিভক্তি আনে।[৪৩২] ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর জাতীয়তাবাদ

---

৪২৯. Malise Ruthven, *Islam in the World* (England. Penguim Books Ltd.. 1985), p. 356

৪৩০. H. Lammens, S. J., *Islam: Beliefs and Institutions* (New Delhi, Oriental Book Reprint Corporation, 1979), pp. 200-204

৪৩১. Quoted, in Rupert Emerson, *From Empire to Nation* (Cambridge, Harvard University Press, 1960), p. 164

৪৩২. Syed Abul Ala Maududi, 'Nationalism nd Islam' in John J. Donohue and John L. Esposito eds., *Islam in, op. cit.*, p. 95

সম্পর্কিত মওদূদী চিন্তাধারায় আপসকামিতা ও পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড অর্থাৎ, নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানকে ইসলামী আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্রের একটি মডেলে পরিণত করার জন্য মওদূদী বিশেষভাবে চেষ্টিত হন।[৪৩৩]

জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত মওদূদী চিন্তাধারার প্রভাব জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র দুই প্রধান নেতা গোলাম আযম ও আব্বাস আলী খানের রচনায়ও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গোলাম আযমের মতে, একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে ইসলামী রাষ্ট্রকে প্রতিষ্ঠিত হতে হলেও আদর্শগতভাবে ইসলাম জাতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরোধী। ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ ইসলামসম্মত নয়।[৪৩৪] আব্বাসী আলী খানের মতে, সমগ্র পৃথিবী মুসলমানদের নিজের দেশ ও কর্মক্ষেত্র বলে বিবেচিত হলেও ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য আপন জন্মভূমিকেই প্রথম বেছে নিতে হবে। এ কারণে বাংলাদেশই হবে এখানকার মুসলমানদের প্রধান কর্মক্ষেত্র। বাংলাদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করা এখানকার মুসলমানদের দ্বীনি দায়িত্ব।[৪৩৫] জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র মেনিফেস্টোতেও গোলাম আযম এবং আব্বাস আলী খানের উপরিউক্ত মতামতের সমর্থন পরিলক্ষিত হয়।[৪৩৬]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ইসলামী আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাসী হলেও বাস্তবতার কারণে জামায়াত বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিমপ্রধান রাষ্ট্রকে আলাদা আলাদাভাবে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায়। বাংলাদেশকে ইসলামী আদর্শানুসারী একটি মডেল রাষ্ট্রে পরিণত করতে আগ্রহী বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। জামায়াত বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদকে সমর্থন করে। গোলাম আযমের ভাষায়–

> বাংলাদেশের জনগণকে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে চিহ্নিত করতে হলে মুসলিম ও অমুসলিম নামেই পরিচয় দিতে হয়। মুসলিমদের এ ঐক্যবোধই ভারতকে বিভক্ত করে। তাদের এ জাতীয় চেতনাই বারবার

---

৪৩৩. দেখুন, Aziz Ahmad, 'Mawdudi and Orthodox Fundamentalism in Pakistan', *The Middle East Journal*, Vol. 21, Winter, 1967, No. 1, p. 378

৪৩৪. Ghulam Azam, *A Guide to, op. cit.*, p. 9

৪৩৫. ১৯৭৯ সালের ২৫শে মে ঢাকায় অনুষ্ঠিত জামায়াতের প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে আব্বাস আলী খানের ভাষণ। *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭

৪৩৬. *মেনিফেস্টো : জামায়াত*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫-৬

> আত্মপ্রকাশ করেছে অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে। এ সংখ্যাগুরুর মধ্যে যে চেতনা ঐতিহাসিক সনদ নিয়ে বেঁচে আছে, তা হলো মুসলিম চেতনা। এ মুসলিম চেতনাই বাংলাদেশি জাতীয়তার প্রাণ। ... তাই বাংলাদেশি জাতীয়তার রূপ মুসলিমপ্রধান হতে বাধ্য। বাংলাদেশের অমুসলিমরাও অবশ্যই বাংলাদেশি জাতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু জনগণের শতকরা ৯০ জনের সংখ্যাগুরু হওয়ার দায়িত্ব মুসলিমদের ওপর ন্যস্ত বলে তাদের সক্রিয় ভূমিকা থাকাই বাস্তব।[৪৩৭]

মাওলানা নিজামীও রাষ্ট্রীয় পরিচয়ের জন্য 'বাংলাদেশি' পদবাচ্য ব্যবহার করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন।[৪৩৮] জামায়াতের কেন্দ্রীয় নেতা সাইয়েদ মুহাম্মদ আলীর মতে, জাতীয়তাবাদ ইসলামসম্মত না হলেও পৃথিবীর মানুষের নিকট পরিচিতির জন্য বাংলাদেশি, পাকিস্তানি ইত্যাদি জাতি হিসেবে নামকরণ করা ইসলামবিরোধী হবে না।[৪৩৯] উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায়, জাতীয়তা ও জাতীয়তাবাদ প্রশ্নে জামায়াত নেতাদের মনোভাব ক্রমান্বয়ে বাস্তবতাধর্মী হয়ে উঠছে।

মাওলানা মওদূদীর মতে, ইসলামী বিপ্লবের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা। কেবল দেশ-বিশেষে নয়; বরং সমগ্র বিশ্বে ইসলাম তার আদর্শিক বিপ্লব আনতে চায়। একটি বিশেষ দেশে বিপ্লব সফল হওয়ার পর সে রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্রের মডেল হিসেবে উপস্থাপন করে অন্যান্য দেশেও ইসলামী বিপ্লব সম্পন্ন করার চেষ্টা করা হয়। মওদূদীর মতে, হযরত মুহাম্মাদ সা.ও উপরিউক্ত নীতি গ্রহণ করেছিলেন।[৪৪০] ইসলামী বিপ্লবীদের এ কর্মপদ্ধতির সঙ্গে কমিউনিস্টদের 'একদেশে বিপ্লব' ও 'বিশ্বব্যাপী বিপ্লব' তত্ত্বের সামঞ্জস্য দেখা যায়। জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান ও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ নিজেদের দেশ পাকিস্তান ও বাংলাদেশে ইসলামী বিপ্লব সম্পন্ন করার চেষ্টা করছে।

---

৪৩৭. গোলাম আযম, *আমার দেশ বাংলাদেশ* (ঢাকা, আল-আযামী পাবলিকেশন্স, ১৯৮৮), পৃ. ২১-২২

৪৩৮. সাক্ষাৎকার : মতিউর রহমান নিজামী।

৪৩৯. সাক্ষাৎকার : জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র কেন্দ্রীয় নেতা সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী।

৪৪০. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *আল্লাহর পথে জিহাদ* (ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৭৮), পৃ. ৩০-৩২। আরও দেখুন, Syed Abul Ala Mawdudi, *Fundamentals of Islam* (Delhi, Markaz Maktaba Islami, 1979)

মাওলানা মওদূদীর মতে, ইসলামী বিপ্লবে তাবলিগ ও তরবারির ভূমিকা রয়েছে। অন্যান্য মতাদর্শিক আন্দোলনেও প্রচার এবং শক্তি প্রয়োগের ভূমিকা দেখা যায়। পাশ্চাত্য প্রচারমাধ্যম অবশ্য পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে কেবল ইসলামকে রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের মতাদর্শ বা ধর্ম বলে প্রচারণা চালিয়ে থাকে।[৪৪১] জামায়াত গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করে শান্তিপূর্ণভাবে বাংলাদেশে ইসলামী বিপ্লব সম্পন্ন করতে চায়।[৪৪২] গোলাম আযমের মতে, কোনো জনগোষ্ঠীর ওপর শক্তি প্রয়োগ করে বিপ্লব চাপিয়ে দেওয়া ইসলামসম্মত কাজ নয়। তাঁর মতে– যে ভূখণ্ডে ইসলামী বিপ্লব সম্পন্ন হবে, সে ভূখণ্ডের অন্তত অধিকাংশ লোক সক্রিয়ভাবে ইসলামবিরোধী হতে পারবে না। যদি কোনো ভূখণ্ডের অধিকাংশ লোক ইসলাম সমর্থন করে, তাহলে সে ভূখণ্ডকে ইসলামী বিপ্লবের জন্য অনুকূল ক্ষেত্র মনে করতে হবে। বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগণ সাধারণভাবে ইসলামের পক্ষে বলে এখানে ইসলামী বিপ্লব সফল হওয়ার অনুকূল পরিবেশ রয়েছে বলে গোলাম আযম মত প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে ইসলামী বিপ্লব ও সরকার পরিচালনায় উপযোগী নেতা-কর্মী সৃষ্টি করা। সূরা আন নূর-এর ৫৫ নং আয়াত উদ্ধৃত করে গোলাম আযম আশাবাদ প্রকাশ করেছেন যে, বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলন যদি সত্যিকার অর্থে 'মুমিনিন' ও 'সালিহিন'দের একটি সংগঠন তৈরি করতে সক্ষম হয়, তাঁদের প্রস্তুতি যদি যথার্থ অর্থে সম্পন্ন হয় এবং উপরিউক্ত দল যদি ইসলাম বাস্তবায়ন করতে সক্ষমতা লাভ করে, তাহলে আল্লাহ তায়ালা সে দলকে অবশ্যই শাস ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করবেন।[৪৪৩]

নিজামীর মতে, ইসলামী বিপ্লবের সাফল্যের পূর্বশর্ত হিসেবে নিম্নোক্ত ৫টি বিষয়কে চিহ্নিত করা যায়। এগুলো হচ্ছে–

ক. মজবুত সাংগঠনিক ভিত্তি,

খ. বিপ্লবের পক্ষে সক্রিয় ও সচেতন জনমত,

---

৪৪১. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *আল-জিহাদ* (ঢাকা, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৮১), পৃ. ১৫৮

৪৪২. দেখুন, জামায়াতের গঠনতন্ত্রের ধারা ৪ (স্থায়ী কর্মনীতি) ও ধারা ৬ (স্থায়ী কর্মসূচি)। *গঠনতন্ত্র : জামায়াত, পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২-১৩। মুহাম্মদ কামরুজ্জামান, *আধুনিক যুগে ইসলামী বিপ্লব* (ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯০), পৃ. ১৮-২৮

৪৪৩. Ghulam Azam, 'Methods of Islamic Revolution' in Muhammad Shamsul Islam (ed.), *Student Views* (Dhaka, Bangladesh Islami Chattra Shibir, 1988), pp. 6, 10

গ. বিপ্লবের সাফল্য ধরে রাখার ক্ষমতা,

ঘ. বিপ্লববিরোধীদের প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং

ঙ. বিদেশি চক্রান্তের মোকাবিলা।[৪৪৪]

জামায়াত নেতাদের উপরিউক্ত বক্তব্যসমূহ থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, কোনো অনিচ্ছুক জনগোষ্ঠীর ওপর ইসলামী বিপ্লব চাপিয়ে দেওয়া ইসলামসম্মত কাজ নয়। ইসলামী বিপ্লবের সাফল্যের জন্য শুধু ইসলামী সংগঠনের প্রস্তুতিই যথেষ্ট নয়; এ বিপ্লবের সাফল্যের জন্য আল্লাহর ইচ্ছা ও সাহায্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আল্লাহর ইচ্ছা ও সাহায্য সম্পর্কিত উপরিউক্ত অদৃষ্টবাদী মনোভাব জামায়াতের ইসলাম-ধর্মভিত্তিক আদর্শের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ বলা যায়।

এ গ্রন্থের উপক্রমণিকাসহ পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র ভূমিকা সম্পর্কে বিভিন্নভাবে আলোচনা এসেছে। নিম্নে জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক আদর্শ এক্ষেত্রে কী ভূমিকা পালন করতে পারে, সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

রাজনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত যেকোনো আলোচনায় একাত্মতা ও সংহতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়। জামায়াতের রাজনৈতিক আদর্শ হচ্ছে ইসলাম। ইসলাম শুধু একটি রাজনৈতিক আদর্শ নয়; একটি ধর্মও বটে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মধ্যে ইসলাম ধর্মাবলম্বী মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও এখানে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষও বাস করেন। বাংলাদেশের অমুসলিম অধিবাসীরা ইসলামকে মুসলমানদের ধর্ম হিসেবে বিবেচনা করে একে নিজেদের রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে আগ্রহী না হওয়াই স্বাভাবিক। এ কারণে প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অমুসলিম নাগরিকদের মধ্যে জামায়াত আদর্শকে এখন পর্যন্ত জনপ্রিয় করা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রভাবিত মুসলিম অধিবাসীদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ ইসলামী আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থার বাস্তবতা ও সাফল্য সম্পর্কে অনুকূল মত পোষণ করেন না। এসব কারণে একাত্মতা ও সংহতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জামায়াতের রাজনৈতিক আদর্শ কতটা ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে– সে সম্পর্কে সংশয়ের অবকাশ রয়েছে।

---

৪৪৪. দেখুন, মতিউর রহমান নিজামী, *ইসলামী সমাজ বিপ্লব* (ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৮), পৃ. ৫-১৩

ইসলামী আদর্শানুসারে আল্লাহই সার্বভৌম ও আইন প্রণয়নের চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। ইসলামী আইনে সুস্পষ্ট বিধান নেই– এমন বিষয়ে ইসলামী আদর্শের সঙ্গে সংগতি রেখে জনগণের প্রতিনিধিরা আইন প্রণয়ন করতে পারেন। গণতান্ত্রিক আদর্শানুসারে সার্বভৌমত্ব ও আইন প্রণয়ন প্রশ্নে জনগণের চূড়ান্ত ক্ষমতা অন্তত তত্ত্বগতভাবে হলেও স্বীকৃত হয়। এ কারণে জামায়াত পাশ্চাত্য গণতন্ত্রকে ইসলামবিরোধী আদর্শ বলে মনে করে। জামায়াতের অনুসৃত ইসলামী আদর্শ রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের সিদ্ধান্ত ও অংশগ্রহণের ক্ষমতাকে সীমিত করবে বলে ধারণা করা হয়।

বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ হচ্ছে মুসলমান। মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে একাত্মতা ও সংহতি আনার জন্য জামায়াত কাজ করছে। জামায়াতের মতে– পৃথিবীর কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শ কখনও একটি দেশের সকল জনগণ কর্তৃক গৃহীত হয় না। দেশ-বিশেষের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কর্তৃক একটি বিশেষ আদর্শ গৃহীত হলে সে দেশে ঐ বিশেষ আদর্শ বাস্তবায়িত হতে পারে। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ইসলামকে রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে নিলে এটি বাস্তবায়িত হওয়া তাই অগণতান্ত্রিক হবে না। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, জামায়াত পাশ্চাত্য গণতন্ত্রকে ইসলামবিরোধী আদর্শ মনে করে। এ কারণে বাংলাদেশে ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য পাশ্চাত্য গণতন্ত্র অনুসৃত সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন-বিষয়ক ধারণাকে যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করাকে রাজনৈতিক সুবিধাবাদ বলে মনে করা হয়।

জামায়াতের মতে, ইসলাম উন্নয়ন বা আধুনিকায়নবিরোধী আদর্শ নয়। মানুষের ইহকালীন কল্যাণের জন্য ইসলামের মৌল আদর্শবিরোধী নয়– এমন যেকোনো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। আধুনিক গণতন্ত্রের কয়েকটি দিকের সঙ্গে (যেমন– জনগণের সার্বভৌমত্ব, ধর্মনিরপেক্ষতা ইত্যাদি) বিরোধ থাকলেও নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ কর্তৃক রাষ্ট্র পরিচালনা, শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে সরকার পরিবর্তন ইত্যাদি ক্ষেত্রে আধুনিক গণতন্ত্রের সঙ্গে জামায়াতের ধারণার সাদৃশ্য রয়েছে। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র মতে, সরকারকে জনসম্মতির ওপর নির্ভরশীল হতে হবে। যে সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ কর্তৃক সমর্থিত নয়, সে সরকার বৈধ নয়।

জামায়াতে ইসলামীর মতে, ইসলাম ধনী-দরিদ্রের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার পক্ষে মত প্রকাশ করেছে। ইসলামী অর্থব্যবস্থাকে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যবর্তী একটি কল্যাণমূলক ব্যবস্থা বলা যায়। বাংলাদেশের জনগণের অর্থনৈতিক

কল্যাণে জামায়াতের অনুসৃত ইসলামী আদর্শ কতটা সফল হবে– সে সম্পর্কে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ না করা পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব হবে না।

এ অধ্যায়ের উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, আধুনিক পাশ্চাত্য ধারণানুসারে– আদর্শ বলতে এমন এক মূল্যবোধ বা বিশ্বাসগত ব্যবস্থাকে বোঝায়, যা সত্য বলে কিছু সংখ্যক মানুষ বা একটি দল বিশ্বাস করে। মূল্যবোধ, বিশ্বাস ইত্যাদি বিষয়ে কাছাকাছি দৃষ্টিভঙ্গি পোষণে সহায়তা করে আদর্শ সমাজকে সুসংহত ও সুস্থিত করতে সাহায্য করে। সমাজের ব্যাপক মানুষ সাধারণত আদর্শকে সত্য বলে গ্রহণ করে নেয়। এ কারণে শাসকশ্রেণি তাঁদের শাসনক্ষমতাকে বৈধ প্রতিপন্ন করার জন্য বিভিন্ন আদর্শ ব্যবহার করতে সচেষ্ট হয়। একটি বিশেষ ধর্মভিত্তিক আদর্শ সে ধর্মের অনুসারীদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্যও ধর্মীয় আদর্শকে ব্যবহার করা হয়। একটি দেশের অধিকাংশ মানুষের ধর্মবিশ্বাসে সাদৃশ্য থাকলে সে দেশে স্থিতিশীলতা বজায় থাকার সম্ভাবনা বেশি থাকে। দেশ-বিশেষের অধিবাসীদের ধর্মবিশ্বাসে ব্যাপক পার্থক্য থাকলে সে দেশের রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিভিন্ন ধরনের জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। বিশেষ রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসীর আচরণ তার বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত হয়। আদর্শের সঙ্গে অনুসারীর একটি আবেগতাড়িত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ কারণে একটি বিশেষ মতাদর্শে বিশ্বাসী মানুষ তাঁর আদর্শ বাস্তবায়নে নিষ্ঠাবান হয়ে থাকেন।

পশ্চিমা শিল্পোন্নত দেশসমূহের রাজনীতিতে এ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে পরস্পরবিরোধী দাবির মধ্যে সমন্বয় সাধন, জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি, কল্যাণ রাষ্ট্রের উদ্ভব ইত্যাদি কারণে আদর্শের প্রভাব হ্রাস পেলেও নিঃশেষ হয়নি। উন্নয়নশীল দেশের রাজনীতিতে এখনও আদর্শের শক্তিশালী ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়। উপনিবেশিক শাসন-শোষণ থেকে মুক্তি, জাতীয় ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও শাসনক্ষমতার বৈধতা অর্জন ইত্যাদি কারণে উন্নয়নশীল দেশসমূহের রাজনৈতিক নেতারা বিভিন্ন আদর্শকে ব্যবহার করতে সচেষ্ট হন।

ইসলাম প্রধানত একটি ধর্ম বলে একে রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে ব্যবহার করা সংগত হবে কি-না এ নিয়ে মুসলিম পণ্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও রাজনীতির সঙ্গে ইসলামের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রশ্নে বিশেষ মতপার্থক্য নেই।

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা বলে মুসলমানরা দাবি করে বিধায় এটি রাজনীতিমুক্ত হতে পারে না। কুরআনের বিভিন্ন বাণী থেকেও ইসলামের সঙ্গে রাজনীতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইসলামী আদর্শের অনুসারীদের মতে, হযরত মুহাম্মাদ সা. কেবল একজন ধর্মপ্রচারক ছিলেন না; তিনি একটি ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের স্থপতি ও পরিচালক ছিলেন। তাই ইসলাম যেমন একটি ধর্ম, তেমনি একটি রাজনৈতিক আদর্শও বটে। পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিমপ্রধান দেশের রাজনৈতিক সংগঠন ইসলামী আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন পরিচালনা করছে।

জামায়াত ইসলামকে শুধু একটি ধর্ম নয়; একটি রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবেও গ্রহণ করেছে। মাওলানা মওদূদীর রচনাসমূহে কুরআন-হাদিসের আলোকে ইসলামের যে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে, জামায়াত প্রধানত তা থেকে ইসলামী আদর্শ খুঁজে পেতে চেষ্টা করে। জামায়াত ইসলামী রাষ্ট্রকে আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র বলে মনে করে। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, আল্লাহর আইন এবং মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নই ইসলামী রাষ্ট্রের লক্ষ্য বলে বিবেচিত হয়। রাষ্ট্র তাই লক্ষ্য নয়; ইসলামী জীবনবিধান বাস্তবায়নের উপায় মাত্র। ইসলামী আদর্শানুসারীরা রাষ্ট্র মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চায় বলে একে সর্বাত্মকবাদী রাষ্ট্র বলেও সমালোচনা করা হয়।

ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসীরাই কেবল ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালক পদে নিয়োজিত হতে পারেন। যে রাষ্ট্রব্যবস্থায় ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়িত, সে রাষ্ট্রই কেবল ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ রাষ্ট্র এবং যে শাসক আল্লাহ প্রদত্ত আদর্শানুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন, তিনিই কেবল ইসলামে বিশ্বাসী জনগণের আনুগত্য দাবি করতে পারেন। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের দাবি উত্থাপন করে জামায়াত পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের বিরোধিতা করছে বলে অনেকে মত প্রকাশ করেছেন। মাওলানা মওদূদী কর্তৃক 'ইজমা'র ওপর 'ইজতিহাদ'-এর অধিক গুরুত্বারোপকে এক ব্যক্তির একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস বলে মনে করা হয়।

জামায়াত তত্ত্বগতভাবে আধুনিক নির্বাচনব্যবস্থার বিরোধিতা করে। জামায়াত নেতাদের নির্বাচন সম্পর্কিত বক্তব্য ও কার্যক্রমে পরস্পরবিরোধিতা পরিলক্ষিত হয়। আইন প্রণয়নের চূড়ান্ত ক্ষমতাধিকারী আইনসভার নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও নির্বাচিত হওয়াকে অনৈসলামিক কাজ বলে ঘোষণা দেওয়া সত্ত্বেও জামায়াত পাকিস্তান ও বাংলাদেশের আইনসভাবর অধিকাংশ নির্বাচনে অংশ নিয়েছে।

যদিও উপরিউক্ত দেশ দুটির ব্যাপক জনমত এখনও জামায়াত প্রত্যাশিত ইসলামী শাসনব্যবস্থা বাস্তবায়নের অনুকূলে সৃষ্টি হয়নি। পৃথক নির্বাচন বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের জন্য কল্যাণকর হবে বলে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ বিশ্বাস করে। এ ব্যবস্থায় প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় জনসংখ্যার ভিত্তিতে তাঁদের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারবেন। অমুসলিম সংখ্যালঘুরা বাস করেন– এমন রাষ্ট্রে ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা সংগত হবে কি-না এ প্রশ্নের উত্তরে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ সংখ্যাগুরুর শাসন বিষয়ক গণতান্ত্রিক ধারণার যুক্তি প্রদর্শন করে থাকে। গণতান্ত্রিক আদর্শে অবিশ্বাস সত্ত্বেও উপরিউক্ত যুক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার প্রয়াসকে রাজনৈতিক সুবিধাবাদ বলে সমালোচনা করা হয়।

মানবাধিকার, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, নির্বাচিত রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনের ভিত্তিকে সরকার গঠন, শাসনতান্ত্রিক সরকার ইত্যাদি প্রশ্নে জামায়াতের তত্ত্বগত ধারণা যা-ই হোক না কেন, বাস্তবে জামায়াতকে এসব প্রশ্নে বর্তমান পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের কাছাকাছি অবস্থান গ্রহণ করতে দেখা যায়। সমালোচকদের মতে, জামায়াত নীতিগতভাবে আধুনিক গণতন্ত্রকে অস্বীকার করলেও এর আবেদন ও সুবিধাসমূহ ব্যবহার করতে চায়।

জামায়াতের মতে, সত্যিকার ধার্মিক লোক কখনও ধর্মান্ধ হতে পারেন না। নৈতিক উন্নয়ন, মানবতার কল্যাণ ও পরকালের মুক্তির জন্য জামায়াত ধর্মকে ব্যবহার করতে চায় বলে দাবি করা হয়। জামায়াত ধর্মনিরপেক্ষতাকে ধর্মহীনতার নামান্তর জ্ঞান করে এটিকে ইসলাম ও নৈতিকতা বিবর্জিত আদর্শ মনে করে।

জামায়াতের মতে, মুনাফা অর্জনই পুঁজিবাদের প্রধান লক্ষ্য। এ কারণে এটিও ধর্ম এবং নৈতিকতাবিরোধী। সমাজতন্ত্রকেও জামায়াত ধর্ম ও মানবতাবিরোধী আদর্শরূপে চিহ্নিত করতে চায়। ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে সমাজতন্ত্রকেই জামায়াত ইসলামের সবচেয়ে বড়ো শত্রু বিবেচনা করে। জামায়াতে ইসলামীর মতে, ইসলাম ভারসাম্যপূর্ণ অর্থব্যবস্থায় বিশ্বাসী। ইসলামের অর্থনৈতিক আদর্শ পুঁজিবাদের অবাধ প্রতিযোগিতা ও সমাজতন্ত্রের নিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক আদর্শের বিরোধী। সাধারণভাবে ব্যক্তি মালিকানায় বিশ্বাসী হলেও জনগণ এবং রাষ্ট্রের কল্যাণের স্বার্থে সরকার দেশের অর্থনৈতিক নানাক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

বাংলাদেশকে একটি আধুনিক কল্যাণরাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে কাজ করছে বলে দাবি করে জামায়াতে ইসলামী। ইসলাম একটি আন্তর্জাতিকতাবাদী রাজনৈতিক আদর্শ বলে জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা ইসলামসম্মত নয় বলে জামায়াতের ধারণা। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও জামায়াত ভূখণ্ড কেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বাস্তবতার কারণে মেনে নিয়েছে বলে ধারণা করা যায়। এক্ষেত্রে একটি বিশেষ ভূখণ্ডকে ইসলামী রাষ্ট্রের মডেলে পরিণত করা সম্পর্কিত জামায়াতের চিন্তা-ভাবনাও কাজ করছে বলে মনে হয়। বাংলাদেশকে ইসলামী রাষ্ট্রের একটি মডেলে পরিণত করতে চায় জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ।

ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ইসলামী বিপ্লব সফল করতে চায়। ইসলামী বিপ্লবে 'তাবলিগ' ও তরবারি'র ভূমিকা থাকলেও বাংলাদেশের মতো দেশে শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলামী বিপ্লব সফল করা সম্ভব হবে বলে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ আশাবাদ ব্যক্ত করেছে। এ কারণেই জামায়াতের মতে– কোনো জনগোষ্ঠীর ওপর জোর করে ইসলামী বিপ্লব চাপিয়ে দেওয়া ইসলামসম্মত কাজ নয়। ইসলামী বিপ্লবের সাফল্যের জন্য কেবল ইসলামী সংগঠনের প্রস্তুতিই যথেষ্ট নয়। এ বিপ্লবের সাফল্যের জন্য আল্লাহর সাহায্য অত্যাবশ্যক। এ অদৃষ্টবাদী মনোভাব জামায়াতের ইসলাম প্রভাবিত আদর্শের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ বলা যায়।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নে বিশেষত একাত্মতা, সংহতি, রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ও বৈধতার প্রশ্নে জামায়াত আদর্শের ভূমিকা পাশ্চাত্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে পুরোপুরি ইতিবাচক বলা যাবে না। তবে এ কথা সত্য যে, বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধিবাসীদের মধ্যে একাত্মতা ও সংহতি বর্ধনের জন্য জামায়াত অনুসৃত ইসলামী আদর্শ সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। বাংলাদেশের ব্যাপক রাজনীতি অনুৎসাহী ধর্মভীরু মানুষকে রাজনীতিতে উৎসাহী করতে জামায়াতে ইসলামী প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র মতে– যে সরকার জনগণের সমর্থনের ওপর নির্ভরশীল নয়, সে সরকার বৈধতা ও আনুগত্য দাবি করতে পারে না। জনগণের অর্থনৈতিক সমস্যা দূর করার জন্য জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র বিভিন্নমুখী কর্মসূচি রয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করতে চায়।

জামায়াতের রাজনৈতিক আদর্শ বিষয়ক তত্ত্বগত ধারণার সঙ্গে প্রয়োগের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। নীতিগতভাবে আল্লাহর সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করলেও জামায়াতে ইসলামী জনগণের পক্ষ থেকে সার্বভৌমত্বের দাবিদার বাংলাদেশ সংসদের নির্বাচনে অংশগ্রণ করেছে। সাংসদ হিসেবে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র নেতাগণ আইন প্রণয়নসহ বিভিন্ন সংসদীয় কার্যক্রমে অংশীদার হচ্ছেন। বাংলাদেশ, ভূখণ্ডকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় রাষ্ট্রকে জামায়াত মেনে নিয়েছে। তত্ত্বগতভাবে আধুনিক পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের বিরোধিতা করলেও কার্যত পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের সুবিধাসমূহ জামায়াতে ইসলামী ব্যবহার করতে চায় বলে ধারণা করা যায়। আধুনিক নির্বাচন ব্যবস্থানুযায়ী বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত নির্বাচনসমূহে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ অংশ নিয়েছে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, নীতিগতভাবে ইসলামী আদর্শে অবিচল থাকার কথা বললেও কার্যত রাজনৈতিক বাস্তবতার কারণে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'-কে অনেক ক্ষেত্রে আধুনিক ধ্যানধারণার সঙ্গে আপস করতে হচ্ছে। সময়ের পরিবর্তন ও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র সাংগঠনিক ব্যাপ্তি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার প্রবণতাও বাড়ছে বলে ধারণা করা যায়।

*****

উপসংহার

এ গ্রন্থের পূর্বোক্ত অধ্যায়সমূহে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র নেতৃত্ব, সংগঠন ও আদর্শ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে বাংলাদেশের রাজনীতিতে এগুলোর ভূমিকা বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। নিম্নে ঐ বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হলো।

১৯৭৯ সাল থেকে প্রকাশ্যভাবে বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামীর কার্যক্রম শুরু হলেও এ সংগঠনটি বাংলাদেশ স্বাধীনতা পরবর্তীকাল থেকেই নানাভাবে সক্রিয় ছিল। বর্তমান বাংলাদেশ ভূখণ্ডের অধিবাসী জামায়াতের নেতা-কর্মীগণের উদ্যোগ ও নেতৃত্বেই 'জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ' গঠিত হয়। সময় ও পরিস্থিতি পরিবর্তনের কারণে জামায়াতের কর্মসূচি ও কার্যক্রমে বিভিন্ন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হলেও মাওলানা মওদূদী কর্তৃক সংগঠিত ও পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের আদর্শ ও কর্মধারাই এ সংগঠন এখনও প্রধানত অনুসরণ করছে। নেতৃত্ব, সংগঠন ও আদর্শ বিষয়ক জামায়াত ধারণাও মওদূদীর চিন্তাধারা কর্তৃক ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছে।

নেতৃত্ব সম্পর্কে পাশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষ ধারণার সঙ্গে ইসলামী ধারণার কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাদৃশ্য থাকলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। যেমন– ধর্মবিশ্বাস, নেতৃত্বের যোগ্যতা, মর্যাদা, বৈধতা, নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য, নেতা নির্বাচন পদ্ধতি, কেবল পুরুষ নেতৃত্ব অনুমোদন ইত্যাদি।

নেতৃত্বলাভের জন্য একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত যোগ্যতাকে ইসলাম গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামকরূপে বিবেচনা করলেও এর সঙ্গে কতিপয় শর্ত যুক্ত করেছে। ইসলামের মতে, মুসলমানদের প্রথম চার খলিফা ইসলামী নেতৃত্বের মডেল বলে বিবেচিত হন। এখানে উল্লেখ্য যে, হযরত মুহাম্মাদ সা.-এর নেতৃত্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্রে গোত্রীয় আধিপত্য হ্রাস পেলেও পরবর্তীকালে এটি আবার

মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। প্রথম চার খলিফার শাসনকালের পর গোত্রীয় আধিপত্যের ভিত্তি বিশেষভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং এ ব্যবস্থা দীর্ঘদিন পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বে চালু থাকে। মুসলিম সাম্রাজ্যের পরিসর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের বিশ্বজনীন মানবতা, সাম্য, মৈত্রী ইত্যাদি আদর্শের স্থলে মুসলমানদের মধ্যে মতভিন্নতা, হিংসা-দ্বেষ, ক্ষমতাপ্রীতি, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ইত্যাদি বেড়ে যায়। রাজনীতি ও রাষ্ট্র বিষয়ক ইসলামের তত্ত্বগত ধারণার সঙ্গে প্রয়োগের পার্থক্যও ক্রমশ বাড়তে থাকে।

ইসলামী নেতৃত্বকে অনুসারীগণ কর্তৃক নির্বাচিত হওয়ার কথা বলা হলেও নির্বাচনের কোনো সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ইসলাম নির্দেশ করেনি। বিভিন্ন মুসলিম পণ্ডিতের মতে– সময় ও অবস্থা উপযোগী নির্বাচনব্যবস্থা মুসলমানগণ অনুসরণ করতে পারেন। নেতৃত্ব-বিষয়ক উপরিউক্ত ইসলামী ধারণা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ইসলাম ব্যক্তির ব্যক্তিগত ও ধর্মীয় যোগ্যতা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন লাভ বিষয়কে একসঙ্গে বিবেচনা করে যোগ্যতা ও সংখ্যার মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে চেষ্টা করেছে। ইসলামী নেতৃত্বকে মজলিশে শূরার পরামর্শানুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করতে হয়। ইসলামের শূরা-বিষয়ক ধারণাকে এক ব্যক্তির শাসন ও জনগণের শাসনের মধ্যে ভারসাম্যমূলক ব্যবস্থা হিসেবে দেখা যেতে পারে। সে কালের শূরা কার্যক্রমের সঙ্গে আধুনিক আইনসভার কার্যক্রমের সাদৃশ্য রয়েছে বলেও মনে করা হয়। ধারণা করা হয় যে, নেতৃত্ব সম্পর্কিত জামায়াতে ইসলামীর ধারণা ইসলামের পূর্বোল্লিখিত ধারণাকে আদর্শ হিসেবে সামনে রেখে গড়ে উঠেছে।

জামায়াতে ইসলামীর মতে, নেতৃত্বই ইসলামী সমাজ, রাষ্ট্র ও সংগঠনের চালিকাশক্তিরূপে কাজ করে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে উত্তরাধিকার এবং সম্মোহনভিত্তিক নেতৃত্ব জনমনে আবেদন সৃষ্টি করার ইতিহাস থাকলেও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র মতে কেবল ব্যক্তিগত ও ঈমানি যোগ্যতা বলেই একজন মুসলিম পুরুষ মুসলমানদের নেতার আসনে আসীন হতে পারেন। নেতৃত্বের ব্যক্তিগত ও ঈমানি যোগ্যতা-বিষয়ক যেসব দিকের কথা জামায়াতের সাহিত্য ও দলীয় প্রকাশনায় নির্দেশ করা হয়েছে, বিভিন্ন স্তরের জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র নেতাগণ সেসব যোগ্যতা ও গুণাবলি অর্জনের ক্ষেত্রে কতটা সাফল্য অর্জন করেছেন– তা সুস্পষ্ট নয়।

মহিলা-নেতৃত্ব সম্পর্কে জামায়াতের তত্ত্বগত ধারণায় পরিবর্তন না এলেও বাস্তবতার কারণে এ বিষয়ে বর্তমানে যথেষ্ট নমনীয় মনোভাব গ্রহণের আভাস

পাওয়া যাচ্ছে। বর্তমান জাতীয় সংসদে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ মনোনীত দুজন মহিলা সাংসদ রয়েছেন। সংসদে তাঁরা দুটি নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্ব করছেন। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র সাংসদদের সমর্থন ব্যতীত বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপির পক্ষে সরকার গঠন হয়তো সম্ভব হতো না। বিএনপি সরকার গঠনে সমর্থ হলে বেগম জিয়াই সরকারপ্রধান হবেন– এটি নিশ্চিত জেনেও জামায়াত রাজনৈতিক কারণে একটি মুসলিমপ্রধান দেশের সরকারপ্রধান হিসেবে একজন মহিলার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সমর্থন দিয়েছে। মহিলা নেতৃত্ব সম্পর্কে জামায়াতের এই নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি সত্ত্বেও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রভাবিত বাংলাদেশের মুসলিম জনগণ বিশেষত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মহিলাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মন থেকে পর্দাপ্রথাসহ অন্যান্য শরিয়তি আইনের কড়াকড়ি সম্পর্কিত ভীতি দূরীকরণে জামায়াত এখন পর্যন্ত খুব বেশি সফল হয়নি।

ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী ব্যক্তিবর্গই কেবল মুসলমানদের নেতৃত্ব লাভ করতে পারেন। অমুসলিমরা মুসলমানদের নেতা হতে পারেন না। জামায়াতের মতে, কুরআন ও হাদিসের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দিতে হয় না– এমন সরকারি কাজে অমুসলিমরা নেতৃত্ব দিতে পারেন; অর্থাৎ, নিয়োজিত হতে পারেন। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র উপরিউক্ত দৃষ্টিভঙ্গি অমুসলিমদের নিকট গ্রহণীয় হওয়ার সম্ভাবনা কম বলে ধারণা করা যায়।

নীতিগতভাবে নেতৃত্ব প্রার্থিতা অনুমোদন না করলেও ব্যাপক মুসলিম জনগণ অথবা ইসলামী সংগঠনের সাধারণ সদস্যদের নেতৃত্ব বাছাই কাজে সহায়তাদানের উদ্দেশ্যে ইসলামী সংগঠন নেতা নির্বাচনে প্রার্থী দিতে পারে বলে জামায়াত ধারণা পোষণ করে। আমীরে জামায়াত নির্বাচনে মজলিশে শূরা তিনজনের একটি প্যানেল সদস্যদের বিবেচনার্থে উপস্থাপন করে। তত্ত্বগত ধারণা পরিবর্তন না করেও বাংলাদেশের বিভিন্ন নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী প্রার্থী দিয়ে থাকে।

ইসলামী আদর্শ অনুসারী নেতৃত্বকে নায়েবে রাসূলের সমান মর্যাদাসম্পন্ন মনে করা হয় বলে এ জাতীয় নেতৃত্বের আনুগত্য ও নির্দেশ পালনকে জামায়াত ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করে। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র আন্দোলন ও সংগঠনে আমীরে জামায়াতের ব্যাপক মর্যাদা ও ক্ষমতা উপরিউক্ত ধারণা ও বিশ্বাসের আলোকে নির্ধারিত হয়েছে বলা যায়। জামায়াতে ইসলামীর সদস্যপদ প্রদান, স্থগিতকরণ ও প্রত্যাহারের ক্ষমতা আমীরে জামায়াতের হাতে ন্যস্ত।

কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য, সাংগঠনিক সেক্রেটারি, অধস্তন সংগঠনের আমীর বা নায়েম নিয়োগ ও অপসারণের ক্ষমতাও আমীরে জামায়াতের হাতে কেন্দ্রীভূত। আমীরে জামায়াতের প্রতিনিধি হিসেবেই জামায়াতের সকল অধস্তন নেতারা তাঁদের দায়িত্ব পালন করেন। এককথায়, আমীরে জামায়াতের নেতৃত্বেই জামায়াতের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। জামায়াতের বায়তুলমালের রক্ষক হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেন। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্যগণ সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্যদের ন্যায় আমীরে জামায়াতের নেতৃত্বে জামায়াতের বিভিন্ন বিভাগসমূহ পরিচালনা করেন। এভাবে জামায়াতের সার্বিক কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, আমীরে জামায়াতই এ সংগঠনের মূল পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক। ইসলামী আদর্শানুসারী রাজনীতিতে জাগতিক-অজাগতিক ক্ষমতার বিভাজন স্বীকৃত হয় না বিধায় ধর্মনিরপেক্ষ সংগঠনের নেতৃত্বের তুলনায় এ জাতীয় সংগঠনের নেতৃত্বের ক্ষমতা ও মর্যাদা বেশি হওয়া স্বাভাবিক। ইসলামী আদর্শভিত্তিক রাজনৈতিক সংগঠন জামায়াতের নেতৃত্বের ক্ষমতা ও মর্যাদা উপরিউক্ত দৃষ্টিকোণ থেকেই বিবেচনা ও মূল্যায়ন করতে হবে।

জামায়াতের ক্যাডারব্যবস্থার প্রথম তিনটি ধাপের কাজকর্মে সাফল্য প্রদর্শন ব্যতীত শেষোক্ত ধাপ অর্থাৎ সদস্যপদ লাভ করা যায় না। সদস্যরাই সংগঠন ও দেশের বিভিন্ন স্তরের নেতা নির্বাচন অংশগ্রহণ করেন ও মনোনীত হন। জামায়াতের সকল সদস্যকে ইসলামের মৌলিক নীতিমালাসমূহ মেনে চলার কথা বলা হলেও কার্যত সকল সদস্য সব ইসলামী বিধিনিষেধ সব সময় মেনে চলেন কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্বের সামাজিক পটভূমি সম্পর্কিত জরিপ থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, গ্রামের ধর্মপ্রভাবিত পরিবেশে বেড়ে উঠা লোকজনই জামায়াতের আদর্শানুসারী রাজনীতির প্রতি তুলনামূলক বেশি আকৃষ্ট হয়েছেন। বর্তমান জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র নেতৃত্বেও গ্রামে জন্মগ্রহণকারী নিম্নবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোকজনের সুস্পষ্ট প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক ও ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণকারী লোকজন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র বর্তমান নেতৃত্বে আসীন থাকলেও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। বাংলাদেশের অন্য কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃত্বে উল্লিখিত দুই ধরনের শিক্ষাধারী লোকজনের এরূপ সহাবস্থান পরিলক্ষিত হয় না।

প্রায় চৌদ্দশত বছর পূর্বে ইসলামের উন্মেষ ও বিকাশকালে বর্তমান সময়ের ন্যায় রাজনৈতিক দল বা সংগঠন গড়ে ওঠেনি। এ কারণে রাজনৈতিক সংগঠন-বিষয়ক আধুনিক ধারণার সঙ্গে ইসলামী ধারণার পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। সংগঠন-বিষয়ক ইসলামী ধারণার আলোকে মাওলানা মওদূদী ও অন্যান্য জামায়াতনেতারা আধুনিক যুগে কার্য পরিচালনা উপযোগী একটি ইসলামী সংগঠন গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। এ কারণে সংগঠন গড়ার উদ্দেশ্য, কার্যক্রম ইত্যাদি ক্ষেত্রে আধুনিক পাশ্চাত্য ধারণার সঙ্গে এ সম্পর্কিত জামায়াত ধারণার কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হলেও অনেক ক্ষেত্রে রয়েছে সুস্পষ্ট পার্থক্য।

মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম হওয়ার পর হযরত মুহাম্মাদ সা. প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সংগঠন ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। মুহাম্মদ সা.-এর পর খুলাফায়ে রাশিদিনের সময়েও স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সংগঠন দেখা যায়নি। এ কারণে মুসলিম পণ্ডিতগণ দলব্যবস্থা বিশেষত প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক দলব্যবস্থা ইসলাম সম্মত কিনা এ বিষয়ে একমত হতে পারেননি। দলব্যবস্থার পক্ষাবলম্বীদের মত হচ্ছে, ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না থাকাবস্থায় ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য সংগঠনভুক্ত হওয়া মুসলমানদের জন্য অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। বর্তমান যুগে একটি দেশের মুসলমানরা ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য একাধিক ইসলামী সংগঠনে কাজ করতে পারেন। সংগঠন সম্পর্কিত উপরিউক্ত ইসলামী ধারণার সঙ্গে এ সম্পর্কিত জামায়াত ধারণার সামঞ্জস্য রয়েছে।

জামায়াতে ইসলামীর মতে, ইসলামী সংগঠন ধর্মীয় মর্যাদার অধিকারী। এ কারণে সংগঠনের দায়িত্ব পালন জামায়াতের নেতা-কর্মীরা পূণ্য বা সওয়াবের কাজ বলে বিবেচনা করেন। জামায়াতের মতে, ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য মুসলমানদের অবশ্যই সংগঠনভুক্ত হতে হবে। ইকামতে দ্বীনের কাজে নিয়োজিত উৎকৃষ্টতর সংগঠনে যোগদান ব্যতিরেকে কোনো মুসলমান ইসলামী সংগঠন ত্যাগ করতে পারেন না। বাংলাদেশে ইকামতে দ্বীনের কাজে নিয়োজিত সংগঠনসমূহের মধ্যে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ নিজেকে শ্রেষ্ঠতম বিবেচনা করে। উপরিউক্ত বক্তব্যসমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের মুসলমানদের জামায়াতে যোগদান করা ধর্মীয় দায়িত্ব এবং এ সংগঠন ত্যাগ ধর্মীয় দৃষ্টিতে বাঞ্ছিত নয়।

সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধির চেয়ে গুণগত মানসম্পন্ন সদস্য তৈরি করার ওপর জামায়াত বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। কোনো ব্যক্তিকেই সরাসরি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র সদস্যপদ দেওয়া হয় না। জামায়াতের ক্যাডারব্যবস্থার প্রথম তিন ধাপের কার্যক্রমে যে ব্যক্তি সফলতা প্রদর্শন করতে পারেন, তিনিই কেবল সংগঠনটির সদস্যপদ পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হন। এ কারণে এখন পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র সদস্য সংখ্যা খুব বেশি বৃদ্ধি পায়নি। জনপ্রিয় গণ-রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত হওয়া জামায়াতে ইসলামীর পক্ষে সম্ভব হয়নি। সংগঠনকে তৃণমূল পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টাতেও ব্যাপক সাফল্য আসেনি।

জামায়াতের সাংগঠনিক সিদ্ধান্তসমূহ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করে নেওয়া হয় বলে দাবি করা হয়। সংগঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র সকল সদস্যের প্রতিনিধিত্ব থাকে। সাংগঠনিক শৃঙ্খলা রক্ষার ওপরও জামায়াত সবিশেষ গুরুত্বারোপ করে। জামায়াতে এখন পর্যন্ত কোনো বড়ো ধরনের ভাঙন দেখা দেয়নি। এ দেশের রাজনৈতিক দলের ইতিহাসে এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা বলে বিবেচিত হতে পারে।

জামায়াত ইসলামের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন চায়। এ কারণে নেতা-কর্মীদের জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রে এ সংগঠন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। জামায়াতের এ প্রভাব বিস্তার ও নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টার সঙ্গে পাশ্চাত্যের সর্বাত্মকবাদ অনুসারী সংগঠনসমূহের আচরণের সাদৃশ্য দেখা যায়।

দাওয়াত ও তাবলিগ, সংগঠন ও প্রশিক্ষণ, সংশোধন ও সংস্কার এবং সরকারব্যবস্থা সংশোধন– এ চার দফা কর্মসূচিকে সামনে রেখে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ সংগঠন তার প্রায় সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। জামায়াতের প্রত্যেক কর্মীকে দাওয়াত ও তাবলিগের কাজে অংশগ্রহণ করতে হয়। জনগণের মধ্যে বক্তব্য প্রচারের জন্য জামায়াত বিভিন্ন গণমাধ্যম ব্যবহারের প্রয়াস পায়। নিজস্ব প্রচারমাধ্যম সৃষ্টির ক্ষেত্রেও জামায়াতের সাফল্য কম নয়। গুণগতমান যা-ই হোক না কেন ঊর্ধ্বতন জামায়াত নেতাদের অনেকে সংগঠনের আদর্শানুসারী বই-পুস্তক লিখেছেন। বাংলাদেশের অন্য যেকোনো রাজনৈতিক দলের তুলনায় লেখালেখির ক্ষেত্রে জামায়াত নেতাদের সাফল্য বেশি বলে মনে হয়। ইসলামী সংস্কৃতির চর্চা ও প্রসারের জন্য জামায়াতে ইসলামী সারা দেশে বিভিন্ন নামে অনেকগুলো সংগঠনও গড়ে তুলেছে। জামায়াতের নেতা-কর্মীরাই এসব সংগঠন পরিচালনা করেন।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, জামায়াতে ইসলামীর সকল কার্যক্রম আমীরে জামায়াতকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থা 'মজলিশে শূরা' নির্বাচিত সদস্যদের ফোরাম বলে পরিচিত হলেও এ সংস্থাতেও আমীরে জামায়াত মনোনীত সদস্যরা রয়েছেন। জামায়াতের মহিলা বিভাগ সরাসরি আমীরে জামায়াতের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। জামায়াতের সর্বস্তরের সংগঠনকে তাদের কার্যক্রমের লিখিত রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সংগঠন তথা আমীরে জামায়াতের নিকট পেশ করতে হয়। জামায়াতের সকল শাখা-সংগঠনে পরিকল্পনার ভিত্তিতে যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়। উর্ধ্বতন সংগঠন নিম্নতর সংগঠনের বিভিন্ন পরিকল্পনা অনুমোদন দান করে। সমগ্র সংগঠনের পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সংগঠন তথা আমীরে জামায়াত কর্তৃক অনুমোদিত হতে হয়। এভাবে গোটা সংগঠনের ওপর আমীরে জামায়াতের নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে। এ কারণে জামায়াতকে আমীর নির্ভর সংগঠন বলেও সমালোচনা করা হয়।

সমাজ সংশোধন ও সংস্কারের লক্ষ্যে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পাঠাগার, চিত্ত-বিনোদন, শরীরচর্চা, প্রকাশনা ইত্যাদি গড়ার ক্ষেত্রে সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করে। সমাজসেবার জন্য জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র অনেকগুলো প্রকল্প রয়েছে। বাংলাদেশের অন্য কোনো রাজনৈতিক দল কর্তৃক এত বেশি সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয় না। জামায়াত-প্রভাবিত ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড সুদবিহীন ব্যাংকিং ও ইসলামী অর্থব্যবস্থার বাস্তবতা প্রমাণের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

সরকার সংশোধনবিষয়ক জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র কার্যক্রম গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করে পরিচালিত হয়। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ মনে করে– মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হওয়ায় জনগণের মাঝে সচেতনতা তৈরি করার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করে বাংলাদেশকে ইসলামী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করা সম্ভব।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ তার আদর্শ ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনেকগুলো অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ও সহযোগী সংগঠন সৃষ্টি করেছে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জামায়াতের নেতারাই এসব অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনসমূহ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। দেশের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন পেশার লোকজনের মধ্যে পূর্বোক্ত অঙ্গ ও সহযোগী

সংগঠনসমূহ কাজ করে থাকে। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র সহযোগী সংগঠন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির বর্তমান বাংলাদেশের প্রধান তিনটি ছাত্র সংগঠনের একটি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। এ সংগঠন দেশের আধুনিক ও ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণরত শিক্ষার্থীদের একই প্ল্যাটফরমে ঐক্যবদ্ধ করতে অন্যান্য ছাত্র সংগঠনগুলো অপেক্ষা বেশি সফল হয়েছে। স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের ইসলামী আদর্শানুযায়ী রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রেও এ সংগঠনের সাফল্য উল্লেখযোগ্য। জামায়াতের নেতা-কর্মী-সমর্থক সরবরাহের ক্ষেত্রেও ইসলামী ছাত্রশিবির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

আধুনিক পাশ্চাত্য ধারণানুসারে আদর্শ হচ্ছে এমন একটি মূল্যবোধ বা বিশ্বাসগত ব্যবস্থা যা কিছু সংখ্যক মানুষ বা একটি দল সত্য বলে বিশ্বাস করে। ইসলাম কেবল একটি আদর্শ নয়, এটি মুসলমানদের ধর্মও বটে। ইসলামকে রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে ব্যবহার করা সংগত হবে কি-না এ নিয়ে মুসলমান পণ্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও বিভিন্ন দেশের ইসলামী সংগঠনের রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে ইসলাম ব্যবহৃত হচ্ছে। আলোচ্য সংগঠন ইসলামকে কেবল একটি ধর্ম নয়, একটি রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবেও বিশ্বাস করে।

জামায়াতের মতে, ইসলামী রাষ্ট্র হচ্ছে একটি আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও আল্লাহর আইন তথা ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নই ইসলামী রাষ্ট্রের লক্ষ্য। সংগঠনটির মতে, ইসলামী রাষ্ট্র মূলত ইসলামী জীবনাদর্শ বাস্তবায়নের উপায় মাত্র। যেহেতু ইসলামকে পরিপূর্ণ জীবনবিধান বলে দাবি করা হয়, সেহেতু ইসলামী আদর্শানুসারী রাষ্ট্র মানবজীবনের সকল কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণের অধিকার পোষণ করে। এ কারণে ইসলামী রাষ্ট্রকে সর্বাত্মকবাদী (Totalitarian State) রাষ্ট্র বলে বিবেচনা করা যায়।

আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও আল্লাহর আইন সম্পর্কিত জামায়াতের ধারণা এ সম্পর্কিত আধুনিক পাশ্চাত্য ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তত্ত্বগতভাবে আধুনিক নির্বাচনব্যবস্থা এবং নেতৃত্ব প্রার্থীতারও জামায়াত বিরোধিতা করে। তবে উপরিউক্ত দুটি বিষয়ে জামায়াতের তত্ত্বগত ধারণার সঙ্গে প্রয়োগের পার্থক্য দেখা যায়। আইন প্রণয়ন ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ক্ষমতাধিকারী পাকিস্তান ও বাংলাদেশের আইনসভার প্রায় সকল নির্বাচনে জামায়াত অংশ নিয়েছে। যদিও উপরিউক্ত দুটি দেশের জনমত কখনও ব্যাপকভাবে ইসলামী আদর্শানুসারী

রাষ্ট্রব্যবস্থার অনুকূলে যায়নি। বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার কথা বললেও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের যৌথ নির্বাচনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করেছে। জামায়াত আধুনিক গণতন্ত্রকে ইসলামসম্মত আদর্শ মনে করে না। এতদ্‌সত্ত্বেও অমুসলিম সংখ্যালঘুরা বাস করেন– এমন রাষ্ট্রে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য আধুনিক গণতন্ত্রের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিষয়ক ধারণাকে জামায়াত ব্যবহার করে থাকে। জামায়াতের এ জাতীয় কৌশল ও ভূমিকাকে রাজনৈতিক সুবিধাবাদ হিসেবে দেখা হয়। মানবাধিকার, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, নির্বাচনব্যবস্থা, সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের ভিত্তিতে সরকার গঠন ইত্যাদি বিষয়ে জামায়াতের তত্ত্বগত বা আদর্শগত ধারণা যা-ই হোক না কেন, বাস্তবে উপরিউক্তি বিষয়সমূহে পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক আদর্শের সঙ্গে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র বর্তমান অবস্থান পূর্বের তুলনায় নিকটতর বলা যায়। সমালোচনা করা হয় যে, নীতিগতভাবে আধুনিক গণতন্ত্রে বিশ্বাস না করা সত্ত্বেও জামায়াত আধুনিক গণতন্ত্রের সুবিধাসমূহ ব্যবহার করতে চায়।

ধর্মনিরপেক্ষতাকে জামায়াত ধর্মহীনতা বলে বিবেচনা করে। পুঁজিবাদের অবাধ প্রতিযোগিতা ও সমাজতন্ত্রের চরম নিয়ন্ত্রিত অর্থব্যবস্থার বিরোধিতা করে জামায়াত কল্যাণমূলক অর্থনীতির পক্ষে মত প্রকাশ করেছে।

ইসলাম একটি আন্তর্জাতিকতাবাদী আদর্শ বিধায় জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ইসলাম সমর্থন করে না। কিন্তু বিশ্বের সমগ্র মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলের সমন্বয়ে একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় বলে জামায়াতকে জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা মেনে নিতে হয়েছে। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশকে বিশ্ব মুসলিমের জন্য অনুকরণীয় একটি মডেল রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায়। ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশে ইসলামী বিপ্লব সফল করতে আগ্রহী। জামায়াতের মতে, ইসলামী বিপ্লবে শক্তির ভূমিকা থাকলেও শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বাংলাদেশে এ বিপ্লব সফল করা সম্ভব। শক্তি প্রয়োগ করে কোনো দেশের জনগণের ওপর ইসলাম চাপিয়ে দেওয়াকে জামায়াত ইসলামসম্মত কাজ মনে করে না। জামায়াতের মতে, ইসলামী বিপ্লবের সাফল্যের জন্য কেবল ইসলামী সংগঠনের প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়। এ ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর সাহায্য অত্যন্ত প্রয়োজন। জামায়াত অনুসৃত ইসলামী আদর্শের সঙ্গে উপরিউক্ত অদৃষ্টবাদী মনোভাব সামঞ্জস্যপূর্ণ বলা যায়।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নে জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্ব, সংগঠন ও আদর্শ বিভিন্নভাবে ভূমিকা পালন করছে। তবে এক্ষেত্রে স্মর্তব্য যে, রাজনৈতিক উন্নয়নের পাশ্চাত্য ধারণার সঙ্গে ইসলাম ও জামায়াত ধারণার পার্থক্য রয়েছে। বাংলাদেশের জনগণ বিশেষত এ দেশের মুসলিম অধিবাসীদের মধ্যে একাত্মতা ও সংহতি প্রতিষ্ঠায় জামায়াত প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। রাজনীতি-উদাসীন গ্রামীণ মানুষকে ইসলামের নামে হলেও রাজনীতিতে উৎসাহী ও অংশগ্রহনেচ্ছু করার ক্ষেত্রে জামায়াতের কার্যক্রমে সাফল্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। জামায়াতের অধিকাংশ নেতা-কর্মী গ্রামীণ পটভূমি থেকে এসেছেন। গত সংসদ নির্বাচনে গ্রামীণ নির্বাচনী এলাকা থেকেই জামায়াতের সকল সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন। দেশের রাজনীতিবিমুখ আলেমগণকে রাজনীতিতে আগ্রহী ও সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার জন্য জামায়াত প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। পূর্বের যেকোনো সময়ের তুলনায় বর্তমানে বাংলাদেশের পীর, আলেম প্রভৃতি ধর্মগুরুরা জামায়াতের প্রতি বেশি নমনীয় মনোভাব পোষণ করেন বলে ধারণা করা যায়। ধর্মপরায়ণ মুসলিম মহিলাদের রাজনীতিতে আগ্রহী করে তুলতেও জামায়াত প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। মুসলিম মহিলাদের মধ্যে বাংলাদেশের অন্য কোনো ইসলামী রাজনৈতিক সংগঠনের কাজ নেই।

স্বৈরাচারবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের ফলে বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জামায়াতের যোগাযোগ আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে ধারণা করা হয়। জনগণের সমর্থনের ওপর নির্ভরশীল নেতৃত্ব ও সরকারকে জামায়াত বৈধ নেতৃত্ব ও সরকার বলে বিবেচনা করে। জামায়াতের মতে– যোগ্য, দক্ষ ও ধর্মভীরু নেতৃত্ব এবং ইসলামী আদর্শানুসারী সংগঠনের পক্ষেই কেবল জনগণের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ সাধন সম্ভব। দেশের জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কল্যাণের জন্য জামায়াত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যাপক উন্নয়ন এবং এর ব্যবহারকে নিশ্চিত করতে চায়। জামায়াত এখন পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ বা সরকার গঠনে সক্ষম হয়নি। এ কারণে বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নে জামায়াতের সাফল্য-ব্যর্থতা এখনও সঠিকভাবে নিরূপণ করা সম্ভব নয়।

ইসলাম মুসলমানদের ধর্ম এবং ইসলামী রাষ্ট্র ও সংগঠনের নেতৃত্বে কেবল মুসলমানরাই আসীন হতে পারেন বলে ইসলামের নেতৃত্ব, সংগঠন ও আদর্শ বিষয়ক ধারণা বাংলাদেশের অমুসলিম অধিবাসীগণ কর্তৃক সাধারণভাবে গৃহীত না হওয়াই স্বাভাবিক। এ কারণে সক্রিয় প্রচেষ্টা সত্ত্বেও জামায়াতের সঙ্গে

অমুসলিমদের দূরত্ব খুব একটা কমেনি। বাংলাদেশের বিভিন্ন উপজাতীয়দের মধ্যে জামায়াতের কর্মপ্রয়াস দেখা গেলেও তাতে বিশেষ সাফল্যলাভ সম্ভব হয়নি। তবে এ কথা সত্য যে, অমুসলিম ও উপজাতীয়দের মধ্যে জামায়াত ব্যতীত বাংলাদেশের অন্য কোনো ইসলামী রাজনৈতিক সংগঠনের কর্মতৎপরতা নেই বলা চলে। মহিলা নেতৃত্ব, পর্দাপ্রথা, বিভিন্ন শরিয়তি আইনের কড়াকড়ি ইত্যাদি বিষয়ক জামায়াত দৃষ্টিভঙ্গি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রভাবিত বাংলাদেশের মুসলিম জনগণ বিশেষত মুসলিম মহিলাদের নিকট সমাদৃত না হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বাংলাদেশের রাজনীতিতে জামায়াত বর্তমানে একটি শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে আবির্ভূত হতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশের প্রধান চারটি রাজনৈতিক দলের একটি হিসেবে জামায়াত বিবেচিত হয়। ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থাকামী সংগঠনসমূহের মধ্যে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র স্থান সর্বোচ্চে। সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ও ঐক্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে জামায়াতের সাফল্য বাংলাদেশের অন্য যেকোনো সংগঠনের তুলনায় অনেক বেশি বলা যায়। বাংলাদেশকে একটি ইসলামী আদর্শানুসারী রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে পরিচালিত জামায়াত কার্যক্রম কখন সফল হবে কিংবা কখনও পুরোপুরি সফল হবে কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব না হলেও বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি শাক্তিশালী সংগঠন হিসেবে জামায়াত তার অবস্থান দীর্ঘদিন বজায় রাখতে সক্ষম হতে পারে। জামায়াত অনুসৃত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা বিষয়ক ইসলামী নীতিমালা কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপরিবর্তনীয় বলে মনে করা হয়। উক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কিত পরিবর্তনশীল চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র পক্ষে কতটা খাপ খাইয়ে নেওয়া সম্ভব হবে– সে সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা কঠিন। অপ্রতিরোধ্য বাস্তবতার সঙ্গে জামায়াতের সমন্বয় প্রচেষ্টা আমরা লক্ষ করেছি। এ প্রচেষ্টায় যত বেশি সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হবে আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রত্যাশী বাংলাদেশের মুসলিম জনগণের নিকট জামায়াতের গ্রহণযোগ্যতাও তত বেশি বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

জামায়াত নেতৃত্ব, সংগঠন ও আদর্শবিষয়ক এ অধ্যয়ন থেকে নিম্নোক্ত সাধারণিকরণে উপনীত হওয়া যায়। বাংলাদেশের অন্যান্য আদর্শবাদী ক্যাডার সংগঠন সম্পর্কে গবেষণা হলে সাধারণীকৃত এসব ধারণার যথার্থতা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে।

১. তত্ত্বগত ধারণা যা-ই হোক না কেন, জামায়াতের ন্যায় আদর্শবাদী ক্যাডার সংগঠনের প্রধান নেতা ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন এবং তাঁকে কেন্দ্র করেই এ জাতীয় সংগঠনের প্রায় সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

২. ইসলামী আদর্শানুসারী ক্যাডার সংগঠন জামায়াত তার সদস্যদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে চায়। এ জাতীয় সংগঠন সদস্যদের স্বাধীন চিন্তাশক্তি বিকাশে সাধারণত সহায়ক হয় না। পাশ্চাত্যের সর্বাত্মকবাদ আদর্শানুসারী সংগঠনসমূহের প্রভাব বিস্তারকরণ প্রচেষ্টার সঙ্গে এক্ষেত্রে জামায়াতের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

৩. ইসলামী রাষ্ট্রের নেতৃত্বের যোগ্যতা, বৈধতা, মহিলা নেতৃত্ব, নেতৃত্ব প্রার্থিতা, ইসলামী সংগঠনের সদস্যপদ লাভ, সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, জাতীয়তাবাদ, জাতীয় রাষ্ট্র ইত্যাদি বিষয়ে জামায়াতের তত্ত্বগত ধারণার সঙ্গে প্রয়োগের পুরোপুরি সাদৃশ্য দেখা যায় না।

৪. আল্লাহর সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস সত্ত্বেও জাতীয় রাষ্ট্রের সার্বভৌম আইন পরিষদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ, সার্বভৌম আইনসভার আইন প্রণয়ন কার্যে অংশগ্রহণ, আধুনিক গণতন্ত্রে বিশ্বাস না করেও এ ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ প্রভৃতি স্ববিরোধিতা বা অসংগতি জামায়াত রাজনীতিতে পরিদৃষ্ট হয়।

৫. আদর্শবাদী ক্যাডার সংগঠন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ জনপ্রিয় গণ-সংগঠনে পরিণত হতে চাইছে বলে নেতৃত্ব, সংগঠন ও আদর্শের বিভিন্ন বিষয়ে বর্তমানে নমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করছে। জামায়াতের ব্যাপ্তি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সংগঠনের নিয়ম-শৃঙ্খলা, সদস্যগণ কর্তৃক সংগঠন নির্ধারিত দায়িত্ব পালন ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে কঠোরতা অবলম্বন করার কথা তাতেও ধীরে ধীরে শিথিলতা আসছে বলে ধারণা করা যায়।

*****

শব্দকোষ

ওহি – প্রত্যাদেশ

আকিদা – বিশ্বাস

আকায়িদ – আকিদা শব্দের বহুবচন

আমর বিল মারুফ – সৎকাজের নির্দেশ

আমীর – পরিচালক/নেতা/সভাপতি

আমীরে জামায়াত – জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'র আমীর

আমল – কার্যক্রম/কার্যাবলি

আম্বিয়া – নবি শব্দের বহুবচন

আরকানে ইজতেমা – রুকন সম্মেলন/বৈঠক

আল জামায়াত – হযরত মুহাম্মাদ সা.-এর নেতৃত্বাধীন ইসলামী সংগঠন

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত – খারেজি, শিয়া, মুতাযিলা ইত্যাদি বিশেষ মতানুসারী মুসলমান ব্যতীত রাসূল সা.-এর আদর্শানুসারী বৃহৎ মুসলিম সম্প্রদায়

আহলে রায় – যেসব ধর্মীয় পণ্ডিত শরিয়তের নানা বিষয়ে ব্যাখ্যাদানের যোগ্যতা রাখেন

আহলে হাদিস – কেবল কুরআন ও হাদিসের অনুসারী (মাযহাব অনুসারী নয়)

ইকামতে দ্বীন – ইসলামী জীবনবিধান প্রতিষ্ঠা করা

ইজতিহাদ – গবেষণার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া

ইজমা – সম্মিলিত রায়/মতামত

ইত্তেহাদুল উম্মাহ – জাতিকে ঐক্যবদ্ধকরণ

ইমাম – পথপ্রদর্শক/নেতা

ইসতিহ্সান – কল্যাণকর সমাধান (দুটি সিদ্ধান্তের মধ্যে যেটি কল্যাণকর, সেটি গ্রহণ)

ইসলাহে মুয়াশারা – সমাজ সংস্কার

ইসলাহে হুকুমাত – রাষ্ট্র ও সরকারব্যবস্থা সংশোধন

ইহতেসাব – গঠনমূলক সমালোচনা

ইয়ানত – নিয়মিত বায়তুলমালে দান করা

ইলম – জ্ঞান

উম্মতে মুসলিমা – মুসলিম জাতি

উলিল আমর – ইসলামী দৃষ্টিতে বৈধ নেতৃত্ব/ইসলামী রাষ্ট্রের যে নেতৃত্ব মানতে মুসলমানরা বাধ্য

উলামা – আলিম শব্দের বহুবচন

উশর – স্বাভাবিক উর্বর জমিতে উৎপাদিত ফসলের এক-দশমাংশ যাকাত হিসেবে সরকারকে প্রদান

এতেরাজ – কোনো বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন

ওয়াকফ – ধর্মীয় উদ্দেশ্যে স্বত্ব ত্যাগ করে দান

কর্জে হাসানা – লাভের উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে দান

কামিল – মাদরাসা শিক্ষার সর্বশেষ স্তর (সিদ্ধ বা পরিপূর্ণ)

কায়েম – প্রতিষ্ঠা

কিয়াস – সাদৃশ্য

খানকাহ – পীর/দরবেশদের আস্তানা

খলিফা – প্রতিনিধি

খিলাফত – ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা

সদকা – পুণ্য লাভের উদ্দেশ্যে দান

জিম্মা – ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম অধিবাসী

জমিয়ত – সংস্থা/সংগঠন

জামায়াত – দল, সংগঠন

জামায়াতে ইসলামী – ইসলামী দল/সংগঠন

জিহাদ – ধর্মযুদ্ধ/ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন

জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ – আল্লাহর পথে জিহাদ

জাহেলিয়াত – ইসলাম বিবর্জিত রীতিনীতি

জায়েজাহ – পর্যালোচনা

তাওহিদ – আল্লাহর একত্ববাদ

তাওয়িল – ব্যাখ্যা

তাকলিদ – বিশেষ মতের অনুসরণ

তানকিদ – সমালোচনা

তানযিম – সংগঠন

তাফসির – কুরআনের ব্যাখ্যা

তাবলিগ – প্রচার

তারবিয়াত – প্রশিক্ষণ

দাওয়াতি টার্গেট – জামায়াতে ইসলামীতে অন্তর্ভুক্তকরণের নিমিত্ত কাউকে লক্ষ্যস্থল নির্ধারণ

দ্বীন – ইসলামী জীবনবিধান, আনুগত্য

দরবেশ – সাধক

দারসে কুরআন – কুরআনের ব্যাখ্যামূলক আলোচনা

দারসে হাদিস – হাদিসের ব্যাখ্যামূলক আলোচনা

নাযেম – পরিচালক

নায়েবে আমীর – জামায়াতে ইসলামীর সহকারী পরিচালক বা নেতা

নায়েবে রাসূল – রাসূলের প্রতিনিধি

পীর – ধর্ম বিষয়ে নির্দেশদানকারী

ফিরকা – গোষ্ঠী, দল

ফিকাহ – কুররান, হাদিস, ইজমা, কিয়াস ও ইজতিহাদের ভিত্তিতে মুসলিম পণ্ডিতগণের ধর্মবিষয়ক সিদ্ধান্ত-সমন্বিত শাস্ত্র

ফতওয়া – সিদ্ধান্ত, মতামত

ফাজিল – মাদরাসা শিক্ষার কামিল পর্যায়ের নিম্নস্তর

ফুরকানিয়া – কুরআন শিক্ষা কেন্দ্র

ফাসেক – অবাধ্য/কবিরা (বড়ো ধরনের) গুনাহে (পাপ কার্য) সম্পৃক্ত ব্যক্তি

ফাসাদ ফিল আরদ – সমাজের শৃঙ্খলা বিনষ্ট করা

ফিতনা – বিশৃঙ্খলা

বাইয়াত – আনুগত্যের শপথ

বাগাওয়াত – বিদ্রোহ

বায়তুলমাল – জামায়াতের তহবিল/ইসলামী রাষ্ট্রের কোষাগার

মজলিশে আমেলা – কর্মপরিষদ

মজলিশে শূরা – পরামর্শ পরিষদ/সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থা

মুজতাহিদ – যিনি ইজতিহাদ করেন

মুজাহিদ – যিনি জিহাদ করেন

মুতাওয়াল্লি – পৃষ্ঠপোষক

মুমিনিন – মুমিন শব্দের বহুবচন

মারুফ – সৎকর্ম

মিয়ারে হক – সত্যের মাপকাঠি

মিরাসি আইন – উত্তরাধিকার আইন

মাসআলা – দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন সমস্যার ধর্মীয় ফয়সালা

রুকন – সদস্য

রুকনিয়াত – সদস্যপদ

রিসালাত – রাসূলের দায়িত্ব

শববেদারি – রাত্রি জাগরণ/রাতের শেষ ভাগের ইবাদত

শামিল – অন্তর্ভুক্ত

শূরা – পরামর্শ

শরিয়াহ – শরিয়ত/ধর্মীয় আইন

শরয়ি – শরিয়ত-বিষয়ক

শূরায়ি নেজাম – পরামর্শভিত্তিক ব্যবস্থা

সুন্নাহ – রাসূলের প্রদর্শিত পথ

সালাত – নামাজ/প্রার্থনা

সালেহ – যিনি সৎকর্ম করেন

সালেহিন – সালেহ শব্দের বহুবচন

সাহাবা – রাসূলের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য লাভকারী মুসলিমগণ

সাহাবায়ে কেরাম – রাসূলের সম্মানিত সাহাবাগণ

হাকিকত – তত্ত্ব

হুকুমাত – রাষ্ট্রব্যবস্থা/সরকারব্যবস্থা

হিযবুল্লাহ – আল্লাহর দল

হাদিস – রাসূলের বাণী, কর্ম ও অনুমোদন

হানাফি – ইমাম আবু হানিফা উদ্ভাবিত ফিকাহ্ শাস্ত্রের অনুসারীগণ

হিন্দ – ভারতবর্ষ/বর্তমান ভারত

হিযব – দল

*****

গ্রন্থপঞ্জি

ক. দলীয় প্রকাশনা

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

ইসলামী বিপ্লবের ৭ দফা গণদাবি, ঢাকা, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৯৮৩।

গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা, ঢাকা, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৯৯১।

গঠনতন্ত্র : জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ঢাকা, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৯৯০।

জামায়াতে ইসলামীর কার্যবিবরণী, ১ম খণ্ড, ঢাকা, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৯৮৭।

জামায়াতে ইসলামীর কর্মনীতি, ঢাকা, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৯৯০।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ পরিচিতি, ঢাকা, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৯৮৪।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সদস্য সম্মেলনের প্রস্তাব, ঢাকা, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৯৮৩।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ফরম ১ (কর্মী রিপোর্ট), ২ (রুকন/রুকন পদপ্রার্থী রিপোর্ট), ৪ (মুদ্রণ, ডিসেম্বর, ১৯৮৯), ৬ (মুদ্রণ, ডিসেম্বর, ১৯৮৯), ৭ (মুদ্রণ, এপ্রিল, ১৯৯১), ৮ (মুদ্রণ, ডিসেম্বর, ১৯৮৯), ৯ (মুদ্রণ, ডিসেম্বর, ১৯৮৯), ১০ (মুদ্রণ, ডিসেম্বর, ১৯৮৯), ১২ (মুদ্রণ, অক্টোবর, ১৯৮৪), ১৩ (মুদ্রণ, ডিসেম্বর, ১৯৮৯) ওয়ার্ড ফরম (মুদ্রণ, ডিসেম্বর, ১৯৮৯)

ত্রিবার্ষিক রুকন সম্মেলনে আব্বাস আলী খানের ভাষণ, ঢাকা, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৯৮৯।

দাওয়াতী পক্ষ (প্রচারপত্র), ঢাকা, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৯৮৭।

দাওয়াতী সপ্তাহের ডাক (প্রচারপত্র), ঢাকা, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, তারিখবিহীন।

পাঠ্যপুস্তক তালিকা, ঢাকা, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৯৯০।

প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে আব্বাস আলী খানের ভাষণ, ঢাকা, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৯৭৯।

পরিচিতি : জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ঢাকা, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৯৯০।

ব্যক্তিগত রিপোর্ট বই (কর্মী), ঢাকা, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৯৮৯।

মেনিফেস্টো : জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ঢাকা, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৯৮৯।

সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে রেডিও-টেলিভিশনে আব্বাস আলী খানের ভাষণ, পুস্তিকা, ঢাকা, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৯৯১।

সংগঠন পদ্ধতি : জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ঢাকা, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৯৮৯।

Election Manifesto: Jamaat-e-Islami Bangladesh, Dhaka, Jamaat-e-Islami, Bangladesh, 1991.

Introducing Jammat-e-Islami Bangladesh, Dhaka, Jamaat-e-Islami, Bangladesh, 1981.

ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ (আইডিএল)

আইডিএল-এর দৃষ্টিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন '৮১, ঢাকা, পাবলিসিটি সেক্রেটারি, আইডিএল কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৮১।

জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান

নির্বাচনী ইশতেহার : জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান, চট্টগ্রাম, জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান, চট্টগ্রাম শাখা, ১৯৭০।

জামায়াতে ইসলামী হিন্দ

জামায়াত সদস্যদের ভোটাধিকার প্রয়োগ প্রসঙ্গে, কলিকাতা, জামায়াতে ইসলামী হিন্দ, পশ্চিমবঙ্গ শাখা, ১৯৯১।

পলিসি ও প্রোগ্রাম, কলিকাতা, জামায়াতে ইসলামী হিন্দ, পশ্চিমবঙ্গ শাখা, ১৯৯০।

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

কর্মী ভাইদের উদ্দেশ্যে সংগঠনের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কার্যকরী পরিষদের বক্তব্য, ঢাকা, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির, স্থান ও তারিখবিহীন।

ঘূর্ণাবর্তে বাংলাদেশ, ইসলামী ছাত্রশিবির, প্রকাশের স্থান ও তারিখবিহীন।

সিলেবাস : বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, ঢাকা, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, ১৯৮৫।

খ. সরকারি প্রকাশনা

Statistical Pocket Book of Bangladesh 1987, Dhaka, Bangladesh Bureau of Statistics, 1988.

Statistical Year Book of Bangladesh 1990, Dhaka, Bangladesh Bureau of Statistics, 1990.

গ. সংবাদপত্র

দৈনিক ইনকিলাব (ঢাকা)।

দৈনিক সংগ্রাম (ঢাকা)

The Bangladesh Observer (Dhaka).

The Statesman (Calcutta)

ঘ. সাময়িকী

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা (ঢাকা)।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ (চট্টগ্রাম)।

বিচিন্তা (ঢাকা)।

বিচিত্রা (ঢাকা)

বাংলা একাডেমি পত্রিকা (ঢাকা)।

সুন্দরম (ঢাকা)।

সমাজ নিরীক্ষণ (ঢাকা)

Islamic Culture (Hydrabad).

Islamic Quarterly (London).

Islamic Studies (Islamabad).

Islam Today (Rabat).

Student Views (Dhaka).

The Middle East Journal (Washington D. C.).

ঙ. প্রবন্ধ

আউয়াল, মাওলানা আবদুল, "জামাতে ইসলামীর ধর্ম ব্যবসা", *বিচিত্রা*, ১১ নভেম্বর, ১৯৮৮।

আলাভী, হামযা, "পাকিস্তান ও ইসলাম : জাতিসত্তা, মতাদর্শ ও রাষ্ট্র", (অনূদিত) *সমাজ নিরীক্ষণ*, নভেম্বর, ১৯৮৮।

খান, আবু তাহের, "সংগঠন তত্ত্বে চিন্তার বিবর্তন ও তার প্রায়োগিক বিশ্লেষণ", *বাংলা একাডেমি পত্রিকা*, কার্তিক-পৌষ সংখ্যা, ১৩৯৫।

নজরুল, আসিফ, "জামায়াতে ইসলামীর ধর্ম ব্যবসা : বিশিষ্ট আলেমদের অভিমত", *বিচিত্রা*, ১৩ জানুয়ারি, ১৯৮৯।

মোহাম্মদ, হাসান, "ধর্ম, সাম্প্রদায়িকতা ও বাংলাদেশের রাজনীতি (১৯৭২-৮৬)" *চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ*, ভল্যুম, ৩, ১৯৮৭।

রহীম, মুহাম্মাদ আবদুর "উন্নয়ন : ইসলামী প্রেক্ষিতে", *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৮৮।

হোসেন, সৈয়দ আনোয়ার, "ইসলামী মৌলবাদ : মৌল বিতর্ক", *সুন্দরম*, শীত সংখ্যা, ১৩৯৬।

– "ধর্মের নামে নির্বাচন", *বিচিত্রা*, এপ্রিল ১১, ১৯৯১।

– "বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি : একটি বিশ্লেষণ", *সমাজ নিরীক্ষণ*, নভেম্বর, ১৯৮৭।

Azam, Golam, "Methods of Islamic Revolution", *Student Views*, 1988.

Ahmad, Aziz, "Mawdudi and Orthodox Fundamentalism in Pakistan", *The Middle East Journal*, vol. 21, Winter, 1967.

Al-Khatib, Nu'man Ahmad, "Islamic Thought and Political Parties", *Islam Today*, April, 1986.

Baraka, Magda, "Islam and Development", *Islamic Quarterly*, vol. XXVIII, 1984.

Hakim, Abdul, "The 1991 Parliamentary Election in Bangladesh: A Review", *Politics, Administration and Change*, No. 17, July-December, 1991. pp. 24-38.

Husain, Anwar Syed, "Religion and Ethnicity in Bangladesh Politics", *Bangladesh Institute of International and Strategic Studies*, Vol. 12, No. 4. 1991.

Moten, A. Rashid, "Pure and Practical ideology: The Thought of Mawlana Mawdudi (1903-1979)", *Islàmic Quarterly*, Vol. XXVIII, 1984.

Nyang, Sulayman S., "The Islamic State and Economic Development: A Theretical Analysis", *Islamic Culture*, Vol. L, No. 1, 1976.

Sidduqi, Mazharuddin, "Intelectual base of Muslim Modernism", *Islamic Studies*, Vol. IX, June. 1970.

চ. অপ্রকাশিত প্রবন্ধ

Banu, U.A.B. Razia Akter, "Jamaat-e-Islami Movement: Its Present and Future", Presented in a Seminar held in Millan, Italy, 1981.

ছ. পুস্তক-পুস্তিকা

আউয়াল, আবদুল, *জামাতের আসল চেহারা*, ঢাকা, আওয়ামী ওলামা পরিষদ, ১৯৮৮।

আনসার, বেগম রোকেয়া, *ইসলামী আন্দোলনে মহিলা কর্মীর দায়িত্ব ও কর্তব্য*, ঢাকা, রায়হান প্রকাশনী, ১৯৮৮।

আম্বিয়া, সাখাওয়াতুল, *ইসলামী শাসনব্যবস্থা*, ঢাকা ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৯৮৭।

আযম, গোলাম, *অমুসলিম নাগরিক ও জামায়াতে ইসলামী*, ঢাকা প্রকাশনা বিভাগ, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৯৮৫।

– *আমার দেশ বাংলাদেশ*, ঢাকা, আল আযামী পাবলিকেশন্স, ১৯৮৮।

– *ইকামতে দ্বীন*, ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী, ১৮৮৩।

– *ইকামতে দ্বীনের সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরিণাম*, ঢাকা, লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৮২।

– *ইসলামী আন্দোলন : সাফল্য ও বিভ্রান্তি*, ঢাকা, প্রকাশনা বিভাগ, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৯৮৮।

– "গণতন্ত্র ও ইসলাম", লেখকের প্রবন্ধ সংকলন, *বাংলাদেশের রাজনীতি*, ঢাকা, আল আযামী পাবলিকেশন্স, ১৯৮৭।

– *জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য*, ঢাকা, প্রকাশনা বিভাগ, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৯৮৭।

– *ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ*, ঢাকা, আল আযামী পাবলিকেশন্স, ১৯৮৭।

– *পলাশী থেকে বাংলাদেশ*, ঢাকা, লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৮৮।

– *বাইয়াতের হাকীকত*, ঢাকা, আল আযামী পাবলিকেশন্স, ১৯৮৯।

– *বাংলাদেশ ও জামায়াতে ইসলামী*, ঢাকা, প্রকাশনা বিভাগ, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৯৮৮।

– "বিশ্ব নবীর জীবনে রাজনীতি", লেখকের *বাংলাদেশের রাজনীতি*, ঢাকা, আল আযামী পাবলিকেশন্স, ১৯৮৭।

– *বাংলাদেশে আদর্শের লড়াই*, ঢাকা, আবদুল্লাহিল মামুন আল আযামী প্রকাশিত, ১৯৮৮।

– রুকনিয়াতের দায়িত্ব, ঢাকা, প্রকাশনা বিভাগ, জামায়াতে ইসলামী, বাংলাদেশ, ১৯৮৭।

আলী, ইউসুফ, *ইসলামী বিপ্লব সংগঠন ও পরিকল্পনা*, ঢাকা, শহীদ স্মৃতি প্রকাশনী, ১৯৮৮।

আসাদ, মুহাম্মাদ, *ইসলামে রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার মূলনীতি*, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬।

– *সংঘাতের মুখে ইসলাম*, ঢাকা, আশ্রাফ প্রকাশনী, ১৯৭৭।

আহমদ, এ. কে. এম. নাজির, *ইসলামী সংগঠন*, ঢাকা লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৮৮।

ইউসুফ, আবুল কালাম, *জামায়াতে ইসলামীর বিরোধিতার অন্তরালে*, ঢাকা, খেলাফত পাবলিকেশন্স, ১৯৮৮।

কুতুব, সাইয়েদ, *ইসলাম ও সামাজিক সুবিচার*, ঢাকা, শিরীন পাবলিকেশন্স, ১৩৮১ বঙ্গাব্দ।

কামারুজ্জামান, মুহাম্মদ, *আধুনিক যুগে ইসলামী বিপ্লব*, ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯০।

খান, আব্বাস আলী, *জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস*, ঢাকা, আবু নুমান মোঃ মাসউদুয্যামান, ১৯৮৬।

জাব্বার, আবদুল, *জামায়াত নেতৃবৃন্দের প্রতি চ্যালেঞ্জ*, ঢাকা, প্রকাশকের নাম ও স্থান বিহীন, ১৯৮৩।

জায়দান, আবদুল করিম, *ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা*, ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৭৯।

নিজামী, মতিউর রহমান, *ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন*, ঢাকা, আল ইহসান প্রকাশনী, ১৯৮৬।

– *ইসলামী সমাজ বিপ্লব*, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৮।

নিজামী, শামসুন্নাহার, *দ্বীন প্রতিষ্ঠায় মহিলাদের দায়িত্ব*, ঢাকা, প্রত্যয় প্রকাশনী, ১৯৮৫।

ফারুক, মোহাম্মদ ওমর, *নতুন বিপ্লবের পদধ্বনি*, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩।

মওদূদী, সাইয়েদ আবুল আ'লা, *আল জিহাদ*, ঢাকা, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৮১।

– *আল্লাহর পথে জিহাদ*, ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৭৮।

– *ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ*, ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৭৯।

– *ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কর্মসূচি*, ঢাকা, মুহাম্মাদ আবদুর রহীম প্রকাশিত, ১৯৬৩।

– *ইসলামী আন্দোলন : সাফল্যের শর্তাবলি*, ঢাকা, ইসলামী ছাত্রশিবির প্রকাশনী, ১৯৮৬।

– *ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ*, ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮৬।

– *ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি*, ঢাকা, ইসলামিক পাবলিকেশন্স, ১৯৭১।

– *ইসলামী বিপ্লবের ধারা*, ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮৭।

– *ইসলামী বিপ্লবের পথ*, ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮৭।

– *ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ*, ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮৫।

– *ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন*, ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮৭।

– *ইসলামী শাসনতন্ত্রের মূলনীতি*, ঢাকা, ইসলামিক পাবলিকেশন্স, ১৯৬৩।

– *ইসলাম ও সামাজিক সুবিচার*, ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮৭।

– *ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা*, ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৭৯।

– *জামায়াতে ইসলামীর উনত্রিশ বছর*, ঢাকা, প্রচার বিভাগ, জামায়াতে ইসলামী পূর্ব পাকিস্তান, তারিখ নেই।

– *তাফহীমুল কুরআন*, ২য় খণ্ড, ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৭৮।

– *তাফহীমুল কুরআন*, প্রথম পারা, ঢাকা, মাহবুব প্রকাশনী, ১৯৭৬।

– *তাফহীমুল কুরআন*, ৩য় খণ্ড, ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮১।

– *তাফহীমুল কুরআন*, ষষ্ঠদশ খণ্ড, ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮৯।

– *তাফহীমুল কুরআন*, ঊনত্রিশ পারা, ঢাকা, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৮৭।

– *মুসলমানদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কর্মসূচি*, ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮৬।

– *মুসলিম বিশ্বে ইসলামী আন্দোলনের কর্মধারা*, ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮৬।

– *রাসায়েল ও মাসায়েল*, ১ম খণ্ড, ঢাকা মওদূদী রিসার্চ একাডেমি, ১৯৮৯।

মুন্না, হাবিবুর রহমান, *মিস্টার মওদূদীর নূতন ইসলাম*, ঢাকা, ফেৎনা উচ্ছেদ কমিটি, ১৯৮৮।

রাজ্জাক, আবদুর, *ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য*, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭।

সামাদ, গোলাম, *বাংলাদেশে ইসলাম*, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭।

হক, সিরাজুল, *ইমাম ইবনে তাইমিয়া ও তাঁর সংস্কার আন্দোলন*, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭।

হাশমী, তাজুল ইসলাম, *ঔপনিবেশিক বাংলা*, কলিকাতা, প্যাপিরাস, ১৯৮৫।

Adams, Charles, J., "The ideology of Mawlana Mawdudi" in Donald Eugine Smith, ed., *South Asian Politics and Religion*, New Jersey, Princeton University Press, 1966.

– "Mawdudi and the Islamic State", in John L. Esposito ed., *Voices of Islamic Resurgence*, New York, Oxford university Press, 1983.

Ahmad, Ilyas, *Sovereignty: Islamic and Modern*, Karachi, The Allies Book Corporation, 1965.

Ahmad, Khursid, "Economic Development in an Islamic Framework" in Khursid Ahmad and Zafar Ishaq Ansari, eds., *Islamic Perspective: Studies in Honor of Mawlana Mawdudi*, Leicester, The Islamic Foundation, 1979.

Al-Buraey, Muhammad, *Administrative Development: An Islamic Perspective*, London, K. P. I. Ltd., 1985.

Alford, R. R., "Religion and Politics" in Roland Robertson, ed., *Sociology of Riligion*, Middlesex, Penguin Books, 1971.

Apter, David, E., *Ideology and Discontent,* New York, The Free Press, 1964.

– *Some Conceptual Approaches to the Study of Modernization,* New Jersey, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1968.

– *The Politics of Modernization*, Chicago, Chicago University Press, 1965.

Arnold, Thomas, *The Caliphate*, London, Routledge and Kegan Paul Ltd., 1967.

Aron, Raymnd, "Social Class, Political Class, Ruling Class" in R. Bendix and S.M. Lipset, eds., *Class, Status and Power*, New York, The Free Press, 1966.

Azam, Golam, *A Guide to Islamic Movement*, Dhaka, Azami Publications, 1968.

Bahadur, Kalim, *The Jamaat-e-Islami of Pakistan*, New Delhi, Chetana Publications, 1977.

Baradat, Leon P., *Political Ideologies: Their Origin and Impact*, New Jersey, Prentice Hall Inc., 1979.

Bell, Daniel, *The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in the Fiftees,* New York, The Free Press, 1966.

Benson, Purnell Handy, *Religion in Contemporary Culture*, New York, Harper and Brothers, Publishers, 1960.

Binder, Leonard, "Crisis of Political Development" in L. Binder *et. al., Crisis and Sequences in Political Development*, New Jersey, Princeton University Press, 1971.

– *Religion and Politics in Pakistan*, Berkeley, California University Press, 1963.

Bottomore, T. B., *Elites and Society*, New York, Basic Books, 1964.

Breacher, Kari Dietrich, *The Age of Ideologies: A History of Political Thought in the Twentieth Century*, London, Methuen and Co., Ltd., 1985.

Brown, Bernard E. *et. al., Government and Politics: An Introduction to Political Science,* New York, Random House, 1966.

Brezinski, Zbigniew and S. P. Huntington, "Political Leadership in Modern Society" in R.C. Macridis and B.E. Brown, eds., *Comparative Politics: Notes and Readings*, Illinois, The Dorsey Press, 1965.

– *Political Power: U.S.A/U.S.S.R.*, New York, The Viking Press, 1968. Burns, James Mac Gregor, "Political Ideology" in Norman Mackenzie. ed., *A Guide to Social Science*, London, Weidenfeld and Nicolson, 1966.

Callard, Keith, *Pakistan: A Political Study*, London, George Allen and Unwin Ltd., 1968.

Caplow, Theodore, *Principles of Organization*, New York, Har Court, Brace and World Inc., 1964.

Cartwright, Dorwin, "Influence, Leadership, Control" in James G March, ed., *Handbook of Organizations*, Chicago, Rand Mcnally and Co., 1972.

Chapra, M. Umar, "The Islamic Welfare State and Its Role in the Economy" in Khurshid Ahmad and Zafar Ishaq Ansari, eds., *Islamic Perspectives: Studies in honour of Mawlana Abul Ala Mawdudi*, Leicester, The Islamic Foundation, 1979.

Chowdhury, Rafiqul Islam *et. al.*, *Tribal Leadership and Political Integration: A Study of Chakma and Mong Tribes of Chittagong Hill Tracts* (Mimeograph), Chittagong, University of Chittagong, 1979.

Christetenson, Reo M. *et. al., Ideologies and Modern Politics*, Nairobi, Nelson, 1972

Coleman, J.S., "The Political Systems of the Developing Areas" in G.A. Almond and J.S. Coleman, eds., *The Politics of Developing Areas,* New Jersey, Princeton University Press, 1960.

Cotgrove, Stephen, *The Sciene of Society*, London, George Allen and Unwin, 1980.

Delh, Robert A., *Modern Political Analysis*, New Jersey, Prentice Hall, 1963.

– *Who Governs?* New York, Yale University Press, 1961.

Diamant, Alfred, "Political Development: Approaches to Theory and Strategy" in John D. Montagomery and Willian J. Siffin, eds., *Approaches to Development: Politics, Administration and Change*, New York, MecGraw Hill Book Company, 1966.

Dicey, A.V., *Law and Public Opinion*, New York, The Macmillan, 1926.

Duverger, Maurice, *Political Parties: Their Organizations and Activities in the Modern State,* London, Methuen and Co. Ltd., 1967.

– *The Idea of Politics*, New York, The Bobes- Merill Co. Inc., 1966.

Easton, David, *A System Analysis of Political Life*, New York, John Wliey and Sons, 1965.

Eccleshall, Robert, *et. al., Political Ideologies*, London, Hutchinson, 1984.

Eckstein, Harry and D.E. Apter, eds., *Comparatie Politics: A Reader*, New York, The Free Press, 1963.

Edinger, Lewis J., ed., *Political Leadership in Industrialized Societies: Studies in Comparative Analysis*, New York, John Wiley and Sons inc., 1967.

Eldersveld, Samuel J., *Political Parties: A Behavioral Analysis*, Bombay, Vora and Company Publishers Pvt. Ltd., 1971.

Emerson, Rupert, *From Empire to Nation*, Cambridge, Harvard University Press, 1960.

Esposito, John L., *Islam and Politics*, New York, Syracuse University Press, 1984.

– "Muhammad Iqbal and the Islamic State" in his ed., *Voices of Resurgent Islam*, New York, Oxford University Press, 1983.

– "Muslim Society Today" in Majorie Kelly, ed., *Islam: The Religion and Political Life of a World Community*, New York, Praeger, 1984.

Etzioni, Amitai, *Modern Organizations,* New Delhi, Prentice Hall of India Pvt. Ltd., 1972.

Faruqi, Mesbahul Islam, *Introducing Mawdudi*, Karachi, Students Publication Bureau, 1968.

Fadler, Fred E., *A Theory of Leadership Effectiveness,* New York, McGraw Hill Book Company, 1967.

Flanigan, Willian H. and Nancy H. Zingale, Political Behavior of the American Electorate, Boston, Allyn and Bacon Inc., 1979.

Fleishman, Edwin A., "Twenty Years of Considerations and structure" in Edwin A. Fleishman and James G. Hunt, eds., *Current Development in the Study of Leadership,* Carbondale, Southern Illonois University Press, 1973.

Gerth, H. H. and C. W. Mill eds., *From Maxweber: Essays in Sociology,* London, Routledge and Kegan Paul Ltd., 1967.

Gibb, Jack R., "Dynamics of Leadership and Communication" in R Lassy and Richard R. Fernandez eds., *Leadership and Social Change*, California, University Associates Inc., 1976.

Grazia, Alfred, *Political Behavior*, New York, The Free Press, 1966.

Hall, Richard H., *Organizations: Structure and Process*, New Jersey, Prentice Hall Inc., 1982.

Heater, D. B., *Political Ideas in the Modern World*, London, George G Harrap and Co. Ltd., 1967.

Hiro, Dilip, *Islamic Fundamentalism*, London, Paladin Grafton Book, 1988.

Hitti, P.L., *Islam: A Way of Life*, Minneapolics, University of Minnesota Press, 1970.

Hoffer, Eric, *The True Believer: Thoughts of the Nature of Mass Movements,* New York, The New American Library, 1958.

Hollander, E.P., *Leaders, Groups, and Influence*, New York, Oxford Universiry Press, 1964.

Hosain, Golam, *General Ziaur Rahman and the BNP*, Dhaka, University Press Ltd., 1988.

Hudson, Micheal C., "Islam and Development" in John L. Esposito ed., *Islam and Development: Religion and Socio-Political Change*, New Yrok, Syracuse University Press, 1982.

Huntington, S. P., "Political Development and Political Decay" in Claud E. Welch, Jr. ed., *Political Modernization: A Reader in Comparative Political Change,* Belmont, California, Wadsworth Publishing Company, 1967.

Hyman, Arthur and James J. Walash, eds., *Philosophy in the Middle Ages: The Christian, Islamic, and Jewish Tradition,* New York, Harper and Row Publishers, 1967.

Jahan, Raunaq, *Bangladesh Politics: Problems and Issues*, Dhaka University Press Ltd., 1980.

Jansen, G. H., *Miliant Islam*, New York, Harper and Row Publishers, 1979.

Kast, F.E. and J.E. Rosenzweing, *Organization and Management*, Singapore, MeGraw Hill Book Company, 1985.

Khadra, Bashir, "Leadership, Ideology and Development in the Middle East" In sami G. Hajjar ed., *The Middle East: From the Transition to Development,* Leiden, E.J. Brill, 1985.

Khan, Abbas Ali, *Jamaat-e-Islami's Views on Defence of Bangladesh*, Dhaka, Jamaat-e-Islami Bangladesh, 1985.

Kurdi, Abdulrahaman Abdul kadir, *The Islamic state: A Study Based on the Islamic Holy Constitution*, London, Mansell Publishing Ltd., 1984.

Lambton, A.K.S., "Islamic Political Thought" in Joseph Schachat and C.E. Bosworth, eds., *The Legacy of Islam*, Oxford, Oxford University Press, 1979.

Lammens, H.S.J., *Islam: Beliefs and Institutiouns*, New Delhi, Oriental Book Reprint Corporation, 1979.

Lane, Robert E., *Political Ideology: Why the American Commonman Believe What he does*, New York, The Free Press, 1968.

Lasswell, Harold, *Politics: Who Gets what, When, How,* New York, Meridian Books, 1958.

Lapalambora, J. and Myron Welner, "The Origin And Development of Poletical Parties" in their eds., *Political Parties and Political Development*, New Jersey, Princeton University Press, 1967.

Lapiere, Richard T., *Social Change*, New York, McGraw Hill Book co., 1965.

Layman, Sargent Tower, *Contemporay Political Ideologies*, Illinois, The Dorsey Press, 1981.

Leeds, C. A., *Political Studies*, U.K. Macdonald and Evans Ltd., 1981.

Lewy, Guenter, "Changing Concept of Political Legitimacy: Abandonment of Theocracy in Islamic World" in David Spitz, ed., *Political Theory and Social Change*, New York, Atherton Press, 1967.

Lipset, Seymour Martin, "Value Patterns, Class, and Democratic Polity: The United States and Great Britain" in R. Benkix and S.M. Lipset, eds., *Class, Status and Power*, New York, The Free Press, 1966.

– *Political Man: The Soial Bases of Politics*, London, Heinemann, 1983.

Maniruzzaman, Talukdar, "Bangladesh Politcs: Secular and Islamic rends" in S. R. Chakravarti and Birandra Narain, eds., *Bangladesh: History and Culture,* New Delhi, South Asia Publishers, 1986.

Mawdudi, Syed Abul Ala, *Fundamentals of Islam*, Delhi, Markaz Maktaba Islami, 1979.

The Islamic Law and Constitution, Delhi, Taj Comany, 1986.

– *Islamic Way of Life*, Dhaka, Adhunik Prakasani, 1978.

– "Nationalism and Islam" In John J. Donohue and John L. Esposito, eds., *Islam in Transition: Muslim Perspective*, New York, Oxford University Press, 1982.

– *Political Theory of Islam*, Lahore, Islamic Publications Ltd., 1960.

– *The Process of Islamic Revolution*, Delhi, Markazi Maktaba Jamaat-e-Islami Hind, 1970.

Maxweber, "Authority and Legitimacy" in Eric Nordlinger, ed., *Politics and Society*, New Jersey, Prentice Hall Inc., 1970.

– *The Thery of Social and Economic Ofganization*, New York, The Free Press, 1966.

McDonald, Neil A., "Party Perspectives: A Survey of Writings" in H. Eckstein and D. E. Apter, eds., *Comparative Politics: A Reader*, New York, The Free Press, 1963.

Mcfarland, Andrew S., *Power and Leadership in Pluralistic System*, California, Standford University Press, 1966.

Mehden, Fred R.Vonder, *Politics of the Developing Nations*, New Jersey, Prentice Hall Inc., 1969.

Mill, C. W., *The Power Elite*, New York, Oxford University Press, 1956.

Michels, Rober, *Political Parties: A Sociological Tendencies of Modern Democracy*, New York, The Free Press,1966.

Mosca, Gaetano, *The ruling Class*, New York, McGraw Hill Book Company, 1939.

Muzaffar, Chandra, "Islamic Resurgence: A Global View" in Taufik Abdullah and Sharon Siddique, eds., *Islam and society in south East Asia*, Singapore, Institute of Soth Asian Studies, 1986.

Myrdal, Gunnar, *Asian Drama: An Abridgement,* U.K. Penguin Books Ltd., 1977.

Nasr, Seyyed Hossein, "Present Tendencies: Future Trends" In Marjoie Kelly, ed., *Islam: The Religion and Political Life of Word Community*, New York, Praeger, 1984.

Neuman, Sigmund, *Modern Political Parties,* Chicago, The University of Chicago Press, 1956.

Organski, A. F. K., *The Stages of Political Development,* New York, Alfred A. Knoph, 1965.

Pareto, Vilfredo, *The Mind and Society*, New York, Harcourt, Brace and Co., 1935.

Parsons, Talcott, *Structure and Process in Modern Societies,* Glencoe III, The Free Press, 1960.

Pye, Lucian W., "Identity and the Political Culture" in L. Binder, *et. al., Crisis and Sequences in Political Development*, New Jersey, Princeton University press, 1971.

– *Aspects of Political Development*, Boston, Little Brown and Co., 1966.

– "Political Culture" in *International Encyclopaedia of Social Sciences*, Vol. 12. U.S.A. Mcmillan Company and The Free Press, 1968.

– "Political Culture and Political Development" in L. W. Pye and S. Verba, eds., *Political Culture and Political Development*, New Jersey, Princeton University Press, 1965.

Ragab, Ibrahim A., "Islam and Development" in Kenneth P. Jameson and Charles K. Wiber, eds., *Religious Values and Development, Oxford. Pergamon Press*, 1981.

Rahman, Fazlur, "Roots of Islamic Neo-Fundamentalism" in P. H. Stoddared, ed., *Change in the Muslims World*, New York, Syracuse University Press, 1981.

– "The Islamic Concept of State" in John J. Donohue and John L. Esposito, eds., *Islam in Transition: Muslim Perspective*, New York, Oxford University Press, 1982.

Renwick, Alan and Lan Swinbum, *Basic Political Concepts*, London, Hutchinson, 1980.

Riggs, Fred W., "Comparative Politics and the Study of Political Parties: A Structural Approach" in William J. Crothy, *Approaches to the Study of Party Organization,* Boston, Allyn and Bacon Inc., 1968.

Rosenthal, E. I. J., *Political Thought in Medieval Islam*, London, Cambridge University Press, 1968.

Ruthven, Malise, *Islam in the World*, England, Penguin Books Ltd., 1985.

Scott, William G., *Organization Theory: A behavioral Analysis for Management,* Illinois, Richard D. Irwin Inc., 1971.

Seligman, Lester, "Elite Recruitment in Political Development" in John J. Finkle and R. W. Gable, eds., *Political Development and Social Change,* New York, John Willey and Sons Inc., 1971.

Shills, Edward, *The Intellectuals and the Powers and other Essays*, Chicago, Chicago University Press, 1983.

Smith, D. E., *Religion and Political Development*, Boston, Little Brown and Co., 1970.

– Religion and Politics in Burma, New Jersey, Princetion University Press, 1965.

– "The Political Implications of Asian Religions" in his ed., *South Asian Politics and Religion*, New Jersey, Princeton University press, 1966.

Smith, W. C., *Islam in Modern History*, New jersey, Princeton University Press, 1957.

Spencer, Robert F., "Religion in Asian Society" in his ed., *Religion and Change in Contemporary Asia*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1971.

Taylor, Jack W., *How to Select and Develop Leaders*, New York, Mcgraw Hill Book Co. Inc., 1962.

Tead, Ordway, *The Art of Leadership,* New York, Mcgraw Hill Book Company, 1935.

Tierney, Brian, *The Crisis of the Church and the State*, 1050-1300, New Jersey, Engleewood Cliffs, Prentice Hall Inc., 1964.

Topark, Binnaz, *Islam and Political Development in Turkey*, Leiden. E. J. Brill, 1981.

Watt, Montogamary, *Islamic Philosophy and Theology*, Edinburgh, Edinburgh University press, 1985.

– *Islamic Political Thought*, Edinburgh, Edinburgh University press, 1968.

– *Muhammad of Medina*, Karachi, Oxford University Press, 1981.

Weiner, Myron, *Party Building in a New Nation: The Indian National Congress*, Chicago, the University of Chicago Press, 1967.

– "Political Participation" in L. Binder *et. al., Crisis and Sequences in Political Development,* New Jersey, Princeton University press, 1971.

Wildavsky, Aaron B., "A Methodological Critique of Duverger's Political Parties" in H. Eckstein and D. E. Apter, eds., *Comparative Politics: A Reader*, New York, The Free Press, 1963.

Yinger, J. Milton, *Religion, Society and the Individual: An Introduction to the Society of Religion*, New York, The Macmillan Company, 1967.

Yuki, A., *Leadership in Organization*, New Jersey, Prentice Hall Inc., 1981.

জ. ধর্মগ্রন্থ

আল কুরআন

আত তিরমিযি, আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা, ***জামে আত তিরমিযি***, ২য় খণ্ড, দিল্লি, আমিন কোম্পানি, তারিখ নেই।

আল তিবরিযি, শাইখ ওয়ালি উদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল খতিব, *মেশকাত আল মাসাবিহ*, দিল্লি, আল মাকতাবা আল রশিদিয়া, ১৩৭৫ হিজরি।

আল বুখারি, মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল, *সহিহ বুখারি*, ২য় খণ্ড, দিল্লি, কুতুবখানা রশিদিয়া, তারিখ নেই।

আল হাজ্জাজ, ইমাম আবু হুসাইন মুসলিম ইবনে, *সহিহ মুসলিম*, ২য় খণ্ড, দিল্লি, আল মাকতাবা আর রশিদিয়া, ১৩৭৬ হিজরি।

আশআছ, সুলাইমান ইবনে, *সুনানে আবু দাউদ*, প্রথম খণ্ড, কানপুর, আল মাজিদি, তারিখ নেই।

ঝ. এনসাইক্লোপেডিয়া

Encyclopaedia Britannica, Vol. 9. Chicago, Encyclopaedia Britannica Inc., 1966.

First Encyclopaedia of Islam 1913-1936, Vol. VIII. Leiden, E.J. Brill, 1987.

International Encyclopaedia of Social Sciences, Vol. 12. U. S. A. Macmillan Company and the Free Press, 1968.

ঞ. পরিভাষা-কোষ

রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিভাষা-কোষ, ১ম খণ্ড, ঢাকা, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৭০।

ট. অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ

Chowdhury, Rafiqul Islam, *Recruitment of Political Elite and Political Development in India and Nigeria*, Ph.D. Dissertation, Oregon, University of Oregon, 1964.

*****

বাংলাদেশের রাজনীতিতে নানা কারণে ‘জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ’ একটি বহুল আলোচিত সংগঠন। প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই এ রাজনৈতিক দলটির বিভিন্ন দিক নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা চলে আসছে। জামায়াতকে নিয়ে লেখাজোখার পরিমাণও নেহাত কম নয়। কিন্তু এর অধিকাংশ রচনা জামায়াতের প্রতি বিদ্বেষ অথবা ভক্তির প্রান্তিকতায় গড়িয়েছে। সংগঠনটি সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত অ্যাকাডেমিক দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন বা গবেষণা অপ্রতুল।

প্রখ্যাত রাজনীতি-বিশ্লেষক ও রাষ্ট্রচিন্তক ড. হাসান মোহাম্মদের পিএইচডি থিসিসের ওপর ভিত্তি করে রচিত এ গ্রন্থে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের নেতৃত্ব, সংগঠন ও আদর্শ তথা জামায়াত-রাজনীতি সম্পর্কে অ্যাকাডেমিক মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, অধ্যাপক হাসানের এই থিসিসই ‘জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ’-এর ওপর প্রথম পিএইচডি পর্যায়ের গবেষণা।

বাংলাদেশ ও মুসলিম-বিশ্বের রাজনীতি সম্পর্কে আগ্রহী ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক, রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও রাজনীতির উৎসাহী পাঠকের কাছে বইটি প্রথমবার প্রকাশের পরপরই সাড়া ফেলেছিল। ভক্তি ও বিদ্বেষের দুই প্রান্তিক চোখের মধ্যবিন্দু থেকে তৃতীয় চোখে জামায়াতকে দেখার এই অ্যাকাডেমিক গবেষণার প্রয়াসটি এখনও প্রাসঙ্গিক এবং ঐতিহাসিক মূল্যমানসমৃদ্ধ।

ড. হাসান মোহাম্মদ

গবেষক, শিক্ষাবিদ, রাজনীতি-বিশ্লেষক, সংগঠক বহুবিধ পরিচয়ে সমুজ্জ্বল ড. হাসান মোহাম্মদ। ১৯৫৪ সালে চট্টগ্রামের দ্বীপ উপজেলা সন্দ্বীপে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

সন্দ্বীপে মাধ্যমিকের পাঠ চুকিয়ে চট্টগ্রাম শহরে চলে আসেন তিনি। চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। একই বিভাগ থেকে ১৯৯২ সালে তিনি পিএইচডি অর্জন করেন।

পেশাগত জীবনে ড. হাসান মোহাম্মদ ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক, বিভাগীয় চেয়ারম্যান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য। পাশাপাশি তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ফেডারেশনের সহ-সভাপতি, এ. এফ. রহমান হলের প্রভোস্ট, বাংলাদেশ রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতির সাধারণ সম্পাদক সহ বহুমুখী পদে দায়িত্ব পালন করেছেন।

গবেষক ও রাজনীতি-বিশ্লেষক হিসেবেও ড. হাসান মোহাম্মদ বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলির মধ্যে রয়েছে– *বাংলাদেশ : ধর্ম সমাজ ও রাজনীতি*, *জাতীয়তাবাদ : প্রসঙ্গ বাংলাদেশ*, *তাবলিগ আন্দোলন ও তাবলিগ জামায়াত*, *শহীদ জিয়া বিএনপি ও বাংলাদেশের রাজনীতি*, *বাংলাদেশের মাদরাসা শিক্ষা* ইত্যাদি।

২০২১ সালের ১১ এপ্রিল ড. হাসান মোহাম্মদ ইন্তেকাল করেন।

তাফহীম
পাবলিকেশন